সৃষ্টির সিঁড়ি

মঙ্গন চৌধুরী

উ ৎ স র্গ

যার ‘আমিত্ব’ আমার চিন্তা-চেতনায়
স্পন্দন তুলে আমার ‘আমি’কে
‘যৌগ-আমি’র প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ
করেছিল, যে আমাকে দিয়েছিল
জীবন-দর্শন আর সাহিত্যের প্রথম
পাঠ, সেই সত্তা, আমার বাবা,
মরহুম চৌধুরী শামসুর রহমানের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

সম্পাদনা
শওকত হোসেন

সৃষ্টির সিঁড়ি গ্রন্থের
সূচি

লেখকের প্রথম প্রকাশের ভূমিকা
০৫ – ০৬

সংজ্ঞান সংবেদ
০৭ – ০৭

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাদর্শন
পূর্বকথা; সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমি; কাঠামোবাদী
সাহিত্যতত্ত্ব; অনুচিন্তন
০৭ –১৯

হাইডেগার-এর সত্তাবিজ্ঞান, ভাষাদর্শন ও নন্দনতত্ত্ব
পূর্বকথা; হাইডেগার-এর সত্তা ও সময়দর্শন; হাইডেগার-এর ভাষাদর্শন;
হাইডেগার-এর নন্দনতত্ত্ব; অনুচিন্তন
২০ – ৩৪

দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন: তাত্ত্বিক বিচার
পূর্বকথা; সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমি; দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন
৩৪ – ৪০

আমেরিকান ডিকন্সট্রাকশন
৪০ – ৪২

সস্যুর, দেরিদা ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন
৪২ – ৪৬

সাহিত্য সমালোচনায় দেরিদার ডিকন্সট্রাকশনের প্রয়োগ
৪৬ – ৫৭

মিশেল ফুকো: জ্ঞান ও চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব
৫৮ – ৫৯

কার্ল পপারের ‘বিশ্ব-৩’ ও ভাষাদর্শন
৫৯ – ৬৫

ফ্রয়েড, লাকাঁ ও সমকালীন বিজ্ঞানদর্শন
পূর্বকথা; ফ্রয়েডের মতবাদ; জাক লাকাঁর দর্শন; ফ্রয়েড, লাকাঁ ও সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শন; অনুচিন্তন
৬৬ – ৭৬

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ ও জীবনদর্শন
পূর্বকথা; ভাববাদ, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান-দর্শন; কণা-কোয়ান্টাম তত্ত্ব; কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও জীবন; কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ ও জীবনদর্শন; অনুচিন্তন ।
৭৭ – ৮৭

সৃষ্টির কণা-তরঙ্গ রূপ ও কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব
পূর্বকথা; বস্তুর কণাতরঙ্গরূপ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব; তত্রসত্তা, পতিতসত্তা ও মানবিক কোয়ান্টাম স্তর; বস্তুর কণা-তরঙ্গরূপ ও সাইবারনেটিকস্; মানবিক ইনপুট বা সংবেদ; মানবিক মেমরি বা স্মৃতি; মানবিক সিপিইউ বা মস্তিষ্ক; মানবিক আউটপুট বা প্রকাশ; সৃষ্টি ও সাইবারনেটিকস্; সৃষ্টি ও স্রষ্টা; কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক কতিপয় সিদ্ধান্ত; অনুচিন্তন
৮৭ – ১০৩

সমস্যা, সমস্যার সমাধান ও ভাষাদর্শন
পূর্বকথা; জীবন ও ভাষা; ইন্দ্রিয় ও মানুষের ভাষা; সমকালীন ভাষাতত্ত্ব; ভাষাদর্শনঃ কিছু নতুন সংযোজনা; কতিপয় সিদ্ধান্ত ।
১০৩ – ১১২

সৃষ্টির স্বরূপ ও আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ
১১২ – ১১৬

কবিতা ও প্যারাডাইম
১১৬ – ১২০

কবিতা ও গণিত
২+২ = ৪ কিংবা কবিতার সহজ গণিত; ২+২=৫ কিংবা কবিতার জটিল গণিত
১২১ – ১২৭

প্রসঙ্গঃ কবিতা, কবি ও পাঠক
১২৮ – ১৩২

কবিতা ও যুক্তির ভাষা
১৩২ – ১৩৯

মনের জানালা/ বিশ্বচিত্র: সৃষ্টি/ নির্মাণ
১৪০ – ১৪২

বিষয়: আমি ও যৌগ-আমি
১৪২ – ১৪৭
বিষয়: ঘর, জানালা ও পথ
১৪৮ – ১৫২

জীবন ও মৃত্যু প্রসঙ্গে
১৫২ – ১১৫

সৃষ্টির সিঁড়ি
১৫৫ – ১৫৭

তথ্যপঞ্জী
১৫৭ – ১৬০

লেখকের প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

এই বইটিতে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছিল ১৯৯০ থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল একবিংশ, প্রান্ত, অন্যস্বর, প্রসূন, বিপ্রতিক, দ্রষ্টব্য, নিসর্গ, ঘণ্টা ও মঙ্গলসন্ধ্যা নামের লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে।

দর্শন এবং সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন পাঠ ও পঠনই এ প্রবন্ধগুলো রচনা করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভাষা, দর্শন ও কিংবা সাহিত্যের পাঠ যেহেতু অনেক সময় Misreading-এর পর্যায়ে যেতে পারে, (স্মরণ করছি ভাষা-দার্শনিক পল দ্যা মান-এর কথা– Reading is always necessarily misreading) সেহেতু রচিত প্রবন্ধগুলোতে আমার নিজস্ব অহং-এর উপস্থিতি

হয়তো-বা প্রচণ্ডভাবে আছে। বেশ কিছু প্রবন্ধে আমি আমার মৌলিক চিন্তা-চেতনাকেও প্রাধান্য দিয়েছি যৌক্তিক কারণেই। যে বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য উপস্থাপন করা যায় না, সে বিষয় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা চলে, এমন একটা মিথ্যা-সত্যকে গ্রাহ্য করেই নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েছি আমি। আমার চিন্তা-চেতনায় যদি অযৌক্তিক উপাদান কিছু থাকে, তবে তা শুধরানোর দায়িত্ব থাকবে মননশীল পাঠক ও সমালোচকদের ওপর।

এই বইতে গ্রন্থিত বেশ কিছু প্রবন্ধে আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিক তত্ত্বের কিছু শব্দ-ধারণাকে উপস্থাপন করেছি (যেমন, কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ, কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব, আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ ইত্যাদি) বর্তমানের দেশ-কালে গ্রাহ্য বিজ্ঞান-দর্শন ও গাণিতিক চিন্তা-চেতনা-কাঠামোকে কেন্দ্র করে। আমার এ উপস্থাপনায় অবশ্যই সময়গ্রাহ্য কিছু গাণিতিক যুক্তি আছে, এবং আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্বের স্থুল গণিত-সূত্রকে ঠিক এখনই জীবন, সাহিত্য ও শিল্প-বিশ্লেষণে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা না গেলেও, আগামীর পৃথিবীতে সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিক তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বইটিতে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন অনেকেই। এদের মাধ্যে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, আফজালুল বাশার, সৈয়দ তারিক, মাসুদ খান, সাহেদ কায়েস, ব্রাত্য রাইসু, বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ ও অঞ্জন সেনের আলোচনা-সমালোচনা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে বেশি। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে এদের আজীবন মনে রাখব।

আমার প্রবন্ধগুলোর প্রথম পাঠক ও সমালোচক ছিল আত্মজ তাসীন চৌধুরী, এবং এ কারণে আমি তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশে মননশীল পাঠকের সংখ্যা খুব কম জেনেও পাঠক সমাবেশের স্বত্বাধিকারী সাহিদুল ইসলাম বিজু বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে জানাই ধন্যবাদ।

মঈন চৌধুরী
১২২, কাকরাইল রোড, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

সংজ্ঞান সংবেদ

মানব মস্তিষ্কের নিউরোন কোষে আবদ্ধ হয়ে আছে জগৎ ও পরিবেশ সম্পর্কীয় সব ধরনের ইন্দ্রিয়-কণা-তরঙ্গ চিত্ররূপ এক কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক প্রতীকী শৃঙ্খলার বিন্যাসে। জগৎ ও পরিবেশের প্রতীকী চিত্ররূপকে প্রকাশ করতে একজন 'আমি' ব্যবহার করছে যুক্তির ভাষা, যা আবার নিজেই ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-নির্ভর অন্যএকটি প্রতীকী শৃঙ্খলার অন্তর্গত বিষয়। প্রতীক দিয়ে প্রতীক কিংবা আন্তঃপ্রতীকী সম্পর্ককে উপস্থাপন করতে গিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে বোঝা আর না-বোঝার অহংকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করে।

প্রতিটি অহং বিশ্বের ইন্দ্রিয়-কণা-তরঙ্গ চিত্ররূপ যেহেতু অবস্থান করছে বিভিন্ন মাত্রার নিউরোন কোষ-কেন্দ্রিক যান্ত্রিক শৃঙ্খলে, সেহেতু 'আমি'র ভাষা দিয়ে 'তোমাদের' সত্যকে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, আর 'আমি'ও তাই প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করছে এক 'আপেক্ষিক মিথ্যার' শব্দতরঙ্গ কিংবা চিত্রতরঙ্গের নব-বিশ্বকে। সর্বজনগ্রাহ্য প্রতীকী শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে 'আমার' যে এই হঠাৎ বিদ্রোহ, তাকেই 'তোমরা' বলছ সৃষ্টি, শিল্প কিংবা কবিতা।

ভাষা হল নিউরোনে অঙ্কিত ইন্দ্রিয়-কণা-তরঙ্গের চিত্ররূপের গ্রহণ/বর্জন, সংশ্লেষণ/ বিশ্লেষণ আর স্থাপন/ প্রতিস্থাপন-সৃষ্ট দ্যোতিত রূপ। ভাষাকেন্দ্রিক দ্যোতক/ দ্যোতিত আর তার মধ্যবর্তী ক্রিয়া-কর্মের এই বিশ্বে 'আমি' তার মৌলিক অস্তিত্বের রূপ ও স্বরূপ খুঁজে পায় শুধুমাত্র ঐ জৈব কোষ-নিউরোনের যান্ত্রিক গাণিতিক কর্মকাণ্ডে। 'তোমরা' তোমাদেরকেও খুঁজতে পার ঐ অলোকিত গণিত সম্মেলনে এবং ওখানে 'আমি'-কেও পাবে। যদি খুঁজে পাও 'আমি'-কে তবেই তৈরি হবে নতুন এক 'যৌগ-আমি', 'তুমি' কিংবা 'তোমাদের' বিবর্তনে। তোমরা এই বিবর্তনের সপক্ষেই এগিয়ে যাও। যাওয়া সম্ভব।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাদর্শন

পূর্বকথা

ষাটের দশকের প্রথম দিকে কাঠামোবাদী (structuralist) সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব হলেও ১৯৮০ সাল নাগাদ এ তত্ত্বটি নতুন সাহিত্যদর্শন হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষ পরিচিতির কারণ, এ তত্ত্বে প্রচলিত অন্যান্য সাহিত্যদর্শনের মূল উপাদান ও

বিশ্বাসসমূহকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সাহিত্যকর্ম হল একজন সৃষ্টিশীল মানুষ বা লেখকের জীবন ও জগৎ-বীক্ষণের প্রতিফলিত রূপ, যেখানে লেখকের উপস্থিতি থাকে অনিবার্যভাবে আর সাহিত্যকর্মের মাঝ থেকে জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব। কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা প্রচলিত এ বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে বলেন, সাহিত্যকর্মে লেখকের উপস্থিতি থাকে না, লেখক তাঁর সৃষ্টির পরই মৃত, এবং সাহিত্য সবসময়ই সত্যের সাথে সম্পর্কহীন।

ষাটের দশকের শেষভাগে সাহিত্যতাত্ত্বিক রলাঁ বার্থ কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের ধারণাসমূহকে তাঁর রচনার মাধ্যমে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। রলাঁ বার্থ উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল লেখক ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত তাঁর মূল্যায়ন। বার্থে-র মূল বক্তব্য ছিল:

১. একজন লেখক, ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গেছে, এমন সব বিবরণ বা সাহিত্যকর্ম থেকে ধারণা/ বর্ণনা/ বক্তব্য/ উপাদান ইত্যাদি নিয়ে, একটি নতুন বিন্যাসে তাঁর নতুন সাহিত্যকর্মটি রচনা করেন।

২. লেখার মাধ্যমে একজন লেখক কোনো অবস্থাতেই নিজেকে প্রকাশ করেন না, বরং একজন লেখক তাঁর সমাজ ও সভ্যতার মাঝে অবস্থানকারী ভাষাব্যবস্থা (যা বার্থের ভাষায় always already written থেকে উপকরণ নিয়ে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করেন মাত্র। কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ববিদদের 'মৃত লেখক'-কেন্দ্রিক সাহিত্যকর্ম অমানবিক মনে হতে পারে, কিন্তু কাঠামোবাদীরা এই অমানবিকতার পক্ষে থেকে সনাতন সাহিত্যতত্ত্বের বিরোধিতা করে বলেন, সাহিত্যের অর্থ উদ্ধারের জন্য সবসময় একজন মানুষকে উপস্থিত করতে হবে, এ ধারণা ঠিক নয়, আর ভাষার জগৎ শুধুমাত্র ব্যক্তি বা অহং-এর অর্থ প্রকাশের জন্য সৃষ্টি, এ ধারণাও ভুল।

কাঠামোবাদের ধারণা অনুযায়ী যে-কোনো লেখার উৎস খোঁজা অর্থহীন, কারণ লিখিত ভাষা মানুষের উচ্চারিত মৌখিক ভাষার পরবর্তী পর্যায়ের একটি প্রকাশ মাত্র। মানুষের অবচেতনে অঙ্কিত ভাষাকাঠামো মুখের ভাষা সৃষ্টি করেছিল এবং এই উচ্চারিত ভাষাকাঠামোই পরবর্তী পর্যায়ে লিখিত ভাষায় উপস্থিত হয়েছে। ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে ভাষা হয়ে ওঠে সময়হীন, মানব বিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, একটি বিবর্তনশীল সার্বভৌম স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা মাত্র। কাঠামোবাদীরা ভাষাব্যবস্থায় কালকেন্দ্রিক কোনো সৃষ্টির বিপ্লব বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবদানও অস্বীকার করেন। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী কালকেন্দ্রিক নান্দনিক উপলব্ধি ভাষার ওপর অলংকার হিসেবে কাজ করলেও, ভাষাকাঠামো সার্বভৌম সত্তায় প্রবহমান একটি সময়হীন অস্তিত্ব হিসেবে ধ্রুব।

কাঠামোবাদী তাত্ত্বিকেরা সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে চান, যেখানে কিছু যুক্তি ও নিয়ম সাহিত্যের রূপ ও স্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করবে এবং এ বিষয়ে তাঁরা কিছুটা হলেও সফল হয়েছেন। লেভেসীয় ও নতুন সমালোচনাতত্ত্বসহ অন্যান্য প্রচলিত সাহিত্য-বিশ্লেষণী পদ্ধতির বিপরীতে কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব উপস্থিত করে একটি নতুন দর্শনকে, যার ফলে প্রচলিত ও ধ্রুপদী ধারণায় গ্রাহ্য 'সাহিত্য-সত্য' ও 'সাহিত্য-বাস্তবতা' যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল উৎস হিসেবে সস্যুরের কাঠামোকেন্দ্রিক ভাষাতত্ত্বকে উপস্থাপন করা যায়। সস্যুরের ভাষাদর্শনকে কেন্দ্র করে রলাঁ বার্থ, জ্যাক ইহ্যারমান, জেরার্ড জেনে, রোমান ইয়াকবসন, ক্লড লেভিস্ট্রাউস, ডেভিড লজ, ভল্‌দিমির প্রপ, এজে গ্রেইমাস, জাভেতান তোদোরভ, জোনাথন কালার প্রমুখ সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা গড়ে তুলেছেন কাঠামোবাদী সাহিত্যে বিভিন্ন সূত্র, প্রকল্প ও ধারণা, যা পরবর্তীকালে উত্তর-কাঠামোবাদেও প্রসারিত হয়েছে।

সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমি

সাহিত্য-সৃষ্টির দর্শন বা সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক যে-কোনো আলোচনা করতে গেলে বস্তু, ধারণা কিংবা বিষয়ের সাথে ভাষাচিহ্নের সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, আর ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আধুনিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে সস্যুরের ভাষাতত্ত্বকে উপস্থিত করতে হয়। সস্যুর ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ তার নিজস্ব অবচেতনে ভাষা সম্পর্কীয় যে সহজাত উপলব্ধি বা নিয়মসমূহকে গ্রাহ্য করে কিংবা পরস্পরের মাঝে ভাব আদান-প্রদানের জন্য ভাষার যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা মানবসমাজের ওপর ক্রিয়াশীল, তাকে সস্যুর ল্যাগ (Langue) হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভাষাচিহ্ন প্রয়োগের ফলে একজন ব্যক্তিমানুষের মনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রকাশ পায় তাকে তিনি বলেছেন প্যারোল (parole)। ভাষাচিহ্নের জৈবিক সংগঠন বা Langue আর প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া বা Parole, যৌথভাবে একটি ভাষাব্যবস্থাকে মূর্তরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করে এবং এ কারণে ভাষা কিংবা সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় সস্যুর কর্তৃক উল্লেখিত ভাষার এই মৌলিক উপাদান দুটোর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ধ্রুপদী দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভাষা হল সময় ও সভ্যতার সাথে বেড়ে ওঠা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার, যেখানে প্রতিটি শব্দ বিভিন্ন বৈশ্বিক বস্তু, বিষয় বা ধারণার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্যুক্ত। ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বে প্রতিটি ভাষাপ্রতীক বা শব্দের বিপরীতে একটি সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের অবস্থান কল্পনা করা যায়, আর ভাষাপ্রতীক বা শব্দসমূহের সাথে বস্তু বা বিষয়ের সম্পর্কও একটা সহজ ও সরল সমীকরণ দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। সমীকরণটি হল–

ভাষাপ্রতীক বা শব্দ = বস্তু বা বিষয়

সস্যুরের ভাষাতত্ত্বে উপরোক্ত সমীকরণটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়, কারণ কোনো শব্দ বা ভাষাপ্রতীক প্রত্যক্ষভাবে কোনো বস্তু বা বিষয়কে উপস্থাপন করে না। একটি শব্দ বা ভাষাপ্রতীক প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র একটি চিহ্নকে নির্ধারণ করে, আর এই চিহ্নের উপাদানও দু'ভাগে বিভক্ত, যাকে দ্যোতক ও দ্যোতিত নামে আখ্যায়িত করা যায়। ভাষা ব্যবহারের সময় কোনো একটি শব্দ উচ্চারিত কিংবা লেখা হলে, একটি চিহ্ন দ্যোতক হিসেবে কোনো একটি বস্তু বা বিষয়কে দ্যোতিত

করে, অর্থাৎ একটি চিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান থাকে অনেকটা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত সমীকরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব–

দ্যোতক
ভাষাচিহ্ন = ...
দ্যেতিত

সস্যুরের তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষাচিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান নির্ধারণ করা গেলেও কোনো বস্তু বা বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা যায় না, ফলে ভাষা একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় ভাষাচিহ্ন, দ্যোতক ও দ্যোতিতের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা সম্পর্ক হিসেবেই উপস্থিত। ভাষাচিহ্ন, দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা যখন রাস্তায় ট্রাফিক বাতির লাল, নীল ও হলুদ আলো দেখি তখন আমাদের অবচেতনে অবস্থিত ভাষাকাঠামোকেই 'লাল', 'সবুজ' ও হলুদ' শব্দচিহ্নকে তিনটি নির্দিষ্ট দ্যোতক ও দ্যোতিতের ধারণা হিসেবে উপস্থিত করে। দ্যোতক লাল রঙ দ্যোতিত হয়ে যে অর্থ প্রকাশ করে তা হল 'থামো', দ্যোতক সবুজের দ্যোতিত অর্থ হয় 'যাও' এবং একইভাবে হলুদ রঙের দ্যোতিত অর্থ 'থামবে না যাবে তা বোঝার জন্য অপেক্ষা করো'। উল্লিখিত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের সাথে বাস্তব অর্থে 'থামা', 'যাওয়া' কিংবা 'অপেক্ষা করার' কোনো সম্পর্ক নেই, বরং প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে রঙের সময় ও অবস্থানকেন্দ্রিক দ্যোতনার সাথে। ভাষাচিহ্ন সৃষ্ট দ্যোতক-দ্যোতনা ও দ্যোতক-দ্যোতনার অর্থও সবসময় স্বেচ্ছাচারী বা Arbitrary, যেমন দ্যোতক লাল শব্দটি দ্যোতিত হয়ে বোঝাতে পারে যুদ্ধ, রক্ত কিংবা সিঁদুরকে, দ্যোতিত সবুজের অর্থ হতে পারে যৌবন, শান্তি, বসন্ত কিংবা ফসলের ক্ষেত আর দ্যোতক হলুদ রঙের দ্যোতিত অর্থ নির্ধারণ করতে পারে জন্ডিস রোগ কিংবা চৈত্রের রোদে পুড়ে যাওয়া কোনো এক দুঃসময়কে। উল্লেখ্য যে, একটি ভাষাচিহ্নের দ্যোতক-দ্যোতনা সবসময় ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যান্য ভাষা-চিহ্ন-সেট বা দলের সাথে তুলনার মাধ্যমে অর্থ পায়। আমরা লাল রঙকে লাল বলে ভাবি কারণ তা সবুজ নয়, হলুদ নয় কিংবা বেগুনি নয় আর সবুজ রঙ হলুদ, লাল, বেগুনি কিংবা বর্ণালীর অন্যান্য রঙের মতো না হওয়ার কারণে আমাদের কাছে সবুজ হিসেবে অর্থবোধক।

ভাষা সবসময় একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন-কাঠামো নিয়ে মানুষের মনে জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় ভাব প্রকাশ ও সংশ্লেষণ করে থাকে এবং এজন্য ভাষাচিহ্ন ও চিহ্ন-কাঠামোবিষয়ক বাস্তব জ্ঞান আমাদের সাহিত্য ও সৃষ্টি সম্পর্কে বাস্তব ও সম্পূর্ণ উপলব্ধি দিতে সক্ষম। ভাষাচিহ্ন সম্পর্কীয় জ্ঞানকে ভাষাচিহ্নবিজ্ঞান বা Semiotics বলা হয়, যাকে আমরা ভাষা ও ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে ব্যবহার করতে পারি।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য কাঠামোবাদ নামে যে তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার উৎস-ধারণা সস্যুরের ভাষাতত্ত্ব বা Semiology-র সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে, সাহিত্য ও ভাষাচিহ্ন-বিজ্ঞান একই তত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত। সস্যুর ভাষাকে বিশ্লেষণ করে যে কাঠামোকে খুঁজে পেয়েছেন, সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য ঠিক একই রকম একটি কাঠামো ব্যবহার করা সম্ভব, এ ধারণাটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বে।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে ভাষাব্যবস্থার বিশেষ কতগুলো মৌলিক উপাদান নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন ভাষা-দার্শনিক। দার্শনিক পিয়ার্সের মতে– ভাষাচিহ্নকে তিনটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব:

১. চিত্রমূলক: যা বিষয় বা বস্তুর চিত্রের মাধ্যমে দ্যোতিত করে, যেমন– ট্রাফিক সিগন্যালে রেললাইনের ছবির অর্থ, সামনেই রেললাইন রয়েছে, অতএব সাবধান!

২. অনুষঙ্গমূলক: যা বিষয় বা বস্তুকে পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা ধারণার সাথে তুলনা করে অর্থ দেয়, যেমন– ধোঁয়ার চিহ্ন দেখে আগুনের অস্তিত্ব ভাবা সম্ভব আর মেঘের চিহ্ন দেখে ভাবা যায় বৃষ্টি হবে বা হচ্ছে।

৩. প্রতীকমূলক: যা বিষয় বা বস্তুকে একটা স্বেচ্ছাচারী বা Arbitrary চিহ্ন থেকে অর্থ দেয়, যেমন– মানুষের কথা বা লিখিত ভাষা।

সাহিত্যতত্ত্ববিদ রলাঁ ভাষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে ভাষার মূল উপাদান হিসেবে কিছু 'অণুধ্বনি' বা চযড়হবসব-কে নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি মনে করেন যে অনুধ্বনি বা ফোনেম হল ভাষার সর্বনিম্ন পর্যায়ভুক্ত উপাদান, যা একজন মানুষকে অর্থ যোগান দিতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, অণুধ্বনি বা ফোনেমের অর্থ সবসময়ই ভাষাব্যবস্থায় অবস্থানকারী অন্য কোনো অণুধ্বনি বা ফোনেমের সাথে তুল্য হওয়ার পরই অর্থ বহন করে। অণুধ্বনির এ রকম তুলনামূলক প্রকাশকে কেন্দ্র করে অনেক সময় অর্থ সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়। রলাঁ বার্থ তাঁর বিখ্যাত বই S/Z-এ এই বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বালজাকের Sarrasine শব্দটি লিখিত ও পঠিত ধ্বনিরূপককে উদাহরণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। Sarrasine শব্দটিকে উচ্চারণ করলে 'সেরাজিন'-(z) ধ্বনি শুনতে পাই কিন্তু অনুচ্চারিত অবস্থায় (s)-ই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় এমন আরও অনেক শব্দ রয়েছে যার ধ্বনিরূপ এক হলেও লিখিতরূপ ভিন্ন। যেমন Sbin উচ্চারণ করলে আমরা Spin শুনতে পারি আর Pin ও Spin-এর অন্তর্ভুক্ত p অক্ষরের উচ্চারণও এক নয়। বাংলা ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ আছে যার উচ্চারিত রূপ একই রকম বা কাছাকাছি। অংশ-অংস, অর্ঘ-অর্ঘ্য, দ্বীপ-দীপ, দেশ-দ্বেষ ইত্যাদির মতো প্রায় সমুচ্চারিত

ভাষাচিহ্নের দ্যোতক-দ্যোতিতের ধারণা ভাষাচিহ্নটির অবস্থান, পরম্পরা ও একই বাক্যে উচ্চারিত অন্যান্য দ্যোতক-দ্যোতিতের পরিপ্রেক্ষিতে করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমুচ্চারিত শব্দের লিখিত রূপে ভাষাচিহ্ন নিজেই অর্থপূর্ণভাবে দ্যোতক-দ্যোতনার সৃষ্টি করতে পারে। ভাষাব্যবস্থার মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যাকরণ, বাক্য গঠনের নিয়মকানুন ও ধ্বনি প্রয়োগের বিন্যাস ইত্যাদি কিভাবে, কোন অবস্থায় অর্থবোধক হয়ে ওঠে তা সঠিকভাবে উন্মোচন করা হল কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে ভাষা-দার্শনিক রলাঁ বার্থ বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন তাঁর লেখা থিমোলজি, সিসটেম ডে লা মোড ও এলিমেন্টস অব সেমিওলজি, S/Z নামক বইগুলোতে। ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে ভাষাচিহ্ন কিভাবে অর্থবোধক হয়ে ওঠে তা বোঝার জন্য রলাঁ বার্থ বিভিন্ন যুক্তি ও উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে যে কোনো ভাষাব্যবস্থায় (Langue) মুখের ভাষা বা Parole-এর অবস্থানই মুখ্য, কারণ ভাষাব্যবস্থার যে কোনো পরিবর্তন মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। ভাষাব্যবস্থার উপাদান হিসেবে মুখের ভাষার অবস্থান কী ও কোন পর্যায়ের, তা বোঝানোর জন্য বার্থ একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন যা মানুষের পোশাক-ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের সবার কাছে বিভিন্ন সেট বা দলের কাপড় থাকে যা বিভিন্ন সময়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গি, ধুতি ও এই শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য কাপড় কোমর থেকে নিচের অংশ ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হলেও একই সাথে সবগুলোকে পরিধান করা যায় না। মধ্য-শরীরে ব্যবহারের জন্য গেঞ্জি, শার্ট, কোট, ব্লাউজ ইত্যাদির সমান্তরাল কাপড়ের সেট ও মাথার জন্য ক্যাপ, হ্যাট, কিস্তিটুপি, পাগড়ি ইত্যাদির সমান্তরাল সেট মজুত থাকলেও, একই সাথে দলের সবগুলো পোশাক গায়ে চাপানো বাস্তবে অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সমান্তরালে অবস্থানকারী কাপড়ের সেটকে অন্য কোনো সমান্তরালে অবস্থিত সেট দিয়ে বিনিময় করা যায় না, কারণ শার্ট বা ব্লাউজের স্থান কোনো অবস্থাতেই প্যান্ট কিংবা টুপি দিয়ে পূরণযোগ্য নয়। বাস্তবে ব্যবহারের সময় বিভিন্ন সেট বা দল থেকে একটি করে কাপড় নিয়ে 'লুঙ্গি-গেঞ্জি-কিস্তিটুপি' কিংবা 'প্যান্ট-শার্ট-ক্যাপ'–এরকম একটা ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের সাজাই। রলাঁ বার্থ ভাষাতেও এমন একটা অবস্থার কথা চিন্তা করেছেন যেখানে বিভিন্ন ভাষাচিহ্ন, সেট বা দল হিসেবে, ভাষাব্যবস্থা বা Langue-এ অবস্থান করে এবং মুখে বলার সময় কিংবা লেখার সময় যৌক্তিকভাবেই আমরা বিভিন্ন সেট থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাচিহ্ন তুলে নিয়ে মনের ভাব আদান-প্রদান করি। এখানে উল্লেখ করা উচিত, কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা সেটে বা দলে উপস্থিত ভাষাচিহ্নকে অন্য সমান্তরালে অবস্থিত ভাষাচিহ্নের সাথেই সাধারণত ব্যবহার করা সম্ভব।

ভাষাতত্ত্বের মৌলিক উপাদানসমূহকে সাহিত্যসৃষ্টি ও বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা যায়, এমন একটি ধারণাকে সামনে রেখে কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা ভাষাকাঠামোর মৌলিক উপাদানগুলো দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী যে-কোনো বিবরণমূলক লেখার প্রেক্ষাপটে ভাষাতত্ত্বের মৌলিক উপাদানসমূহ ও বাক্যগঠন প্রণালীর ভূমিকা থাকে মুখ্য। ভ্লাদিমির প্রপ রাশিয়ার বিভিন্ন রূপকথা বিশ্লেষণ করে এ ধারণা প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং তাঁর মতে রূপকথা সৃষ্টির পেছনে একত্রিশটি মৌলিক আপেক্ষক বা

function কাজ করে। প্রপের দেওয়া আপেক্ষকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাতটি আপেক্ষক হল:

১. নায়ককে একটি কঠিন কাজ করতে বলা হল
২. নায়ক কাজটি সমাধান করল
৩. নায়ক মূল্যায়িত হল
৪. খল-নায়ক বা ভিলেনের চরিত্র উন্মোচিত হল
৫. ভিলেনকে নতুন রূপে দেখা গেল
৬. ভিলেনকে শাস্তি দেওয়া হল
৭. নায়ক রাজকন্যাকে বিয়ে করে সিংহাসনে আরোহণ করল বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন রূপকথাকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা ঠিক একই রকম একটি কাঠামো উদ্ধার করতে পারি। আমাদের দেশের প্রচলিত রূপকথার উপাদান হিসেবে 'এক দেশে ছিল এক রাজা'... 'রাজার ছিল সুয়োরানী আর দুয়োরানী'... 'সন্নাসীর দেওয়া ফল খেয়ে দুয়োরানী জন্ম দিলেন রাজকুমারের'... 'সুয়োরানী রাজকুমারকে হত্যা করতে চায়'... 'রাজকুমার শিকারে গেল'... 'ব্যাঙমা ব্যাঙমীকে বলল'... 'নীলপরী আর লালপরী ঘুমন্ত রাজকুমারকে রাজকন্যার দেশে নিয়ে গেল'... 'ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য পাগল হল'... 'রাজকুমার রাজত্ব ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়'... 'সন্ন্যাসী রাজকন্যা উদ্ধারের উপায় বলে দেন'... 'রাক্ষসের দেশে রাজপুত্র গেল'... 'রাক্ষসের প্রাণ-ভোমরা মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল'... 'সুয়োরানীর শাস্তি হল'... 'রাজকুমার রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখী হল'... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উপরিউক্ত যে রূপকথা-কাঠামো উপস্থাপন করা হল, এ কাঠামো আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য, তবে নায়ক রাজকুমার না হয়ে একজন রাখাল-ছেলে হতে পারে কিংবা রাজপুত্রের প্রেম হতে পারে কোনো এক বেদের মেয়ের সাথে, আর ভিলেন হিসেবে নায়ক বা নায়িকার পিতা-মাতাকে দেখাও সম্ভব।

প্রপের উপস্থাপিত রূপকথার সাতটি আপেক্ষক বা function শুধুমাত্র রাশিয়া বা অন্যান্য দেশের রূপকথার জন্যই প্রযোজ্য, এ কথা ভাবা ঠিক নয়, কারণ বিভিন্ন দেশের মিথ, কাব্য, গল্প ও উপন্যাস বিশ্লেষণেও এ আপেক্ষকগুলোর প্রয়োগ করা চলে। প্রথমে আসা যাক মিথের প্রসঙ্গে। ইলিয়াড, অডেসি, রামায়ণ, মহাভারত এবং এ ধরনের বিভিন্ন গ্রন্থের ঘটনা বিশ্লেষণ করলেও ভ্লাদিমির প্রপের আপেক্ষকগুলো সনাক্ত করা যাবে। মানুষের অবচেতনে সংরক্ষিত ভাষাকাঠামোর রূপ ও স্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোত্রে বা সমাজে প্রায় একই রকম হওয়ার ফলে রাম-রাবণের রামায়ণ ও কুরু-পাণ্ডবের মহাভারতের সাথে ইলিয়াড ও অডেসির ঘটনার কাঠামোগত মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মাইলেসীয় দার্শনিকদের বক্তব্যের সাথে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের যে মিল খুঁজে

পাওয়া যায় তার মূল কারণ হিসেবেও উপস্থিত মানবিক অবচেতনে অঙ্কিত ভাষাকাঠামোর সর্বজনীন রূপ।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ভাষাকাঠামোর আপেক্ষকগুলোকে প্রয়োগ করা চলে। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে (আপাতদৃষ্টিতে নায়িকা ও ভিলেনহীন) আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী' উপন্যাসের কাঠামো বিশ্লেষণ করা যাক, যেখানে বুড়ো সান্তিয়াগো একজন আদর্শ সংগ্রামী মানুষ হিসেবে নায়ক কিংবা রাজপুত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর স্বপ্নের রাজকন্যা বা নায়িকা হচ্ছে একটি বিশাল মার্লিন মাছ, যাকে পঁচাশি দিন পর বৃদ্ধ সান্তিয়াগো তাঁর বড়শিতে ধরতে পেরেছেন। মাছটি কিংবা রাজকন্যাকে নিয়ে ঘরে ফেরার পথে, একদল হাঙর-ভিলেন সান্তিয়াগোর রাজকন্যাকে কেড়ে নিতে চায় আর রাজপুত্র সান্তিয়াগো যুদ্ধ করতে থাকেন ভিলেনদের সাথে। সান্তি য়াগো যুদ্ধে পরপর অনেকগুলো হাঙর আহত কিংবা মারতে পারলেও শেষ পর্যন্ত রাজকন্যাকে বা মাছটিকে ভিলেনদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। ঘটনাটির একটি সাময়িক ট্রাজিক সমাপ্তি হলেও, নায়ক বা বুড়ো সান্তিয়াগোর সংগ্রামী চরিত্র স্বপ্নের ইতি টানে না। একজন পাঠকের মন উপন্যাসের অব্যক্ত আগামী কাঠামোতে রাজপুত্র সান্তিয়াগোর রাজকন্যা লাভের আশা পূর্ণ হতে দেখে এবং চিন্তা করে একজন মানুষ কিংবা রাজপুত্র ধ্বংস হতে পারে কিন্তু কখনো পরাজিত হয় না। বাংলাভাষাসহ উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষায় লেখা প্রচলিত ও জনপ্রিয় উপন্যাসের কাঠামোও প্রায় একই রকম, যাকে আমরা নিম্নোক্ত বিন্যাসে উপস্থাপন করতে পারি:

১. প্রেমের উপন্যাস

ক. একটি ছেলে ও একটি মেয়ের প্রেম, গরিবের মেয়ের সাথে বড়লোকের ছেলের প্রেম কিংবা তার উল্টোটা।

খ. নায়ক/নায়িকার বিয়েতে বাবা-মার আপত্তি অথবা নায়ক ও নায়িকার মাঝে ভুল বোঝাবুঝি।

গ. পুরুষ কিংবা মহিলা ভিলেনের আবির্ভাব।

ঘ. নায়ক-নায়িকার বিরহ।

ঙ. ভিলেনের স্বরূপ উন্মোচন ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান।

চ. নায়ক-নায়িকার মিলন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রাজিক সমাপ্তি।

২. সামাজিক উপন্যাস

ক. নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের বিভিন্ন সুখ ও দুঃখের বিবরণ, যা পরিবারের বিভিন্ন চরিত্র ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। উচ্চবিত্তের বেলায় পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খল জীবনের প্রকাশ মুখ্য হয়ে ওঠে।

খ. নায়ক, নায়িকা কিংবা কোনো একটি চরিত্রকে আদর্শ চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রতিটি চরিত্রের দোষ-গুণ উপস্থাপন করা।

গ. প্রেমের উপন্যাসের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়, যার বিস্তারিত বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে।

৩. রাজনৈতিক উপন্যাস

ক. শোষকশ্রেণী হিসেবে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, জোতদার, জমিদার ও আমলা-শ্রেণীকে উপস্থাপন করা এবং রাজনৈতিক বক্তব্যকে পরোক্ষভাবে উপস্থিত করা।

খ. সামাজিক উপন্যাসের অন্যান্য উপাদানগুলো উপস্থিত থাকে যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত উপন্যাসের যে কাঠামো দেওয়া হল তার বাইরেও কিছু জটিল উপন্যাস থাকে যেগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় ও কাঠামোতে বিশ্লেষণ করতে হয়। ক্লদ লেভি স্ট্রাউস ঈদিপাস মিথের কাঠামো বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু অনুপুরাণ বা সুঃযবসবং-এর উল্লেখ করেছেন। অনুপুরাণের উপাদানে কিছু যুগ্ম-বৈপরীত্য (bianary opposition) অবস্থান করে, যা ভাষার মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ঈদিপাস মিথের যুগ্ম-বৈপরীত্যে মানুষের সৃষ্টি বিষয়ক দুটো ভিন্ন থিসিস বা ধারণাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যুগ্ম বৈপরীত্যগুলো হল:

১. জড় মৃত্তিকা থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে।

২. যৌন ক্রিয়ার ফলেই মানুষের জন্ম হয়।

উপরিউক্ত যুগ্ম-বৈপরীত্য দুটোকে কেন্দ্র করে ঈদিপাস মিথে বিভিন্ন অনুপুরাণ বা মিথেম আবর্তিত হয়েছে এবং সৃষ্টি করেছে ভিন্ন দুটো এন্টিথিসিস, যাকে নিম্নোক্ত ধারণা দিয়ে ব্যক্ত করা যায়:

১. অতি-আত্মীয়তার বন্ধন-হেতু ঈদিপাস তার মাকে বিয়ে করল আর এন্টিগন তার ভাইকে কবর দিল আইনকে অমান্য করে।

২. আত্মীয়তার বন্ধনহীন অবস্থায় ঈদিপাস তার বাবাকে হত্যা করল আর এটেওক্লেস মেরে ফেলল তার ভাইকে।

উল্লিখিত যুগ্ম-বৈপরীত্যে অতি-আত্মীয়তার যৌনকেন্দ্রিক সম্পর্ক ও জড়বস্তুকেন্দ্রিক অনাত্মীয়তাবোধকে খুঁজে পাওয়া যায়, যা ঈদিপাস মিথের কাঠামোকে মানুষের অবচেতনে অঙ্কিত ভাষা ও চিন্তাকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে উন্মোচিত করে। লেভি স্ট্রাউস ঈদিপাসের বিশ্লেষণে বর্ণনাকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর প্রাধান্য ছিল মিথটির কাঠামোবিন্যাসের ওপর, যা মিথটিকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে।

এ,জে গ্রেইমাস রাশিয়ান রূপকথাভিত্তিক প্রপের সাতটি আপেক্ষক বিবেচনা করে তিনটি যুগ্ম-বৈপরীত্য উপস্থাপন করেন, যা দিয়ে যে-কোনো বর্ণনার কাঠামোকে বিশ্লেষণ করা যায়। গ্রেইমাসের যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলো হল:

উদ্দেশ্য/বিধেয়

প্রেরক/প্রাপক

সাহায্যকারী/বাধাদানকারী

উপরোক্ত তিনটি যুগ্ম-বৈপরীত্য, নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ নিয়ে, যে-কোনো বর্ণনামূলক সাহিত্যকর্মের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারে।

ক. ব্যক্তির কামনা ও কামনা পূরণের জন্য উৎস খোঁজা, যাকে আমরা ব্যক্তির লক্ষ্য বলে বিবেচনা করি (উদ্দেশ্য/বিধেয়)

খ. বিভিন্ন চরিত্রের মাঝে যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান (প্রেরক/প্রাপক)

গ. কামনা পূরণের পথে সাহায্যকারীর বা বাধাদানকারীর ভূমিকা (সাহায্যকারী/বাধাদানকারী)

জেভেতান তোদোরভ ঈদিপাস সম্পর্কিত প্রপ ও গ্রেইমাসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেন যে, কোনো বর্ণনামূলক সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম একক হল বিবৃতি বা proposition, যা কোনো ব্যক্তি কিংবা ক্রিয়াও হতে পারে। তোদোরভ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈদিপাস মিথের বিবৃতি বা proposition-কে খুব সহজে উপস্থাপন করা যায়, যেখানে ক ঈদিপাস, খ ইয়োকাস্টা এবং গ লাইয়স। এবার ক, খ ও গ-কে নিয়ে বিবৃতির কাঠামো কেমন হতে পারে দেখা যাক-

ব্যক্তি	ক্রিয়া
ক, একজন রাজা	ক, খ-কে বিয়ে করল
খ, ক-এর মা	ক, গ-কে মেরে ফেলল
গ, ক-এর বাবা	

তোদোরভের মতে কতগুলো বিবৃতি দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, যা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ নেয়। বিবৃতির এই পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বিভিন্ন স্তরে দেখানো যায়। স্তরগুলো হল:

ভারসাম্য (শান্তি)

শক্তি-১ (শত্রুর আক্রমণ)

ভারসাম্যহীনতা (যুদ্ধ)

শক্তি-২ (শত্রুর পরাজয়)

ভারসাম্য (নতুন শান্তি)

কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক জেরার্ড জেনে বিবরণমূলক সাহিত্যকে রুশ প্রকরণবাদীদের মতো কেবলমাত্র গল্প ও ঘটনাপরম্পরাতে বিভক্ত করেননি। তাঁর মতে বিবরণমূলক সাহিত্যের উপাদান হল গল্প (story), বক্তব্য (discourse) এবং বর্ণনা (description) যা ক্রিয়ার কাল, প্রকার ও বাচন দ্বারা নির্ধারিত।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় জেনে তিনটি যুগ্ম-বৈপরীত্যকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটি হল 'বর্ণনা/উপস্থাপনা', যা আমরা আরিস্ততলের পোয়েটিকস্-এ পাই। ধ্রুপদী ধারণা অনুযায়ী লেখক যখন তাঁর নিজের ভাষায় কোনো বিষয় বা বস্তুকে বোঝাতে চান তখন তা হয় বর্ণনা, আর লেখক যখন নিজেই চরিত্র হয়ে কিছু বলেন তখন তাকে বলা হয় উপস্থাপনা। জেনে এই যুগ্ম-বৈপরীত্য অস্বীকার করে বলেন যে, একজন লেখকের সব ধরনের লেখা আসলে বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। দ্বিতীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য হিসেবে বর্ণনা/বিবরণ-কে নির্ধারণ করা হয়, যেখানে বর্ণনার সম্পর্ক থাকে ঘটনার সাথে আর বিবরণ যুক্ত থাকে বস্তু ও ব্যক্তিকে নির্ধারণ করার জন্য। এই যুগ্ম-বৈপরীত্য সম্পর্কে জেনের বক্তব্য হল, যে-কোনো বর্ণনা বা বিবরণমূলক সাহিত্যের জন্য বর্ণনাই মুখ্য, আর বিবরণের অবস্থান থাকে শুধুমাত্র অলঙ্কার হিসেবে। তৃতীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য হল 'বর্ণনা/বক্তব্য' নিয়ে, যেখানে বর্ণনার বেলায়, কে বর্ণনা করছে তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু বক্তব্যের বেলায় কে বক্তব্য দিচ্ছে তা নির্ধারণ করতে হয়। জেনে এ যুগ্ম-বৈপরীত্যকেও

অস্বীকার করে বলেন যে, সব বর্ণনাই যেহেতু একটি উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু বক্তব্যকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বে প্রতীকের সৃষ্টি সম্পর্কেও বিভিন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে। রোমান ইয়াকবসন তাঁর কাব্যতত্ত্বে Aphasia বা ভাষাবিচ্যুতি সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা ভাষাকাঠামোকেন্দ্রিক, কারণ বিভিন্ন ভাষাচিহ্নের সেটে বা দলে অবস্থানকারী চিহ্নসমূহের অযৌক্তিক বিন্যাসের কারণেই প্রতীকের সৃষ্টি হয়। রলাঁ বার্থের পোশাক ব্যবস্থার উদাহরণকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। পোশাকের খাড়া ও সমান্তরাল সেটের উপাদানগুলোকে শুধুমাত্র অন্য একটি খাড়া ও সমান্তরাল সেটের সাথেই বিনিময় করা সম্ভব। কিন্তু খাড়া সেটের উপাদানকে সমান্তরাল সেট দিয়ে পূরণ করতে গেলে 'প্যান্ট-লঙ্গি-টুপি'-জাতীয় একটা ব্যবস্থা উপস্থিত হয়, যেখানে লুঙ্গি, শার্টের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভাষাব্যবস্থায়ও এ রকম বিচ্যুতি সম্ভব আর এর ওপর ভিত্তি করে ইয়াকবসন রূপক ও প্রতীকের উৎস হিসেবে ভাষাচিহ্নের 'সান্নিধ্য-বিচ্যুতি' ও 'সাদৃশ্য-বিচ্যুতি'কে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডেভিড লজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন modernism বা আধুনিকতা রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আধুনিকতার বিপরীতে (anti-modernism) থাকে প্রতীকহীন বাস্তবতার অবস্থান। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন আমাদের পরিচিত ভাষাব্যবস্থায় এমন কিছু চিন্তা ও ধারণা উপস্থিত করছে যা সহজেই রূপক ও প্রতীকের সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে বর্তমানের কম্পিউটারকেন্দ্রিক ভাষাচিহ্ন সেটকে মানুষের জীবনকেন্দ্রিক ভাষাচিহ্ন সেটের সাথে বিনিময় করা যায় এবং যার ফলে ভাষাচিহ্নের সাদৃশ্য-বিচ্যুতি ঘটিয়ে 'হৃদয়'-কে বলা সম্ভব 'সফট্ওয়্যার' কিংবা শরীরের প্রতীকী রূপ হতে পারে 'হার্ডওয়ার'। কাঠামোবাদী কাব্যতত্ত্বের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যেতে পারে যে প্রতীক ও অনুষঙ্গের ব্যবহার দেশ-কাল-মাত্রাকে গ্রাহ্য করে উপস্থিত এবং দেশ-কালের প্রভাবেই কাব্য-কাঠামোর ওপর বিভিন্ন প্রতীক ও অনুষঙ্গ অলংকার হিসেবে সংযোজিত হচ্ছে।

জোনাথন কালার কাঠামোবাদী কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে নোয়াম চমস্কির ভাষা বিষয়ক যোগ্যতা (competence) ও কৃতি (performance)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। চমস্কি তাঁর তত্ত্বে বলেন যে, একজন মানুষ কোনো একটি ভাষাব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জনের পরে তার অবচেতনের সংরক্ষিত ভাষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে কিংবা প্রকাশিত ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়। ভাষাকেন্দ্রিক ভাব প্রকাশ ও প্রকাশিত ভাষার অর্থ উদ্ধারের ক্রিয়াকে চমস্কি Performance বা কৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জোনাথন কালার চমস্কির এ তত্ত্বকে কাব্যবিশ্লেষণে ব্যবহার করে বলেন যে, কাব্যতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য বা ক্রিয়া কখনো স্রষ্টা, কবি কিংবা তার সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না বরং সৃষ্টির সত্য ও অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে কাব্যতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। কালারের এ মন্তব্য সৃষ্টিকে স্রষ্টার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে ফেলে আর পাঠকের Competence ও Performance-কে উপস্থিত করে সৃষ্টির মুখোমুখি। পাঠককে সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করার ফলে পাঠকের যোগ্যতা ও কৃতিনির্ভর অর্থ উদ্ধারের কাঠামো বা প্রক্রিয়াকে জানা যেতে পারে, কিন্তু একজন কবি বা স্রষ্টা কোন কাঠামো বা নিয়ম ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছেন তা নির্ধারণ করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। কালারের

কাব্যতত্ত্বের কাঠামো সবসময় পাঠককেন্দ্রিক এবং একজন পাঠকের অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া বা কাঠামোকে নির্ধারণ করার জন্যই এ তত্ত্ব প্রযোজ্য।

জোনাথন কালার তাঁর কাঠামোবাদী কাব্যতত্ত্বে কবিতার শরীর ও উপস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বাক্য গঠনের প্রণালী, বাক্যের লিখিত বা মুদ্রিত বিন্যাস, যতিচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি পাঠকের Competence ও performance-কে বিভিন্ন মাত্রায় উন্মোচিত করতে পারে। কালার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। একটি কবিতার তিনটি লাইনকে কেন্দ্র করে পাঠকের অনুভূতি কীরকম হতে পারে তা দেখিয়েছেন তিনি। কবিতাটি হল:

Night is generally my time for walking:
It was the best of times, it was the worst of times;
Concerning the exact year there is no need to be precise.

কবিতাটি বিভিন্ন পাঠককে পড়তে দিলে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়। একজন পাঠক night, time, times ও year শব্দগুলোর কালকেন্দ্রিক উপলব্ধিসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে কবিতাটি বিশ্লেষণ করতে চান এবং আর-একজনের কাছে প্রাধান্য পায় 'was' এবং 'is'-এর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। কবিতাটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো এক পাঠক সময়ের তিনটি ভিন্ন অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে কবিতার ব্যঞ্জনা ছিল সময়ের specific, contradictory ও non-specific রূপকে কেন্দ্র করে। পাঠককেন্দ্রিক কবিতা-বিশ্লেষণ পাওয়ার পর কালারের ঘোষণা ছিল, কবিতার সৃষ্টির পেছনে কোনো কবি নেই, ডিকেন্সের A Tale of Two Cities, The Old Curiosity এবং Our Mutual Friend নামক তিনটি উপন্যাস থেকে প্রথম তিনটি লাইন তুলে নিয়ে, তিনি নিজেই কবিতাটি সাজিয়েছেন। উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কবির অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি কবিতাই তার নিজস্ব কাঠামো, বিন্যাস ও বক্তব্য নিয়ে পাঠকের চিন্তা-কাঠামোতে (যা ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয়) ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা অনুভূতির সৃষ্ট করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, পাঠকের ভাষাকাঠামোভিত্তিক কাব্যসমালোচনায় কোনো নির্দিষ্ট ও সর্বজনীন নিয়ম বা যুক্তিকে পাওয়া যায় না, ফলে কাব্য সমালোচনার জন্যে কালারের কাব্যতত্ত্ব কতটা প্রযোজ্য, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়।

অনুচিন্তন

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের যে উপাদানসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রবন্ধে আলোচিত হল তা কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ নয়। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়াগ নিয়েও চিন্তা করা আবশ্যক। এখানে উল্লেখ্য যে কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব যেহেতু সাহিত্য-সৃষ্টি ও সমালোচনার প্রকৃত বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি সেহেতু পরবর্তীকালে উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নামে একটি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। জাক দেরিদা, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, জাক লাকাঁ, পল দ্য মান, হেডেন হোয়াইট, রলাঁ বার্থ, এডওয়ার্ড সায়ীদ প্রমুখ সাহিত্যতত্ত্ববিদ-দার্শনিকেরা উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন, যার মাঝে দেরিদার Deconstruction বা বিনির্মাণের সাহিত্যদর্শন খুবই উল্লেখযোগ্য।

হাইডেগার-এর সত্তাবিজ্ঞান, ভাষাদর্শন ও নন্দনতত্ত্ব

পূর্বকথা

মার্টিন হাইডেগার ছিলেন বিংশ শতাব্দীর এমন এক দার্শনিক যিনি বর্তমান প্যারাডাইমগ্রাহ্য বিশ্বদর্শন ও চিন্তাতে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট অঞ্চলের মেসকির্খে হাইডেগার-এর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল কন্‌স্টান্‌জের এবং ফ্রাইবুর্গ জিমনাসিয়ামে। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ধর্মবিদ্যা অধ্যয়ন করার পর ১৯১৪ সালে হাইডেগার দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯২০ সালে ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন বিখ্যাত দার্শনিক, চেতনচিত্রবাদের (Phenomenology) প্রবক্তা, অধ্যাপক এডমুন্ড হুসার্লের সহকারী হিসেবে। ১৯২২ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন হাইডেগার। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়, ১৯২৭ সালে, প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Sein und Zeit (Being and Time), যা পরবর্তীকালে বিশ্বদর্শন ও চিন্তায় কিছু অতি-উজ্জ্বল কিন্তু বিতর্কিত তত্ত্ব-ধারণা সংযোজন করেছিল। ১৯২৮ সালে অধ্যাপক হুসার্ল অবসর গ্রহণ করার পর হাইডেগার ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯৩৩ সালে নিযুক্ত হন ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হিসেবে। ফ্রাইবুর্গে কর্মরত থাকাকালীন অবস্থায় হাইডেগার নাৎসি জার্মানি প্রধান হিটলারের কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। জার্মান জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই হাইডেগার হিটলারের পক্ষ নিয়েছিলেন, এমন ধারণা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত হাইডেগার একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসেবেই চিহ্নিত ছিলেন এবং ফ্যাসিবাদের সমর্থক হিসেবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করতে পারেননি। ১৯৫১ সালে তিনি আবার দর্শনশাস্ত্রের সম্মানিত অধ্যাপক হিসেবে ফ্রাইবুর্গে যোগদান করেছিলেন এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করার পর অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও (১৯৬৭ পর্যন্ত) তিনি সক্রিয়ভাবে দর্শনবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনাসভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৭৬ সালের ২৬ মে হাইডেগার তাঁর জন্মস্থান মেসকির্খে পরলোকগমন করেন।

হাইডেগার ছিলেন ফরাসি ও জার্মান ঐতিহ্যবাহী দর্শনজগতের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ইংরেজ দার্শনিকেরা হাইডেগার ও তাঁর দর্শনকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না মোটেই। এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর History of the Western Philosophy-বইতে হাইডেগার-এর নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। হাইডেগারের দর্শন দুর্বোধ্য, অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভাষা-রহস্যবাদী, শব্দ-চাতুর্য-পরিপূর্ণ, অর্থহীন, ইত্যাদির মতো বিভিন্ন মন্তব্য করে হাইডেগারীয় দর্শনতত্ত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। কিন্তু হাইডেগারীয় দর্শনের সত্যকেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এ সময়ের অনেক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। প্লাতো, আরিস্ততল, দেকার্ত, লাইবনিৎস, হেগেল, প্রমুখ দার্শনিকদের মতো তিনিও ছিলেন মৌলিক দর্শনের প্রবক্তা, এ রকম মন্ত

ব্যও শোনা গেছে অনেক স্বনামধন্য দার্শনিকের কাছ থেকে। হাইডেগারের মৃত্যুর পর কয়েকজন ফরাসি দার্শনিক এমনও বলেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দী যেমন দেকার্ত ও নিউটনের যুগ, তেমনি আমাদের যুগ (বিংশ শতাব্দী) হাইডেগারের যুগ। জার্মানি এবং ফ্রান্সের দার্শনিক জাঁ পল সর্তর, গাদামার, দেরিদা, রেনে শার, পল সেলাঁ এবং এমন আরও অনেকেই হাইডেগার-এর দর্শন ও তত্ত্ব দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সঙ্গত কারণেই হাইডেগারকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। হান্না আরন্ট্ হাইডেগার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন– 'বিশ শতকের দার্শনিক অনুভূতিতে মার্টিন হাইডেগার ছিলেন চিন্তার এক গোপন রাজা'। 'চিন্তার গোপন রাজা'– এ রকম একটা বিমূর্ত অনুভূতি প্রকাশের মূলে অবস্থান করে হাইডেগারীয় দর্শনের প্রকাশভঙ্গি, যা অনেক ক্ষেত্রে জাগতিক যুক্তির ভাষাকে অতিক্রম করে এক রহস্যময়, অস্পষ্ট ও দুরূহ ভাষা-বিন্যাসকে উপস্থিত করেছে। জাগতিক যুক্তির ভাষা সবসময় সত্য প্রকাশের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বিংশ শতাব্দীর ভাষাদর্শন অবশ্য এ সত্যই বলে। বর্তমান প্যারাডাইমগ্রাহ্য ভাষাদর্শনের এ তত্ত্বটি গ্রহণ করে, এ কথা হয়তো বলা যায় যে, হাইডেগার জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় সত্যদর্শন উপস্থাপন করার জন্যই কবিতার মতো বিমূর্ত, অস্পষ্ট ও রহস্যময় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। একটি কবিতা থেকে সত্য উদ্ধার করার সময় একজন পাঠকের যোগ্যতা ও কৃতি যে ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত থাকে, ঠিক সে রকম যোগ্যতা ও কৃতি দিয়েই হাইডেগার-এর দর্শন থেকে সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব, এ কথা ভাবা বোধহয় অযৌক্তিক নয়।

হাইডেগার তাঁর কর্মজীবনে দর্শন সম্পর্কীয় যা কিছু রচনা করেছেন তার সবগুলো এখনো প্রকাশিত হয়নি। সাতান্ন খণ্ডে প্রকাশিতব্য 'হাইডেগার-সমগ্রে'র মাত্র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হাইডেগার-এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে What is Philosophy? The Question of Being; Introduction to Metaphysic; Being and Time; Kant and the Problem of Metaphysics; What is a Thing? What is Called Thinking? Identity and Difference; Discourse on Thinking; Poetry, Language, Thought; The End of Philosophy; The Basic Problems of Phenomenology; The Metaphysical Foundation of Logic; On the Way to Language; Existence and Being প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হাইডেগার-এর সত্তা ও সময়দর্শন

Sein und Zeit গ্রন্থে হাইডেগার সত্তা (being) নিয়ে তাঁর চিন্তা-দর্শন উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই চেষ্টা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হাইডেগার-এর উক্তি "Auf einen stern zugeher, nur......., অর্থাৎ একটা তারার দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র এই– alles ist weg-সবই তো পথ, সবটাই পথময়, ein kaum vernehmbares versprechen– যা বলা হচ্ছে তা 'শোনা যায় কি যায় না' এমন এক ধরনের শপথ কিংবা ভাষাবিচ্যুতি।' মার্টিন হাইডেগার তাঁর দর্শন অন্যান্য দার্শনিকের মতো সাদামাটা প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করেননি। আমরা হাইডেগার-এর মাঝে খুঁজে পাই একজন কবিপুরুষকে, যিনি প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় এমন সব বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন নতুন ভাষাবিন্যাসে কিংবা ব্যবহার করেছেন কবিতার ভাষা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সত্তা বিষয়ে হাইডেগার বলেন–

'Doch das Sein—was ist das Sein? Es ist es selbst. Dies zu erfahern und zu sagen, muss das kunftige Denken lernen. Das 'Sein'—das its nicht Gott und nicht ein Weltgrund. Das Sein ist weiter denn alles Seiende und ist gleichwohl dem menschen naher als jedes Seiende, sie dies ein Fels, ein Tier, ein kunstwerk, eine Maschine, sei es ein Engel order Gott. Das Sein ist das Nachste. Doch die Nahe bleibt dem Menshen am weitestem'.

অর্থাৎ,

'কিন্তু মৌলসত্তা–মৌলসত্তা কী? সে তো নিজেই নিজেকে ধারণ করে। আগামীর চিন্তা, যে চিন্তার উদয় হবে, তার উচিত এই বিষয়টিকে অবশ্যই অনুধাবন করা এবং এ সম্পর্কে কিছু বলা। মৌলসত্তা– ওটা ঈশ্বর নয়, ওটা বিশ্বজগতের ভিত্তিমূলও নয়। মৌলসত্তা অন্য যে-কোনো সত্তার তুলনায় অবস্থান করে মানুষ থেকে অনেক দূরে। আবার এ সত্তার অবস্থান মানুষের খুবই কাছাকাছি; একটা পাথর, একটা পশু, একটা ছবি, একটা ঔষধ, দেবতা কিংবা ঈশ্বরের চেয়েও কাছে। মৌলসত্তা অবস্থান করে মানুষের প্রচ্ছন্ন নিকটে, কিন্তু এই নিকটত্বের অবস্থানও থাকে মানুষ থেকে অনেক অনেক দূরে।'

সত্তা ও সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে হাইডেগার বলেন- 'Was ist das Seiende, das Seiende in Seinem Sein?' অর্থাৎ, সত্তা কী, মৌলসত্তার সত্তাগুণ বলতে কী বোঝায়? সময়ের সাথে সত্তার সম্পর্ক নিয়েও ভাবেন হাইডেগার এবং ঘোষণা করেন– 'সময় ও সত্তা অভিন্ন'। ধ্রুপদী দর্শনের সময়হীন সত্তায় যোগ হয় হাইডেগারীয় সময়ের কারুকাজ।

সত্তা-চিন্তাই হল হাইডেগারীয় Ontology বা সত্তাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়, যা প্লাতোর আদর্শ ভাববাদ, আরিস্ততল-একুনার বস্তু ও কারণ সম্পর্কীয় মতবাদ, দেকার্তের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং নিটসের স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু শূন্যতাবাদী সত্তা ও ইচ্ছাতত্ত্বের বিপরীতে অবস্থান করে। হাইডেগার-এর সত্তাবিজ্ঞান, সত্তার প্রকৃত রূপ ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য নিবেদিত। একটি সত্তা কোন সত্তার কারণে (Being) কাজ করে, তাকেই উদ্ধার করেছেন হাইডেগার। প্লাতো ও তদপরবর্তী দর্শনে সত্তাকে বিশ্লেষণ করা হলেও, সত্তার 'হয়ে ওঠা' বা 'is-ness'-এর কারণ খোঁজা হয়নি। ফলে সত্তাবিষয়ক যে-কোনো চিন্তাই ছিল অসম্পূর্ণ, অধিবিদ্যাজাত এবং অহংকেন্দ্রিক। দেকার্ত তাঁর দর্শনে Cogito ergo sum (আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি) আর Dubito ergo sum (আমি সন্দেহ করি তাই আমি আছি)– এ দুটো বাক্য দিয়ে অহংসত্তাকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সত্যের প্রকৃত উপস্থাপক হিসেবে নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখিত বাক্যদ্বয় কোনো অবস্থাতেই 'আমি' বা অহং-কে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ যে চিন্তা বা সন্দেহ দ্বারা 'আমি' বা 'অহং'-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, সেই চিন্তা বা সন্দেহ করার জন্য আরও একজন 'আমি'-র প্রয়োজন থেকেই যায় এবং এর ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে– 'ঐ আমিটা কে?' দেকার্তের ও পাশ্চাত্যের অন্যসব ধ্রুপদী দর্শনে অহংসত্তার প্রকৃত পরিচয় ছিল অনুপস্থিত এবং এর ফলে 'ঐ আমিটা কে?'– এরকম প্রশ্নই হাইডেগার-এর দর্শনে মূল বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য

হাইডেগার-এর দর্শনে বিশ্লেষিত অহং-সম্পর্কীয় প্রশ্ন ধ্রুপদী দর্শনের মতো শুধুমাত্র বস্তু, বিষয়, ধারণা কিংবা প্রচলিত ভাষাভিত্তিক ব্যাকরণ-যুক্তিকে নির্ভর করে প্রকাশিত হয়নি। দার্শনিক হুসার্লের Phenomenology বা চেতনচিত্রবাদকে গ্রাহ্য করে হাইডেগার তাঁর সত্তা-দর্শনকে মানুষকেন্দ্রিক বিষয় হিসেবেই বিশ্লেষণ করেছেন, কারণ মৌলসত্তার ধারক হিসেবে একজন মানুষই কেবল তার সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। মানুষের এই 'Seinsverstandnis' বা 'সত্তাবোধ'ই একজন মানুষকে অস্তিত্বশীল করে তোলে, যাকে হাইডেগার Existenz বলে চিহ্নিত করেন। হাইডেগার-এর মতে মানুষের মনুষ্যত্ব ও সত্তা (essance) বিষয়ক জ্ঞান কোনো অবস্থাতেই কান্ট-এর a priori বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব বিষয় নয়, সত্তা-বোধ (seinverstandnis) ও সত্তা-প্রশ্নের (seinfrage) মাধ্যমেই একজন মানুষ অস্তিত্বশীল হয়ে নিজেকে অর্থবোধক করে তোলে। মানুষ যেহেতু কোনো অবস্থাতেই তার সত্তার বিস্তার সম্পর্কে সত্য ও ধ্রুব সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সেহেতু সত্তা-প্রশ্নেরও শেষ হয় না, আর এ জন্য মানুষ সবসময় 'fragwurdig' বা 'প্রশ্নকারী সত্তা' হিসেবেই তার জীবনে উপস্থিত।

যে মানবিক সত্তা (being), তার নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে মৌলসত্তা বা Being সম্পর্কে জানতে চায় তাকে হাইডেগার ডা-জাইন (Da-Sein) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানুষ যেহেতু তার জন্মমুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবেই জগতে উপস্থিত হয়ে মানুষ হিসেবে সত্তাপ্রাপ্ত হয় এবং তার এই সত্তাগুণসম্পন্ন উপস্থিতি চেতনচিত্র বা ফেনমেনা হিসেবেই উপস্থিত, সেহেতু হাইডেগার মানুষের মৌলসত্তাকে তত্রসত্তা বা Dasein হিসেবে বিশ্লেষণ করতে চান। জার্মান শব্দ 'Da-Sein-এর প্রকৃত অর্থ হল 'being-there' কিংবা 'is there' যাকে বাংলা ভাষায় 'ঐ খানে অবস্থিত সত্তা' কিংবা 'তত্রসত্তা' বলা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ঐ খানে' বা 'তত্র' বলতে বিশ্ব-অস্তিত্বকেই বোঝাতে চেয়েছেন হাইডেগার।

মানবিক ডা-জাইন বা তত্রসত্তার পার্থিব অবস্থানে প্রাত্যহিকতা (everydayness) বা সময়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু প্লাতো ও তৎপরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় মানুষের সত্তাসারকে, দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখে, শুধুমাত্র সজ্ঞাপ্রধান মানব-একককেই সত্যের প্রকৃত উপস্থাপক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। দেকার্তীয় অস্তিত্ব-সন্দেহে (Cartesian doubt) কিংবা হুসার্লের চেতনচিত্রবাদেও (Husserlian Phenomenology) মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা হয়, যার ফলে ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি ইত্যাদির মতো বিষয়ে অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। হাইডেগার তাঁর দর্শনকে অধিবিদ্যা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে মানবিক সত্তার সাথে Alltaglichkeit বা বৈশ্বিক প্রাত্যহিকতাকে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে সময়কেন্দ্রিক মানবিক ডা-জাইন প্রকৃত বাস্তবতা ও সত্যমূল্য নিয়েই বিশ্ব-মধ্যে (in-world) উপস্থিত। ডা-জাইন আর বিশ্ব-অস্তিত্বকে আলাদাভাবে দেখা কিংবা মূল্যায়ন করা অসম্ভব, কারণ বিশ্ব-অস্তিত্বের মাঝে মানবিক ডা-জাইন সত্তা এমনভাবে প্রোথিত, গ্রন্থিত কিংবা ডুবন্ত থাকে যে, বিশ্ব ও ডা-জাইনকে পৃথকভাবে উদ্ধার করে বিশ্লেষণ করা বাস্তবেই অসম্ভব। ডা-জাইন ও বিশ্বের অভিন্ন অস্তিত্বকে হাইডেগার in-

der-welt-sein বা বিশ্ব-মধ্য-সত্তা (being-in-the-world) হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা হুসার্লের ‘Lebenswelt’ বা ‘জীবন-বিশ্ব’ থেকে কিছুটা ভিন্ন। দার্শনিক হুসার্ল বিশ্ব-বাস্তবতায় অবস্থানকারী মানবিক অস্তিত্বকে ‘জীবন-বিশ্ব’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন কিন্তু হাইডেগার তাঁর ডা-জাইনকে শুধুমাত্র ‘বিশ্ব-বাস্তবতায়-অবস্থানকারী সত্তা’ হিসেবেই দেখেননি। বিশ্ব-অস্তিত্বে প্রোথিত, গ্রন্থিত ও ডুবন্ত ‘ডা-জাইন’ বা ‘বিশ্ব-মধ্য-সত্তা’ জগতের সমগ্র-সত্তার (Being-at-all) অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে, একটি ফেনমেনা হিসেবেই উপস্থিত–এ সত্যকেই হাইডেগার প্রকাশ করেছেন তাঁর দর্শনে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্লাতো, দেকার্ত ও কান্টের অধিতাত্ত্বিক জ্ঞানবিদ্যায় বহুল আলোচিত দেহ ও মনের (mind and body) দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককেও হাইডেগার ‘বিশ্ব-মধ্য-সত্তা’ ডা-জাইন-এর মাধ্যমেই প্রকাশ করতে চান, কিন্তু ধ্রুপদী দর্শনের অধিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসমূহকে বাদ দিয়ে। হাইডেগার-এর দর্শন অনুযায়ী ‘বিশ্ব-মধ্য-সত্তা’ হিসেবে ডা-জাইনকে উপলব্ধি করা গেলেই একজন মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ডা-জাইন-এর দেশ-কাল-কেন্দ্রিক অস্তিত্বকে প্রকাশ করে, কারণ মানবিক অস্তিত্ব উপলব্ধি বিশ্ব-অস্তিত্ব মূলত একই বিষয়। বস্তু, বিষয়, মন, আত্মা ইত্যাদি বিষয়ক যে কোনো বৈশ্বিক জ্ঞানই আসলে চেতনচিত্র বা ফেনমেনা হিসেবে ডা-জাইন বা বিশ্ব-মধ্য-সত্তারই অবিচ্ছিন্ন উপাদান, আর এ জন্য জ্ঞানকেও এক ধরনের সত্তা বলা সম্ভব। জ্ঞান কোনো অবস্থাতেই মন ও বস্তুকেন্দ্রিক অধিতাত্ত্বিক আদান-প্রদান ব্যবস্থা নয়। হাইডেগার-এর মতে জ্ঞান হল ডা-জাইন-এর ‘সত্তা-সহিত’ (Being-with) উপাদান, যা বিশ্ব-মধ্য-সত্তার গুণগত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিশ্লেষণযোগ্য। জ্ঞান ডা-জাইন-এর কাছে বিশ্বকে উন্মোচিত করে না বরং জ্ঞানের বৈশ্বিক বাস্তবতার মাঝে অবস্থান করে ডা-জাইন নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করে মাত্র। জ্ঞান বিষয়ক হাইডেগার-এর দর্শন ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্বকে অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধি থেকে মুক্ত করে বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে এসে সৃষ্টি করেছে হাইডেগারীয় নৃতত্ত্বের, যা বিশ্ব-মধ্য-বস্তু হিসেবে মানুষের ভাষা, সমাজ ও সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করতে পারে বিস্তারিতভাবে।

একজন মানুষ বিশ্বের মাঝে ‘নিক্ষিপ্ত বা ‘Geworfen’ হয়েই অবস্থান নেয়– এ মন্তব্য করে হাইডেগার মানুষ ও বিশ্বের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে মানুষের বিশ্ব-মধ্য-সত্তা এক ধরনের ‘নিক্ষিপ্ততা’ (thrownness) এবং এই নিক্ষিপ্ততার উপলব্ধি কোনো অধিবিদ্যাজাত বিষয় নয়। যে বিশ্বে একজন মানুষ তার নিজস্ব ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার মূল্যায়ন না করে হঠাৎ এসে উপস্থিত, সে বিশ্বটি কিন্তু তার পূর্বপরিচিত কোনো জায়গা নয়, যদিও সে বুঝতে পারে তার নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বেও বিশ্ব-অস্তিত্ব ছিল এবং আগামীতেও থাকবে। মানুষ ও বিশ্বের এই অপরিচিত কিন্তু সম্পূরক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে মানবিক ডা-জাইনকে বিশ্ব থেকে আলাদা করে দেখা অসম্ভব, আর এ জন্য বিশ্ব-অস্তিত্ব ডা-জাইন-এর মাধ্যম ছাড়া অর্থবোধক সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয় না। কিন্তু ডা-জাইন ও বিশ্বে যৌগ-সংগঠনে একজন মানুষ তার ‘নিক্ষিপ্ত’ হবার বিষয়টি বুঝতে পারে নিজস্ব অজানা অতীত আর অজানা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। কীজন্য কোত্থেকে জন্ম হল এবং মৃত্যুকে ধ্রুব জেনেও কোথায় যাচ্ছি– এ দুটো প্রশ্নই মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে যে সে এখানে, এই বিশ্বে (there in the world) হঠাৎ করেই উপস্থিত। বিশ্বের এই ‘তত্রবোধ’ বা thereness-ই

মানুষের নিক্ষিপ্ত হবার ঘটনা-বিষয়কে মানবিক চেতনায় করে উন্মোচিত। তত্রবোধ-আচ্ছন্ন মানুষের কাছে দেকার্তের cogito ergo sum বা 'আমি চিন্তা করি' এ ধরনের বাক্য যুক্তিসঙ্গত নয়। 'আমি আছি তাই আমি চিন্তা করি'– এ রকম অস্তিত্ববাদী ধ্রুব ধারণার ওপর ভিত্তি করেই একজন মানুষ তার বিশ্ব-মধ্য-সত্তাকে অস্তিত্বশীল করে তুলতে চায়।

হাইডেগার-এর দর্শন অনুযায়ী বিশ্বজগতের রূপ ও স্বরূপ বস্তুর (things) মাধ্যমেই মানুষের নিকট গ্রাহ্য। কিন্তু এই বস্তুকে শুধুমাত্র নিঃসঙ্গ পার্থিব বস্তু একক হিসেবে দেখলে চলবে না, কারণ 'বিশ্ব-মধ্য-সত্তা'র অংশ হয়ে যে বস্তুসমূহ ডা-জাইন-এর কাছে উন্মোচিত, সেই ডা-জাইন নিজেও 'বিশ্ব-মধ্য-সত্তা'র অংশ হিসেবেই গ্রাহ্য। হাইডেগার বস্তুর বর্ণনা দিতে গিয়ে zeug শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হল যন্ত্র বা হাতিয়ার। হাইডেগারীয় দর্শন অনুযায়ী ডা-জাইন-এর নিকট উপস্থিত বিশ্ব-বস্তুসমূহ শুধুমাত্র বস্তুরূপেই সত্য নয়, বিশ্ব-মধ্য-সত্তার মৌলিক উপাদান হয়ে বিশ্ব ও ডা-জাইনকে অর্থবোধক করে তোলার হাতিয়ার হিসেবেই বস্তুসমূহের উপস্থিতি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৈশ্বিক বস্তুসমূহ 'Vorhandenheit' বা 'হাতের-মধ্যে-উপস্থিত' (Present-at-hand) অস্তিত্ব হিসেবে অবস্থান করে এবং কোনো এক সময় 'Zuhandenheit' বা 'হাতের কাছে তৈরি' (Readyness at-hand) অস্তিত্ব হিসেবে ডা-জাইন-এর কাছে অর্থবোধক সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। তত্রবোধসম্পন্ন ডা-জাইন-এর নিকট পার্থিব বস্তুসমূহ যে মুহূর্তে 'Zuhanden' বা 'হস্তগত' (to hand) সত্তা হিসেবে প্রকাশ পায়, ঠিক তখনি বস্তুর 'বস্তুগুণকে' ডা-জাইন তার নিজস্ব সত্তায় 'বিশ্ব-মধ্য-সত্তা'র অংশ হিসেবে সংশ্লেষিত করে। এখানে বলা আবশ্যক যে একজন মানুষের অহংসত্তা বা অহংবোধ এককভাবে তার নিজস্ব ডা-জাইনকে উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল 'হাতের-কাছে-উপস্থিত' বিশ্ব-বস্তু-পরিবৃত ডা-জাইন তার নিজস্ব অস্তিত্বকে সত্তায়িত করে নেয়। 'বস্তু-পরিবৃত সত্তায়' মানুষের এই অবস্থানকে হাইডেগার being-with-one-another বলে উল্লেখ করেছেন। বৈশ্বিক বস্তু ও মানুষের সম্পূরক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে হাইডেগার-এর দর্শন অনুযায়ী এ কথা বলা সম্ভব যে, মানবিক অস্তিত্ব তার নিজস্ব উপাদানসমূহ নিয়ে এককভাবে অস্তিত্বশীল নয়, বরং বিশ্ব-বস্তুর সাথে যৌগসত্তা গঠন ও তুল্য হবার পরই একজন মানুষ হয়ে ওঠে মানুষ হিসেবে অস্তিত্বশীল।

হাইডেগার বিশ্ব-বস্তু-পরিবৃত-সত্তায় (Being-in-the-midst-of-the-world) বা 'পতিত সত্তা' বলে চিহ্নিত করেন। জার্মান ভাষায় man শব্দটি একই সাথে 'একজন মানুষ' এবং 'একাধিক মানুষ বা বস্তু'– এ রকম অর্থ ধারণ করে। বিশ্ব-বস্তু-পরিবৃত অবস্থায় ডা-জাইন-এর একরকম পতন (verfall) ঘটে এবং মৌলিক ডা-জাইন তার নিজস্ব উন্নত ও একক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একই সাথে 'এককত্ব' (oneness) ও 'সমগ্রময়তা'-র (theyness) চরিত্রগুণ তুলে নেয়। ডা-জাইন-এর পতিতরূপ 'ডাসমান' শিকড়হীন (alienated) সাধারণ গড়পরতা চরিত্রের অবিশুদ্ধ (inauthentic) সত্তা হিসেবে অবস্থান নিয়ে বিশুদ্ধ (authentic) ডা-জাইন থেকে সরে যায় অনেক দূরে। 'সব সত্তাই অন্যসত্তা এবং কোনো সত্তাই নিজস্ব সত্তা নয়'– এমন একটা উপলব্ধিসহ 'ডাসমান' নিজেকে being-among-one-another বা 'একক ও সমগ্র-মধ্য-সত্তা' (Das-

man-selbst/the they) হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। হাইডেগার-এর ডাসমান-প্রকল্প এঙ্গেলস্-এর ব্যক্তির অমানবীকরণ তত্ত্বের সমার্থক এবং হেগেল ও রুশোর দর্শনে উল্লেখিত মানুষের শিকড়হীন সত্তা-ধারণার অনুরূপ।

ডাসমান (Dasman) বা পতিতসত্তায় অবস্থানকালে মানুষের চরিত্র কেমন হয় তার বিশ্লেষণও দিয়েছেন হাইডেগার। শিকড়হীন ডাসমান সত্তা যেহেতু ডা-জাইন-এর মৌলিক গুণ ও স্বাধীনতাকে ভুলে যায়, সেহেতু ডাসমান বা পতিতসত্তার নৈতিক অধঃপতন ঘটে স্বাভাবিকভাবেই এবং এর ফলে অনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও ডাসমান বা পতিতসত্তায় কোনো প্রকার পাপবোধ কাজ করে না। পতিত ডাসমান-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মিথ্যা বিষয়ীগততা (pseudo-subjectivity), বাচালতা, বাগাড়ম্বরপূর্ণতা, ভণ্ডামি, মিথ্যা-অহংবোধ, পরচর্চা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদির মতো পতিতগুণই প্রাধান্য পায়। এখানে বলা আবশ্যক যে শুদ্ধ ডা-জাইন-এর পতন যদিও অমৌলিক বিশ্ব-স্থিত-বস্তু (Dasman) হিসেবে প্রকাশ পায়, তবু এই পতন ডা-জাইন-এর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, কারণ এই পতনের ফলেই ডাসমান একসময় নিজেই নিজেকে পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়। পতিত অবস্থায় অবস্থানকালে ডা-জাইন যে উপলব্ধিসমূহকে কেন্দ্র করে তার নিজস্ব মৌলিকত্ব ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, তা হল উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ (sorge, care)। শিকড়হীন বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে ডাসমান বা পতিতসত্তা যখন এ বিপদসঙ্কুল এই বিশ্বে তার নিজস্ব অসহায় অবস্থাকে উপলব্ধি করে, ঠিক তখনি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাসহ সে তার বিশুদ্ধতা (authenticity) ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং মুক্ত-সত্তা (being-free) হিসেবে তার বিশুদ্ধ (authentic) ডা-জাইন-এ ফিরে যাবে কি না, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। হাইডেগার তাই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে আদিম ও মৌলিক ডা-জাইন-এর সময়কেন্দ্রিক অবস্থান নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিশুদ্ধ (authentic) ডা-জাইন সবসময় তার Ganze বা এককত্ব/পরিপূর্ণতা (entirety) দেখতে চায়, ফলে একসময় sein-nicht-mehr-da-sein বা 'তত্রসত্তা-হীন' অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ হবার স্বপ্ন দেখে। ফলে যে-কোনো বিশুদ্ধ মৌলিক ডা-জাইনই 'Sein-zum-tode' বা 'মৃত্যুর দিকে ধাবমান সত্তা' (being-towards-death) হিসেবে উপস্থিত। মৃত্যু যে সত্তার শেষ ও পরিপূর্ণ অবস্থা এ সত্যকে অস্তিত্বশীল ডা-জাইন সমগ্র-সহিত-সত্তা (being-with-others) রূপে প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করে থাকে এবং ডা-জাইন নিজেই no-longer-dasein' বা 'আর-ডা-জাইন-নয়' এই উপলব্ধিকেও গ্রাহ্য করে নিজস্ব জীবন ও অস্তিত্ব দিয়ে। একটি 'আর-ডা-জাইন-নয়' বা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিসত্তা ডা-জাইন-এর কাছে অবস্থান নেয় মৃতের কথা, কর্ম ও তত্রবোধ (thereness) সহ, যা ডা-জাইন-এর মৃত্যচিন্তাকেন্দ্রিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে বাড়িয়ে দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর-দিকে-ধাবমান ডা-জাইন-এর মৃত্যুচিন্তাই শিকড়হীন বিচ্ছিন্ন মানুষের কাছে তার সময়কেন্দ্রিক বিশুদ্ধ অবস্থান ও স্বাধীনতাকে মূর্তরূপে উপস্থাপন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, দেশ ও কালকেন্দ্রিক বিশ্ব-বস্তু-সংশ্লেষিত শিকড়হীন বিচ্ছিন্ন সমগ্রময়তাই (alienated theyness) বিশ্ব-মধ্য-সত্তা ডা-জাইন-এর (Dasein-in-the-world) একমাত্র

ও অবশ্যম্ভাবী নিয়তি, এ কথা ভাবা ঠিক নয়, যদিও এ উপাদানগুলোই ডা-জাইন-এর পতনের জন্য দায়ী এবং বিশ্ব-স্থিত (in-world) অন্যান্য বস্তু ও বিষয়ের সাথে মানুষের পতিত রূপকে করে পরিচিত। হাইডেগার-এর মতে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুচিন্তা ছাড়া আরও কিছু মানবিক উপাদান রয়েছে যা ডা-জাইন-কে পতিত-সমগ্রময়তা থেকে উদ্ধার করতে পারে। উপাদানগুলো হল মানবিক চেতনার সচেতনতা (conscience), চেতনার-আহ্বান (call of conscience) এবং দৃঢ়-স্থির-সংকল্পগুণ (resoluteness), যা ডা-জাইনকে তার বিশুদ্ধ মৌলিক সত্তার সন্ধান দেয়। জৈবিক সচেতন চেতনার আহ্বান ও চেতনার দৃঢ়-সংকল্পগুণ না থাকলে একজন মানুষ কোনো অবস্থাতেই নিজেকে তার মৌলিক ও বিশুদ্ধ ডা-জাইন সত্তায় ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং এর ফলে অবিশুদ্ধ-অমৌলিক সত্তা হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করে সে চরম ও পরম মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। বিশুদ্ধ মৌলিক ডা-জাইন হিসেবে অবস্থান করার প্রেক্ষাপটে মানুষের 'দৃঢ়-সংকল্প-গুণ' কাজ করে প্রচণ্ডভাবে, কারণ এই দৃঢ়তাকে কেন্দ্র করেই ডা-জাইন মুক্ত-চিন্তায় মৃত্যুকে বরণ করে তুলে আনে তার মৌলিক স্বাধীনতা।

হাইডেগারীয় দর্শন অনুযায়ী ডা-জাইন-এর সচেতনতা, চেতনার আহ্বান ও দৃঢ় সংকল্পগুণ সবসময়-সময়কেন্দ্রিক। 'Innerzeitigeit' বা 'সময়গুণস্থিতি' (With-timeness) কেবলমাত্র ডা-জাইন-এর অমৌলিক ও অবিশুদ্ধ সত্তাসারকেই প্রকাশ করে থাকে। কারণ সময়ের এই 'সময়গুণ' সমগ্র-দ্বারা (by-them) ডা-জাইন-এর ওপর আরোপিত। অবশ্য সময়কেন্দ্রিক এই অমৌলিকত্ব ডা-জাইন-এর দুর্বলতা হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, বরং ডা-জাইন-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হল 'সমগ্রের-সময়গুণ' থেকে সময়কেন্দ্রিক নিজস্ব বিশুদ্ধ মৌলিক সত্তাকে উদ্ধার করা। সমগ্রের সময় থেকে ডা-জাইন-এর নিজস্ব সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে সংগঠিত সময়-প্রবাহকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হয়, কারণ 'die zeitigung der zeit' বা 'সময়ের সময়প্রাপ্তি' সম্পর্কীয় জ্ঞানই সত্তা ও সময়ের সম্পর্ককে করে প্রতিষ্ঠিত। ডা-জাইন-এর পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তির ঘটনা যেহেতু ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক, সেহেতু ডা-জাইন তার অস্তিত্ব ও আশা নিয়ে বর্তমানকে অতিক্রম করে আগামীতে অবস্থান করার স্বপ্নে থাকে বিভোর, আর এ জন্য ভবিষ্যৎবোধকে সময়ের অতি সাম্প্রতিক বা অতিবর্তমান মাত্রা হিসেবেই চিহ্নিত করা সম্ভব। সময়কেন্দ্রিক সত্তা-বিশ্লেষণে হাইডেগার ডা-জাইন-এর বর্তমানকে 'সময়ের-পাশাপাশি-স্থিত-সত্তা' বা 'যা-আসছে-তার-জন্য অপেক্ষারত-সত্তা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সত্তার অতীতকে হাইডেগার শুধুমাত্র 'খরচ-হয়ে-যাওয়া' ক্রিয়া-বিক্রিয়াহীন স্তব্ধ-নিশ্চল-মাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করেননি। তাঁর মতে অতীত আগামীর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ অতীত ডা-জাইনকে বিশুদ্ধ সত্তার খোঁজে আগামীর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে প্রবাহিত সময়কেন্দ্রিক ডা-জাইন গ্রন্থিত থাকে ইতিহাসে− এ মন্তব্য করে হাইডেগার erbe বা ঐতিহ্য (heritage), Schicksal বা নিয়তি (fate) এবং geschick বা অদৃষ্টকে (destiny) ইতিহাসের উপাদান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হাইডেগার-এর ইতিহাস-দর্শনের বর্ণিত ঐতিহ্য, নিয়তি ও অদৃষ্ট কোনো অধিতাত্ত্বিক

বিষয় নয়। হাইডেগারীয় ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে ডা-জাইন-এর প্রাপ্য, নিয়তি হল কোনো ডা-জাইন-এককের জন্মমুহূর্তে প্রাপ্ত সহজাত সম্বল এবং অদৃষ্ট হল বিশ্বস্থিত ডা-জাইন-সমগ্রের যৌথ ক্রিয়া-কর্মফল-লব্ধ গন্তব্য।

* টিকা: ১: হাইডেগার সত্তা বোঝাতে ছোট হরফের B ব্যবহার করে being এবং মৌলসত্তা বোঝাতে বড় হরফের B ব্যবহার করে Being উপস্থাপন করেছেন।

হাইডেগার-এর ভাষাদর্শন

হাইডেগার তাঁর দর্শনে বিশ্ব-উপলব্ধিসমূহের অর্থ ও ভাষামাধ্যম সম্পর্কীয় যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার মূলেও অবস্থান করে ডা-জাইন বা তত্রসত্তার ভূমিকা। বিশ্ব-মধ্য-সত্তা হিসেবে সমূহ-এর বিশ্ব-বোধ বা উপলব্ধিজ্ঞান (understanding) তার অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট। ডা-জাইন-এর বিশ্ব-বোধ বা বিশ্ব-জ্ঞান তার নিজস্ব সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই প্রসারিত, কারণ জীবনের সম্ভাবনাসমূহকে বিশ্লেষণ করার পরই বিশ্বজগৎ থেকে বিভিন্ন অনুভূতি ও উপলব্ধি তুলে নিয়ে ডা-জাইন নিজেকে অর্থবোধক করে তোলে। একজন মানুষ যেহেতু এই বিশ্বে সবসময় দেশকাল নিয়েই অস্তিত্বশীল, সেহেতু ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক সম্ভাবনাসম্পর্কীয় চিন্তা করাও তার জন্য স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সম্ভাবনার নিরিখে ডা-জাইন বা তত্রসত্তার দেশকালমাত্রিক সত্যমূল্য তার নিজস্ব বাস্তবতা থেকেও বেশি প্রাধান্য পায়। বিশ্ব-মধ্য-সত্তা হিসেবে অবস্থানকালে মানবিক জৈবচেতনার দেশকালকেন্দ্রিক সত্যমূল্যই বৈশ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে (বিভিন্ন উপলব্ধি অনুভূতিসহ) ডা-জাইন-এর মৌলিক অস্তিত্ব ও অবস্থানকে করে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব-উপলব্ধিসমূহকে বোঝা বা interpret করার জন্য ডা-জাইন জ্ঞানসত্তার যে উপাদানসমূহ ব্যবহার করে, তা হল সমমাত্রিক-কাঠামো জ্ঞান (as structure knowledge), পূর্ববৎ-কাঠামো-জ্ঞান (fore-structure knowledge) এবং অর্থ (meaning) উদ্ধার প্রক্রিয়া। সমমাত্রিক-কাঠামো-জ্ঞান তুলনার মাধ্যমে উপলব্ধিসমূহকে মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলে। একটি গাছের মতো অন্য একটি গাছ অবস্থান করলে আমাদের উপলব্ধি-অনুভূতি সেটিকে ফেনমেনায় বা চেতনচিত্রে সমমাত্রিক কাঠামোগত গুণগ্রাহ্যের মাধ্যমে গাছ বলেই সনাক্ত করবে। এখানে বলা আবশ্যক যে সমমাত্রিক-কাঠামো-জ্ঞান-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ 'হাতের-কাছে-তৈরি-অস্তিত্ব' হিসেবেই আমাদের কাছে বোধগম্য। উপলব্ধি অনুভূতিসমূহের যে অংশ পূর্ব-লব্ধ-অভিজ্ঞতা (vorhabe), দূরদৃষ্টি (vorsicht) কিংবা পূর্ব-ধারণা (vorgrift) নিয়ে বোধগম্য হয় তাকে পূর্ববৎ-কাঠামো-গ্রাহ্য উপলব্ধি বলা যায়।

সমমাত্রিক কাঠামোস্থিত বস্তু বা বিষয়সম্পর্কীয় সময়কেন্দ্রিক উপলব্ধিও অনেকসময় পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি এবং পূর্বধারণার ফলে আমাদের কাছে অর্থময় সত্তা হিসেবে উপস্থিত হয়। বস্তু ও বিষয়ের অর্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হাইডেগার বলেন ডা-জাইন-এর অবস্থা উপস্থাপন করাই হল meaning বা অর্থ, কোনো শব্দ বা বাক্যের সাথে অর্থ সম্পর্কহীন। সমমাত্রিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে ডা-জাইন-এর সম্ভাবনার যে বিস্তার ঘটে তাকে অর্থের উৎস বলা যায়। বিশ্ব-বস্তু বা বিষয়ের মাঝে অবস্থানরত 'zuhanden' বা 'হাতের-কাছে-তৈরি' সত্তার মাঝেই কেবল meaning বা

অর্থকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু ‘present-at-hand’ বা ‘হাতের কাছে উপস্থিত’ সত্তায় অর্থ থাকে অনুপস্থিত। ভাষা ও অর্থের সম্পূরক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ‘হাতের কাছে তৈরি’ অস্তিত্বসমূহকে কেন্দ্র করেই মৌখিক ও লিখিত ভাষা কিংবা বক্তব্যের অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। অর্থসম্পর্কীয় হাইডেগার-এর দর্শন গ্রাহ্য করে বলা যায় যে আমরা ইতোমধ্যেই জানি, এমন সব zuhanden’ বা ‘হস্তগত বিষয়কে’ই নতুনভাবে বোঝার চেষ্টা করি বারবার।

হাইডেগার তাঁর ভাষা-দর্শনে ডা-জাইন-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। ভাষার মাঝেই সত্তার অবস্থা এবং মানুষের উপস্থিতি এই অবস্থানকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত, এ সত্যকে উল্লেখ করে হাইডেগার-এর বক্তব্য ‘Language is the house of Being. Man dwells in this house.” যারা ভাবুক বা চিন্তক এবং যাঁরা কবিতা রচনা করেন, হাইডেগার-এর মতে তাঁরাই হলেন ভাষাকেন্দ্রিক সত্তা-নিবাসের (house of Being) সংরক্ষক। ভাষাকে সত্তার কবিতা হিসেবে বর্ণনা করে হাইডেগার বলেন– ‘Language is the primordial poetry in which a people speaks being. Conversely, the great peotry in which a people enters into history initiates the moulding of its language. The Greeks created and experienced this poetry through Homer. Language was made manifest to their being-there (Dasein) as departure into being there (Dasein) as departure into being, as a configuration disclosing the essent.’ হাইডেগারীয় ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী একমাত্র মানবিক ডা-জাইনই প্রশ্ন রাখতে পারে– আমি কে এবং সত্তা কী? সত্তা ও অস্তিত্বকেন্দ্রিক এ ধরনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় ভাষার, আর এ কারণে ভাষা-সৃষ্টির উৎসে ডা-জাইন ও ভাষাব্যবস্থার (sprache) সম্পূরক ও বিনিময়যোগ্য সম্পর্ককে নির্ধারণ করা সম্ভব। ডা-জাইন যেহেতু ভাষার মধ্যেই প্রোথিত থাকে সেহেতু বিশ্ব-মধ্য-সত্তা হিসেবে ডা-জাইন-এর প্রকাশও ঘটে ভাষা-মাধ্যমেই এবং এ জন্য একজন মানুষের বাঁচবার অর্থই হল কিছু শব্দকে গ্রন্থিত করে তার নিজস্ব মর্মার্থ, সম্ভাবনা ও গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। একজন মানুষ যেহেতু তার সত্তা ও অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে উপস্থাপন করতে চায়, সেহেতু সে সৃষ্টি করে নতুন নতুন শব্দের এবং সত্তা-সৃষ্ট এই শব্দ-শৃঙ্খলই ভাষারূপে মূর্তভাবে আমাদের সমাজ ও সভ্যতায় উপস্থিত। এ বিষয়ে হাইডেগার-এর-বক্তব্য– ‘We live by putting into words the totality of significations of intelligibility. To signification, word accrue’.

ডা-জাইন-সৃষ্ট ভাষার মৌলিক উপাদানকে হাইডেগার ‘Rede’ বা ‘সত্তা-ধ্বনি/সত্তা-কথা’ বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বিশ্ব-পরিবৃত-সত্তা বা পতিত-সত্তায় অবস্থানকালে ডা-জাইন rede বা মৌলিক সত্তার ধ্বনিসমূহকে গ্রন্থিত করে নিজেকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, বরং সমগ্র-সত্তার (The they) অংশ হয়ে ‘Grede’ বা ‘বাচালতা/বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশের’ মাধ্যমেই নিজেকে চিনতে চায়। বিশ্ব-পরিবৃত-সত্তায় অবস্থান করে প্রতিদিন আমরা যে ভাষায় কথা বলি বা ভাবের আদান-প্রদান করি তা আসলে আমাদের মৌলিক সত্তার উপাদান নয়। অমৌলিক চরিত্র নিয়ে এ

ধরনের প্রকাশ পতিত-সত্তার-বাচাল-বিবরণ (idle talk) হিসেবেই উপস্থিত। পতিত-সত্তায় অবস্থানকালে মানুষ যে বাচালভাষা উচ্চারণ করে কিংবা লিখিতরূপে প্রকাশ করে তা দিয়ে কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত সত্যকে উপস্থাপন করা সম্ভব নয় এবং অনেক সময় এ রকম প্রকাশ সত্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান নিয়ে সৃষ্টি করে এক অহংকেন্দ্রিক অধিতাত্ত্বিক ভাষাব্যবস্থার (metaphysical Language)। On the Way to Language গ্রন্থে হাইডেগার ভাষাদর্শন ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়েছেন। একজন জাপানি ব্যক্তির সাথে হাইডেগার-এর কথোপকথন, যা প্রাগুক্ত গ্রন্থে 'A Dialogue on Language' শিরোনামে গ্রন্থিত হয়েছে, তাতে ভাষার রূপ ও স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। ভাষাকে 'সত্তার নিবাস' হিসেবে চিহ্নিত করে হাইডেগার বলেন, ভাষা সম্পর্কীয় কোনো জ্ঞান বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিংবা অধিতাত্ত্বিক উপলব্ধি দিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, কারণ মানুষের ভাষা ও ভাষা-বিজ্ঞানসম্পর্কীয় যে-কোনো উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা প্রকাশ হবার আগেই সত্তার উপাদান হিসেবে মানবিক চেতনায় থাকে উপস্থিত। হাইডেগার ভাষাকে সত্তার সত্তায়িত হবার মূল কারণ বলে চিহ্নিত করে আরও বলেন– 'সত্তা (being) এবং মৌলিকসত্তার (Being) মাঝে বিদ্যমান দ্বিমুখী যোগসূত্রই হল ভাষা। বিশ্ব-পরিবৃত-সত্তায় অবস্থান করে অমৌলিক (inauthentic) দৈনন্দিন ভাষার যুক্তি ও ব্যাখ্যা দিয়ে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা বাস্তবেই অসম্ভব এবং এ জন্য ভাষার প্রকৃত রূপ ও স্বরূপ বুঝতে হলে মৌলিক সত্তা-ধ্বনি বা সত্তা-কথা (authentic language) হিসেবে প্রকাশিত কবিতার দিকেই মুখ ফেরাতে হবে।' এখানে কবিতাকে শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের উৎসরূপে চিন্তা করা হয়নি বরং সত্তার সত্যবাণী হিসেবে অস্তিত্ব ও সত্তার প্রকৃত উপস্থাপক রূপে কবিতাকে চিন্তা করা হয়েছে। জাপানি পরিভাষায় ভাষাকে বলা হয় kato-ba, যেখানে ba শব্দটির অর্থ হল 'ফুটন্ত চেরিফুল গাছের পাতা' আর kato শব্দের অর্থ হল 'স্বর্গীয় আনন্দ'। হাইডেগার ভাষার এই জাপানি পরিভাষাকে গ্রহণ করে ভাষাকে সত্তাকেন্দ্রিক স্বর্গীয় উপলব্ধির ফুটন্ত উপহার হিসেবে গণ্য করেন, যা প্রতিদিনের জাগতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করা অসম্ভব। হাইডেগারীয় দর্শনে আরও বলা হয় যে, একজন মানুষ আসলে ভাষার সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে না বরং সত্তার উপাদান হয়ে ভাষা নিজেই মানুষের মাধ্যমে কথা বলে (die sprache spricht)।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সত্তার উপাদান হিসেবেই ভাষা উপস্থিত। ভাষা ও ভাষা-অর্থের সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে হাইডেগার বলেন– 'ভাষা কখনো শব্দ-শৃঙ্খল তৈরির মাধ্যমে অর্থকে প্রকাশ করে না, বরং ভাষাকেন্দ্রিক অর্থ শব্দ-শৃঙ্খল তৈরি হয়ে প্রকাশ হবার আগেই মানবিক সত্তায় অবস্থান করে'। ধ্রুপদী দর্শনে ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করে, যোগাযোগের জন্যেই ভাষার সৃষ্টি, এ কথা ভাবা হত। কিন্তু হাইডেগারীয় তত্ত্বে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার আগেও ভাষার অস্তিত্ব মানবিক চেতনায় ছিল– এ সত্যকেই গ্রাহ্য করা হয়। হাইডেগার তাঁর ভাষা-দর্শনে 'বলা' (telling) ও 'দেখানো'-র (Showing) মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। মানবিক সত্তা যা দেখাতে চায়, কিংবা একজন মানুষ নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য যে কাজকর্ম সম্পাদন করে, তার সবই আসলে ভাষাব্যবস্থার অংশ

হয়েই অর্থবোধক। এ প্রসঙ্গে গুটেনপ্লান সম্পাদিত Mind and Language বইটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। তিনি বলেন– 'What is new and interesting in Heidegger is that he regards meaning as being found in all kinds of human activity' উচ্চারিত ও লিখিত ভাষা ছাড়াও মানবিক সত্তার যে কোনরকম বৈশ্বিক কর্মকাণ্ড অর্থবোধক হয়ে ভাষা-রূপেই আমাদের কাছে উপস্থাপিত হতে পারে– এ সত্যকে অগ্রাহ্য করা আসলেও অসম্ভব।

হাইডেগার-এর দর্শন বিংশ শতাব্দীর ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্বকেও আলোড়িত করেছে বিশেষভাবে। জাক দেরিদা তাঁর দর্শনে ভাষার উৎস হিসেবে হাইডেগার-এর sein-frage বা সত্তা-প্রশ্নের মূল্যায়ন করেছেন। হাইডেগার-এর মতো দেরিদাও মনে করেন বৈশ্বিক যে-কোনো বিষয়, বস্তু বা ঘটনার অর্থবোধক কিংবা সত্য হয়ে ওঠার পেছনে যে 'is-ness' বা 'হয়-গুণ' কাজ করে তা মৌল-সত্তা বা Being-এর সত্তা-প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে, সত্তা-প্রশ্নহীন অনর্থ চিন্তা ও প্রকাশ সবসময় অধিবিদ্যাজাত বিষয় হিসেবেই আমাদের সমাজ ও সভ্যতায় উপস্থিত। ধ্রুপদী দর্শনে বহুল আলোচিত ঈশ্বর, শয়তান, আত্মা, মন, জীবন, মরণ, সত্য, মিথ্যা, ভালো, মন্দ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয় ও প্রকাশ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের যুগ্ম-বৈপরীত্যকে কেন্দ্র করে আমাদের ভাষাকাঠামোতে অর্থবোধক সত্যমূল নিয়ে উপস্থিত থাকলেও, এইসব অধিতাত্ত্বিক যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টির পেছনে মৌলসত্তা বা Being-এর অবদান থাকে খুবই কম। এমনকি বিজ্ঞানের যৌক্তিক সূত্র ও প্রকল্প উপস্থাপন করার সময়ও অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মৌল-সত্তার অস্তিত্বকে গৌণ রেখে বাচাল অনর্থ-ভাষা প্রয়োগ করি। সত্য উপস্থাপন মৌল-সত্তা বা Being-এর এ রকম গৌণ উপস্থিতি গ্রাহ্য করে হাইডেগার লিখিত ভাষায় Being শব্দটিকে আড়াআড়িভাবে কেটে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ সত্তা-প্রশ্ন ভাষার প্রকৃত উৎস হলেও, মৌলসত্তাকে বেশিরভাগ সময়েই আমরা উপলব্ধি করতে চাই না। বিষয়টিকে হাইডেগার তাঁর 'Question of Being-এ উপস্থাপন করেছেন এভাবে।

"A thoughtful glance ahead into this realm of 'Being' can only write it as Being. The drawing of these crossed lines at first only wards off (abwehrt) especially the habit of conceiving 'Being' as something standing by itself... The sign of crossing through (Zeichen der Durchkreuzung) can, to be sure, ... not be a merely negative sing of crossing out (Zeichen der Durchstreichung)... Man in his sessence is the memory (or 'memorial', Gedachtnis) of being, but of Being. This means that the essence of man is a part of that which in the crossed intersected lines of Being puts thinking under the claim of a more originary command (Anfanglichere Geheiss).

জাক দেরিদা তাঁর ভাষা-দর্শনে অনেক শব্দ বা শব্দ-ধারণাকে হাইডেগারের মতো কেটে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন, যাকে শব্দ ও শব্দার্থের Sous rature বা ছায়া উপস্থিতি (under erasure) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে দেরিদার Under erasure বা ছায়া-উপস্থিতি আর হাইডেগার-এর Crosing out বা কেটে দেওয়া এক বিষয় নয়। হাইডেগার যখন 'উপস্থিত কিন্তু উহ্য'– এই ধারণা নিয়ে একটি শব্দকে কেটে দেন, তখন দেরিদা তাঁর under erasure চিহ্ন দিয়ে

‘উপস্থিতির অনুপস্থিতি (absence of a presence) এবং সর্বদা-সবসময়-উপস্থিত-অনুপস্থিত an always already absent present)– এই ধারণাদ্বয়কে বোঝাতে চান। দেরিদীয় দর্শনে মৌলসত্তা স্রষ্ট ভাষাচিহ্নের অসীম দ্যোতনা এই অস্তিত্ব/অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই মুক্তক্রীড়ার (free play) মাধ্যমে অসীমের দিকে প্রবহমান।

হাইডেগারীয় দর্শনের সমগ্রসত্তা, মৃত্যুচিন্তা ও সত্তা-স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে মনস্তত্ত্ববিদ M. Boss এবং L. Binswagner সৃষ্টি করেছেন মনোচিকিৎসার নতুন পদ্ধতি। মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞানী Lacan বা কাব্যতাত্ত্বিক Emil Staiger হাইডেগার-এর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন ভাষা ও কাব্যতত্ত্ব। দর্শনের ক্ষেত্রে Jean-Paul Sartre, Karl Rendhardt, Kurt Reizler, H. Bollack, D. Grane Ross, H.G, Gadamer প্রমুখ তাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা হাইডেগার-এর চিন্তা ও তত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রববিত হয়েছেন এবং বর্তমান বিশ্ব-প্যারাডাইমে হাইডেগার-এর ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন অবস্থান করছে উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব নিয়ে যা হয়তো আগামীতে আমাদের আরও অনেক নতুন সত্যের সন্ধান দেবে।

হাইডেগার-এর নন্দনতত্ত্ব

হাইডেগার তাঁর দর্শনে প্রকৃত সত্যের উপস্থাপক হিসেবে কবিতা, শিল্পকলা ও কাব্যিক ভাষাকে নির্ধারণ করে বলেন– ‘জাগতিক যুক্তির ভাষা কিংবা বিশ্ব-বস্তু-উপলব্ধিসমূহ মৌলসত্তার আসল রূপ ও স্বরূপকে সত্যমূল্যসহ প্রকাশ করতে পারে না।’ ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হাইডেগার-এর Holzwege (Forest path) নামক গ্রন্থে On the origin of the art work শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল, যেখানে তিনি কবিতা ও শিল্পের সাথে সত্যের সম্পর্ককে উপস্থাপন করেছেন বিস্তারিতভাবে, যা নন্দনতত্ত্বের বিষয় হিসেবে আলোচিত হতে পারে।
কবিতার সাথে সত্য ও সুন্দরের যে সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা কিটস্, অডেন, ডিকেনসন, টলস্টয়, মারডক প্রমুখ কবি-ঔপন্যাসিকের বক্তব্য থেকে জানতে পারি, কিন্তু কবিতা ও শিল্প কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে আমাদের সত্য ও সুন্দরের ব্যঞ্জনা দেয় সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ‘একজন কবি কিংবা একজন শিল্পী সব সময় প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করেন’– এ ধরনের একটি যৌক্তিক জাগতিক বাক্যকে কেবলমাত্র বাচাল বক্তব্য হিসেবেই গ্রাহ্য করা উচিত, কারণ মৌলসত্তার (Being) সাথে সম্পর্কহীন এ বাক্যটি সত্যের সত্যমূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রায় অক্ষম। হাইডেগার তাঁর দর্শনে কবিতা ও শিল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন– Art is the becoming and happening of truth... (Poetic) language brings what is, as it is, into the open for the first time.” যে-কোনো সত্যকে তার নিজস্ব সত্যগুণে সত্য হয়ে উঠতে হয় এবং মৌলসত্তা-সৃষ্ট কবিতা বা কাব্যিক ভাষা– ‘যা সত্য, সেই সত্য’– বোধকেই প্রথমবারের

মতো বিশ্ববাস্তবতায় উন্মোচন করে। এ ধারণাটিকে গ্রাহ্য করে 'কবিতা/অকবিতা' কিংবা 'শিল্প/ শিল্প নয়', এই যুগ্ম-বৈপরীত্যদ্বয়কে সচেতনভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

কবিতা ও শিল্পের সত্যমূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে হাইডেগার ভ্যান গখের চিত্রকলা, হ্যেল্ডার্লিন, ট্রাকল ও স্টিফেন গর্গের কবিতা এবং গ্রিক মন্দিরের স্থাপত্যরীতি বিশ্লেষণ করে 'মাটি' (earth) ও 'বিশ্বে'র (world) মৌলিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে শিল্প-উপাদান হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা একটি শিল্পকে শিল্পগুণসম্পন্ন করে তোলে। এ প্রসঙ্গে 'মাটি' ও 'বিশ্বের' ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ শিল্প-বিশ্লেষণে এই শব্দদ্বয়কে হাইডেগার ব্যবহার করেছেন রূপক হিসেবে। কবিতা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য কিংবা স্থাপত্যকর্মসহ যে-কোনো শিল্পমাধ্যমে ব্যবহৃত মৌলিক বস্তু (শব্দ, ধ্বনি, রঙ, মুদ্রা, পাথর ইত্যাদি) এবং বিষয়কাঠামো, যা শিল্পসৃষ্টির সময় তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগানো হয় তাকে হাইডেগার বলেন, মাটি বা earth, এবং শিল্পে ব্যবহৃত এই 'মাটি' যখন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাসে সত্যগুণসম্পন্ন হয়ে আমাদের নান্দনিক উপলব্ধি দেয় তখনকার অবস্থাকে হাইডেগার 'বিশ্ব' বা world হিসেবে চিহ্নিত করেন। হাইডেগার-এর নন্দনতত্ত্বে উল্লিখিত 'বিশ্ব' প্রকৃত-সত্যকে অর্থবোধক সত্তায় মানুষের কাছে উন্মোচিত (open) করে এবং এই সত্য-উন্মোচন প্রক্রিয়ায় 'বিশ্ব' ও 'মাটি'র দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াই অবস্থান করে মুখ্যরূপে। ধ্রুপদী নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় শিল্পবোধের মূল উপাদান হিসেবে সুন্দর/অসুন্দর, ভালো/খারাপ, মানসিক/শারীরিক, ধারণাকেন্দ্রিক/সজ্ঞাকেন্দ্রিক ইত্যাদির মতো যুগ্ম বৈপরীত্যসমূহকে নির্ধারণ করা হলেও হাইডেগারীয় নন্দনতত্ত্বে শিল্প কেবলমাত্র সত্যের সাথে সম্পর্কিত, সৌন্দর্য কিংবা অন্য কোনো উপলব্ধি/অনুভূতির সাথে শিল্প সম্পর্কহীন। হাইডেগার তাঁর নন্দনতত্ত্বে 'কবিতা' শব্দটির মূল্যায়ন করেছেন নতুনভাবে। যে-কোনো শুদ্ধশিল্প (কবিতা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য ইত্যাদি), যা সত্যের সন্ধান দিতে পারে, তাকেই হাইডেগার কবিতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি। কবিতা-শিল্পের রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাইডেগার 'Open' বা 'উন্মোচন' শব্দটির ওপর জোর দেন, কারণ যা সত্তার গহীনে গোপন অবস্থায় থাকে তাকে উন্মোচন করাই হল শিল্পের কাজ। ভাষানির্ভর কবিতাকে হাইডেগার তাঁর দর্শনচিন্তায় খুবই গুরুত্ব-সহকারে গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন কবিতাই হল ভাষার সর্বোচ্চ পর্যায় যা ভাষার রূপ ও স্বরূপকে উন্মোচন করে পূর্ণ অবয়বে। শিল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে হাইডেগার বলেন, শিল্পকলাই মানুষকে তার 'নিজস্বতা' সম্পর্কে উপলব্ধি দিতে পারে কারণ সত্তাসম্পর্কীয় চেতনচিত্র-অভিজ্ঞতা একমাত্র শিল্প-মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। শিল্পের মাঝেই সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ শিল্পের সত্য মানবিক সত্তা কর্তৃক সমর্থিত।

হাইডেগারীয় নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী কবিতাসহ যে-কোনো শিল্পের প্রকৃত মূল্যায়ন করা এই সময়ের বাস্তবেই সম্ভব। কোনো কবিতা বা শিল্পকর্ম মৌলসত্তা বা Dasein-এর Seinfrage-এর উত্তরে সত্যমূল্যসহ উপস্থিত আর কোনটা পতিতসত্তা বা Dasman-এর বাচাল, মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ সত্তা দিয়ে নির্মিত, তা নির্ধারণ করা যায় সহজেই। আজকাল কবিতার নামে যে-সমস্ত 'বাচাল কবিতা' শুধুমাত্র কিছু স্থানিক বিবরণ, শ্লোগান ও সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হচ্ছে সেগুলো থেকে সত্তা-উৎসারিত প্রকৃত কবিতাকে পৃথক করে দেখা

অসম্ভব নয়। চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য নৃত্যশিল্পের বেলায়ও অযথা অযৌক্তিক রঙ ও রেখার বিন্যাস, যান্ত্রিক যন্ত্রণার সাথে ছন্দময় চিৎকার, দেহকেন্দ্রিক বিভ্রান্ত অঙ্গভঙ্গি এবং চাকচিক্য দিয়ে ঢাকা প্রস্তরস্তূপের মিথ্যাসর্বস্ব রূপ ও স্বরূপ চিহ্নিত করা সম্ভব।

অনুচিন্তন

হাইডেগার-এর জটিল দর্শন খুব সহজভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার কাজটি কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। লেখকের সীমিত ভাষা-জ্ঞানের কারণে হাইডেগারীয় দর্শনের 'যা-বলা-যায়-এবং-যায়- না(!)' এমন অনেক বিষয়কে হয়তো-বা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সচেতন পাঠক, সমালোচক ও দার্শনিকদের আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে এক সময় হাইডেগারীয় দর্শনের 'গোপন-বিশ্ব' স্পষ্টরূপে আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে, এ আশা অবশ্যই আমরা করতে পারি। তবে A Short History of Modern Philosophy-র রচয়িতা Roger Scruton-এর মতো আপাতত, এই সময়ের জন্য, আমাদের বলতেই হবে– 'It is impossible to summarise Heidegger's work, which no one has claimed to understand completely'.

দেরিদার ডিকন্স্ট্রাকশন: তাত্ত্বিক বিচার

পূর্বকথা

১৯৬৬ সনে আমেরিকার জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক সেমিনারে জ্যাক দেরিদা 'Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Science' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা তৎকালীন ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। দেরিদার প্রবন্ধের বিষয় ছিল প্লাতো ও তৎপরবর্তী ধ্রুপদী পাশ্চত্যদর্শনের বিভিন্ন অধিতাত্ত্বিক ধারণাসমূহের ভাষাকাঠামোগত বিশ্লেষণ, যেগুলোকে দেরিদা যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা বলে আদৌ মনে করেননি। প্লাতো ও তৎপরবর্তী সব দর্শনে 'অহংকেন্দ্রিক'- প্রকাশ মুখ্য হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় বিভিন্ন দর্শনতত্ত্বে ও প্রকল্পে অহং-এর অবস্থান ও ধারণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল কিছু আপাতযৌক্তিক বর্ণনা ও উপস্থাপনার। অহংকেন্দ্রিক এই দর্শনতত্ত্বে কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের বিশ্ববীক্ষণজাত যৌক্তিক অনুভূতির ভাষাভিত্তিক বিবরণ থাকলেও, তা আমাদের প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি– দেরিদার এ

বিশ্বাস আমেরিকায় একটি নতুন সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের সৃষ্টি করেছিল, যা বিনির্মাণ বা Deconstruction দর্শন নামে পরিচিতি লাভ করে।

দেরিদার বিনির্মাণ বা deconstruction-এর দর্শন উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে উল্লেখ্য, উত্তর-কাঠামোবাদ কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে না। সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ভাষাব্যবস্থার সঠিক ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়ে উত্তর-কাঠামোবাদ কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সঠিক পথে উত্তীর্ণ বা বিস্তারিত করে মাত্র।

সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমি

জ্যাক দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শনকে বিশ্লেষণ করার জন্য সস্যুরের ভাষাবিজ্ঞান উপস্থাপন করা আবশ্যক, কারণ ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্যই 'অস্তিত্ব/অনস্তিত্বের' যুগ্ম-বৈপরীত্যকে কেন্দ্র করে অহং-সত্তাকে উপস্থিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে। সস্যুরের মতে ভাষা কোনো বস্তু বা বিষয়ের অর্থ (meaning) তৈরি করে না, বরং বিষয় বা বস্তুর অর্থকে উদ্‌ঘাটন করাই হল ভাষার মূল কাজ। এ তত্ত্বটিকে গ্রহণ করে বলা যায়, ভাষা ব্যবহারের পূর্বেই অবস্থান করে বস্তু বা বিষয়ের অর্থ বা meaning। সস্যুরের ভাষাতত্ত্বে এ-ও বলা হয় যে, মানুষের ব্যবহৃত ভাষাচিহ্ন বা শব্দ, ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন অন্যান্য-ভাষাচিহ্নের সাথে তুল্য হবার পরই অর্থবোধক হয়। অর্থাৎ আমরা যখন উচ্চারণ করি 'মানুষ', তখন তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য, 'যেহেতু, মানুষ গাছ নয়, বাঘ নয়, পাহাড় নয়, নদী নয় সেহেতু মানুষ অর্থ মানুষ'– এমন একটা তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন নীতি ক্রিয়াশীল থাকে। দেরিদা, সস্যুরের এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করলেও, তত্ত্বটির বিস্তার ঘটান। দেরিদার ধারণায়, কোনো একটি ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন ভাষাচিহ্নের তুলনামূলক অবস্থান-বিশ্লেষণই মানুষকে জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় অর্থ প্রদান করে। অর্থ উদ্ধারের এই প্রক্রিয়ায় মানবিক চেতনার ক্রিয়াই থাকে মুখ্য, যার ফলে জগৎ ও জীবন-বিষয়ক অর্থপ্রাপ্তির সাথে সাথে একজন মানুষ তার উপস্থিতি বা অস্তিত্বকে গ্রাহ্য করে তৈরি করে এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ। অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগতের স্রষ্টা মানুষ 'আমি আছি তাই সব কিছুর অর্থ আছে, সব কিছুর অস্তিত্ব আছে'– এমন একটা উপলব্ধি বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে বিস্তার করে তার সমস্ত চিন্তার জাল। দেকার্ত তাঁর বিখ্যাত উক্তি cogito ergo sum (আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি) আর dubito ergo sum (আমি সন্দেহ করি তাই আমি আছি) দিয়ে অহং-সত্তাকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সত্যের প্রকৃত উপস্থাপক হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। দেরিদার মতে অহং-সত্তাকেন্দ্রিক এই চিন্তা প্রকৃত সত্য কিংবা অর্থকে উদ্ধার করে না, কারণ প্রকৃত সত্য ও অর্থ এক সময়হীন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক-দার্শনিক দেরিদার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, মানবিক উপস্থিতি বা অস্তিত্ব ভাষামাধ্যমেই প্রকাশিত, যা কিছু আছে তা অবশ্যই অস্তিত্বশীল কিন্তু অস্তিত্বহীনতার উপস্থিতি না থাকলে মানুষের পক্ষে অস্তিত্বকেও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের ধারণাকে ভাষাচিহ্নের তুলনাকেন্দ্রিক 'অর্থ-উদ্ধার-ক্রিয়া'র সমার্থক ভাবা যায়, কারণ যা বর্তমান হিসেবে গ্রাহ্য তা আসলে 'দ্যোতক/দ্যোতিত' ক্রিয়াকেন্দ্রিক একটা বিভ্রম হিসেবেই উপস্থিত। একজন মানুষের 'বর্তমান' শুধুমাত্র কিছু ভাষাচিহ্ন এবং তার দ্যোতক/দ্যোতিত নিয়েই অস্তিত্বশীল, যা ক্রমাগতভাবে

জটিল হয়ে 'অস্তিত্বশীল-অনস্তিত্বশীল' এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের আওতাধীন একটা ব্যবস্থা হিসেবে অবস্থান করে। দেরিদার মতে সময় ও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে, কারণ বর্তমান বলতে আমরা যা বুঝি, তা 'বর্তমান সময়কে' সত্য ও একককসত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে না; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে গঠিত সময়-সংগঠনের একটি তুলনামূলক বিন্দু হিসেবেই বর্তমানের উপস্থিতি।

মানবিক চিন্তন-ক্রিয়া 'অহং-উপস্থিতি' থাকার কারণে মানুষ সবসময় তার পছন্দমতো একটি কেন্দ্র বা centre নির্ধারণ করেই চিন্তা-ক্ষেত্রে এগুতে চায়। দেরিদার দর্শনে, কেন্দ্র খোঁজার এই মানবিক প্রবৃত্তিকেই উন্মোচিত করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে। একজন মানুষ যখন তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করে, ঠিক তখনই তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান নেয় 'আমি' এবং 'আমি কেন্দ্রিক' কিছু ধারণা বা centre, যাকে কোনো অবস্থাতেই অহং-অস্তিত্বের বাইরে রাখা সম্ভব নয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে আমিসত্তা দুটি ভিন্ন মাত্রায়, চেতন ও অবচেতনে বিভাজিত হলেও, চিন্তার কেন্দ্রস্থাপন প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটে না। চেতন 'আমি'-কে বিসর্জন দিয়ে কিছু চিন্তা করতে গেলেও অবচেতন অহং-সৃষ্ট একটা নতুন কিন্তু বিমূর্ত কেন্দ্রের উপস্থিতি মুখ্য হয়ে ওঠে। আসলে মানবিক চেতনা-কাঠামো সবসময় অহংকেন্দ্রিক বিভিন্ন যুগ্ম-বৈপরীত্য বা binary opposition-কে কেন্দ্র করেই তার অনুভূতি ধারণার বৃত্ত রচনা করতে চায়। ভালোমন্দ, দেহ/মন, সত্য/মিথ্যা, ঈশ্বর/মানব, ঈশ্বর/শয়তান, মানুষ/পশু, শুরু/শেষ ইত্যাদির মতো অহংকেন্দ্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্যসমূহকে বাদ দিয়ে কিছু চিন্তা করতে গেলে, অহং নিজেই 'অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব' যুগ্ম-বৈপরীত্য নিয়ে হয়ে উঠে অস্তিত্বের প্রধান কেন্দ্র বা পরম সত্তা। ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত মানবিক চিন্তায় কোনো কেন্দ্রহীন বিন্দুকে খুঁজে পাওয়া চিন্তাশীল মানবিক কর্মকাণ্ডে বাস্তবেই অসম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শন মানবিক চিন্তা বা ধারণার কেন্দ্র রচনার বিরুদ্ধে নয়, কিংবা কোনো কেন্দ্র ছাড়াই চিন্তা করা সম্ভব, এ সিদ্ধান্ত দেয় না। দেরিদা তাঁর দর্শনে, চিন্তাকাঠামোর মানবিক উপাদানসমূহকে বিশ্লেষণ করে ভাষামাধ্যমে প্রকাশিত যে কোনো বক্তব্য, বিবরণ, বর্ণনা ও উপস্থাপনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যখ্যাসহ, অহংচিন্তার কেন্দ্র ও কেন্দ্রের চতুর্দিকে রচিত মানবিক প্রকাশের ক্রিয়া ও বৃত্তকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন যৌক্তিকভাবে।

দেরিদার ডিকন্স্ট্রাকশন

জ্যাক দেরিদা তাঁর বিখ্যাত বই Of Gramatology-তে মানুষের চিন্তার কেন্দ্র স্থাপনের সহজাত প্রবৃত্তিকে logocentrism বা স্বনকেন্দ্রিকতা বলে উল্লেখ করেছেন। Logos শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষায়, যার অর্থ হল word, শব্দ, স্বন বা ধ্বনি। ওল্ড টেস্টামেন্টের বিবরণ অনুযায়ী word বা শব্দ অস্তিত্বের প্রথম প্রকাশ এবং শব্দ থেকেই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি। বাইবেলে শব্দকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং শব্দের যোগাযোগ ঘটেছে স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে। 'ঈশ্বর বলিলেন– হও' এবং 'অতঃপর বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হইল'– এ ধরনের উচ্চারিত বাক্যের প্রাধান্য বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে দেখা যায়, যার ফলে কণ্ঠস্বরের এই পরোক্ষ উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ঈশ্বর বা পরমসত্তার অবস্থান।

অহংসহ যে-কোনো সত্তার চরম ও পরম অস্তিত্ব শুধুমাত্র উচ্চারিত শব্দেই পাওয়া সম্ভব, মানুষের সহজাত এই ধারণার ওপর নির্ভর করে উচ্চারিত মৌখিক ভাষা সবসময় লিখিত ভাষার ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। 'মৌখিক ভাষা/লিখিত ভাষা'– এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণীমর্যাদা বা hierarchy নির্ধারণ করলে মুখের ভাষার স্থান প্রাধান্য পেয়ে অহং-অস্তিত্বের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, ফলে logocentric বা স্বনকেন্দ্রিক চিন্তার মাঝে phonocentricism বা ধ্বনিকেন্দ্রিকতাই হয়ে ওঠে মুখ্য। ধ্বনিকেন্দ্রিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ায়, যে-কোনো রকম লিখিত ভাষা দূষিত বলে গণ্য হতে পারে, কারণ মৌলিক ভাষার অবস্থান থাকে মানবিক চিন্তার খুব কাছাকছি। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে ধ্বনিকেন্দ্রিকতাই যে মুখ্য, তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক একজন মায়ের সন্তান বিদেশে আছে এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য রয়েছে চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। বাস্তবে দেখা যাবে টেলিফোনে সন্তানের কণ্ঠস্বর শোনার পর একজন মা যতটা সুখী হচ্ছে, চিঠির লিখিত ভাষা পড়ে সে ঠিক একই মাত্রার সুখ নিতে পারছে না। এর কারণ হল, সন্তানের কণ্ঠস্বরের সাথে তার অস্তিত্বের যে উপস্থিতি, চিঠির লিখিত ভাষা ঠিক একই মাত্রার অস্তিত্ব ধারণ করে না। নাটকের চরিত্র-উচ্চারিত ভাষার বেলায় দর্শকের অহংসত্তা ঘটনার সাথে যতটা সম্পৃক্ত হয়, গল্প বা উপন্যাস পাঠে কিন্তু ঠিক ততটা হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, ধ্বনিকেন্দ্রিক চিন্তাকাঠামোর ফলে প্লাতোর দর্শন ডায়ালগ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এবং অন্যান্য সাহিত্যে ও ধর্মগ্রন্থে কথোপকথনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে। লিখিত ভাষাকে দূষিত মনে করার পেছনে যে মানবিক যুক্তি কাজ করে তা হল, একটি লেখাকে বিভিন্ন সময় পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব, ভাষার লিখিতরূপের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে এবং একটি লেখা সৃষ্টি হবার পর স্রষ্টার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাগুক্ত ধারণা প্রযোজ্য নয়, কারণ উচ্চারিত ধ্বনি-তরঙ্গ বক্তার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার পরই বিলীন হয়ে যায়, যার ফলে উচ্চারিত ভাষার ব্যাখ্যা বক্তা ও শ্রোতার অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত। কিন্তু কোনো একটি কথোপকথন বা সাক্ষাৎকার লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হলে সেটি লিখিত ভাষা হিসেবে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে পড়ে। মানবিক যুক্তি, ভাব ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা যেহেতু লিখিত ভাষার ব্যাখ্যাকে নতুন বিন্যাসে উপস্থিত করতে চায়, সেহেতু অনেক দার্শনিক, সত্য প্রকাশের জন্য লিখিত ভাষা-রূপকে অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ফ্রান্সিস ব্যাকন, বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান বাধা হিসেবে লিখিত ভাষাকে চিহ্নিত করে বলেন– 'Men began to hunt more after words that matters and more after... tropes and figures, than after the weight of matter, ... soundness of argument'। বিজ্ঞানী নীল বোর ও হাইজেনবার্গ ভাষাসম্পর্কীয় একই রকম মত প্রকাশ করেছেন কোয়ান্টামতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বিশ্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে।

জাক দেরিদা লিখিত-ভাষার ওপর মৌখিক ও উচ্চারিত ভাষার অবস্থানকে 'উগ্র শ্রেণীমর্যাদা' বা 'violent hierarchy' বলে চিহ্নিত করেছেন। মৌখিক উচ্চারিত ভাষার উচ্চতর শ্রেণীমর্যাদা পাবার প্রেক্ষাপটে কাজ করে অহং-অস্তিত্ব, যা ধ্রুপদী দর্শনের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু মানুষের অবচেতনে গ্রন্থিত ভাষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উচ্চারিত ও লিখিত ভাষা

একই কাঠামোকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট। লিখিত ও মৌখিক ভাষার একক উৎস ও উভয়ের মাঝে ক্রিয়াশীল দ্যোতক-দ্যোতনার সমমাত্রিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে গ্রাহ্য করে দেরিদা, ভাষার প্রচলিত যুগ্ম-বৈপরীত্য 'মৌখিক ভাষা/লিখিত ভাষা'র উগ্র শ্রেণী-মর্যাদার বিচ্যুতি ঘটাতে চান। ভাষাব্যবস্থাভিত্তিক শ্রেণী-মর্যাদার এই উগ্র বিচ্যুতি দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শনের অন্যতম প্রধান শর্ত, যেখানে মানবিক অবচেতনে অঙ্কিত ধ্রুব ভাষাকাঠামোকে গ্রাহ্য করে লিখিত ভাষাকেও মৌখিক ভাষার সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দেরিদার দর্শন অনুযায়ী আমরা যা বলি বা লিখি, তার সবটাই একটি নির্দিষ্ট ভাষাকাঠামোতে মানবিক অবচেতনে ইতিমধ্যেই লিখিত (রোল বার্থের ভাষায় always already written) এবং এর ফলে লেখা আর বলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। দেরিদীয় দর্শনে, কাঠামোবাদের বহুল আলোচিত যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র বিচ্যুতি ঘটানো হলেও, কোনো একটি বিশেষ শব্দ-ধারণাকে অধিক মূল্য দেওয়া হয় না বরং বিচ্যুত যুগ্ম-বৈপরীত্যের যে-কোনো একটি 'শব্দ-ধারণা'র মাঝে তার বিপরীত শব্দের ছায়া-উপস্থিতি (trace), অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করে, ক্রিয়াশীল থাকে। বিচ্যুত-যুগ্ম-বৈপরীত্য 'লিখিত ভাষা/মৌখিক ভাষা'র ক্ষেত্রে লিখিত ভাষায় উচ্চারিত ভাষার ছায়া উপস্থিতি থাকে, যার ফলে মানবিক চিন্তা কোনো স্থির কেন্দ্র (centre) খুঁজে পায় না। ভাষার লিখিত ও উচ্চারিত রূপের মাঝে যে বৈষম্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে তাকে নির্ধারণ করার জন্যে দেরিদা suppleer নামক একটি ফরাসি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একই সাথে 'সম্পূরকতা ও বিনিময়যোগ্যতার' ধারণাকে বহন করে। বিনির্মাণ দর্শনে ভাষার উচ্চারিত ও লিখিত রূপের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত সম্পর্কই সম্পূরক এবং একই সাথে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্যও বটে। মানুষের অবচেতনে লিখিত ভাষাব্যবস্থার উচ্চারিত কিংবা লিখিত রূপের প্রকাশ সবসময় একটি তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন নীতির ওপর ভিত্তি করেই ক্রিয়াশীল এবং বিভিন্ন ভাষাচিহ্ন ও তার প্রকাশমাধ্যম বিনিময়যোগ্যতা ও সম্পূরকতার নীতি অনুসরণ করেই জগৎ ও জীবন বিষয়ে আমাদের অর্থবোধক উপলব্ধি দেয়।

অহংকেন্দ্রিক উচ্চারিত মৌখিক ভাষা আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হলেও, লিখিত ভাষার ব্যাখ্যা সবসময় সময়কেন্দ্রিক এবং বিভিন্ন দেশ-কাল প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়ে সৃষ্টি করে বহুমাত্রিক অর্থ বা দ্যোতনা। মুদ্রিত বা লিখিত ভাষাচিহ্নে অহং-এর অস্তিত্ব গৌণ থাকার ফলে এ রকম দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বিভিন্ন মাত্রার দ্যোতনা নির্ধারণ করা সম্ভব। জ্যাক দেরিদা লিখিত ভাষার এই দেশ-কাল-কেন্দ্রিক চরিত্রকে বোঝানোর জন্য differance বা যতিভেদ নামে একটি নতুন শব্দ চয়ন করেছেন। দেরিদা-সৃষ্ট differance শব্দটির মূলে রয়েছে differ, যা প্রভেদ বা পার্থক্যের সমার্থক আর deffer যার অর্থ হল যতি কিংবা বিলম্ব। ভাষাব্যবস্থার spatial বা স্থানিক ধারণায় বিভিন্ন ভাষাচিহ্নের যে তুলনামূলক অবস্থান থাকে তাকে কেন্দ্র করেই difference বা পার্থক্যবোধ কাজ করে আর ভাষার temporal বা কালকেন্দ্রিক অবস্থানে signifier বা দ্যোতকের অর্থ অস্তিত্বকে উহ্য রেখেও পুনস্থাপনের মাধ্যমে, যতি ও বিলম্বসহ, বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে প্রবাহিত হয় অসীমের দিকে, যাকে defference বলা যায়। Differ ও deffer-এর সম্মিলিত ফল differance বা

যতিভেদের কারণেই ভাষার মুদ্রিত বা লিখিতরূপের ব্যাখ্যা দেশ-কাল-কেন্দ্রিক অসীম দ্যোতনা (endless signification) নিয়ে উপস্থিত ও ক্রিয়াশীল। এখানে উল্লেখ্য যে, মৌখিক উচ্চারণে অহং-এর মুখ্য অস্তিত্ব থাকার কারণে যতিভেদ বা Differance কাজ করে না।

লিখিত ভাষার চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে দেরিদা নিম্নোক্ত উপাদানসমূহকে সনাক্ত করেছেন:

১. লেখকের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো পাঠকের অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে লিখিত ভাষারূপ পুনর্লিখিত কিংবা পুনর্মুদ্রিত হতে পারে।

২. লেখক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট 'ভাষা-চিহ্ন বিন্যাসকে' অন্য কোনো ঘটনা বা বিষয়কে প্রকাশ করার জন্যে ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন– বিভিন্ন রকম বক্তব্য, উপস্থাপনা ও বিবরণে আমরা বিভিন্ন লেখকের বক্তব্যকে কোটেশন বা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করি।

৩. লিখিত ভাষাচিহ্ন তার নিজস্ব সেট বা দলে অবস্থানকারী অন্যান্য চিহ্নের সাথে একরকম দূরত্ব (spacing), বজায় রাখে এবং লিখিত 'ভাষাচিহ্ন-বিন্যাসের' বিষয়কেন্দ্রিক বর্তমান সম্পর্কও (present reference) ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করে।

শ্রেণী-মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ও যতিভেদসহ লিখিত ভাষার সময়কেন্দ্রিক চরিত্রগুণ, যে-কোনো লিখিত/মুদ্রিত বক্তব্য, বিবরণ, বর্ণনা ও উপস্থাপনার অর্থ বা signification-কে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষণযোগ্য করে তোলে, যাকে দেরিদা ভাষার free play বা মুক্ত-ক্রীড়া বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রেণী-মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি বা যতিভেদ ক্রিয়াশীল থাকার সময় কোন একটি একক ভাষাচিহ্ন কিংবা চিহ্ন-সমগ্রের বিপরীত বা সম্পূরক দ্যোতনা মানুষের চেতনা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না, বরং ছায়ারূপে (under erasure) অবস্থান করে যুগ্ম-বৈপরীত্য-বোধের যে-কোনো একটিকে আড়াআড়িভাবে কেটে দিয়ে দেরিদা বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন, যা দার্শনিক হাইডেগার তাঁর দর্শনে প্রথম ব্যবহার করেছেন। অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, এই যুগ্ম-বৈপরীত্যে অস্তিত্ব প্রাধান্য পেলেও, অনস্তিত্ব ছায়ারূপে (under erasure) অবস্থান করে এবং এভাবে ভালো/মন্দ, সুখ/দুঃখ, সত্য/মিথ্যা ইত্যাদির বিনির্মিত রূপ ও স্বরূপকে নির্ধারণ করা সম্ভব।

দেরিদার ডিকন্স্ট্রাকশন সমসাময়িক দর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বে এক নতুন বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, যা বিংশশতাব্দীর মানবিক চেতনার কাঠামো বা paradigm কে নতুন মাত্রায় উপস্থিত করেছে। আমেরিকায় মাইকেল রায়ান, পল দ্য মান, হেডেন হোয়াইট, হ্যারল্ড ব্লুক, এম এইচ অ্যাব্রোস, হিলস্ মিলার, জিওফ্রে হার্টমান প্রমুখ সমালোচক দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শনকে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষণ করে নতুন চিন্তায় ও তাৎপর্যে উপস্থাপন করেছেন যা American Deconstruction নামে

পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, দেরিদীয় বিনির্মাণ-দর্শনের সাথে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উপাদানগত মিল খুঁজে যাওয়া সম্ভব। শব্দ ও ভাষাকে বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উপাদানগত মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শব্দ ও ভাষাকে বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন, তার সাথে সস্যুর ও দেরিদার দর্শনের সাযুজ্য রয়েছে।

আমেরিকান ডিকন্স্ট্রাকশন

১৯৬৬ সনে জন হপকিনস্-এ বিনির্মাণ বা deconstruction বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপনার পর থেকেই জ্যাক দেরিদা রাতারাতি আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ভাষাদর্শনের এই নতুন তত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সাহিত্য ও দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন বিভিন্ন ভাষাবিদ, সাহিত্যসমালোচক ও দার্শনিকরা। মাইকেল রায়ান মার্ক্সীয় দর্শনের বিনির্মাণ করে রচনা করেন Marxism and Deconstruction, যেখানে মার্ক্সীয় দর্শনের বহুবচনাত্মক রূপ ও স্বরূপকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নরথ্রপ ফ্রাই-এর বিজ্ঞানভিত্তিক মিথ-সমালোচনা-তত্ত্ব, লুকাসের হেগেলীয় মার্ক্সিজম, পোলেটের চেতনচিত্রবাদ (phenomenolgoy) নতুন সমালোচনাতত্ত্ব ও ফরাসি কাঠামোবাদ দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমেরিকান রোমান্টিক সাহিত্য সমালোচকবৃন্দ, যাঁরা কবিতায় নির্দিষ্ট সময় ও বাস্তবতার অবস্থানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁরাও দেরিদার দর্শনের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের চিন্তাকাঠামো পরিবর্তনে বাধ্য হন। পল দ্য মানসহ বেশকিছু সমালোচক রোমান্টিক কবিতায় বিনির্মাণের সম্ভাবনা খুঁজে পান। এ প্রসঙ্গে পল দ্য মান-এর মন্তব্য– 'রোমান্টিক কবিরা আসলে তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টিকেই বারবার বিনির্মাণ করেন। কবিতার 'বর্তমানে' একজন কবি তার কাঙ্ক্ষিত অস্তিত্বকে খুঁজে না পেয়ে, অবচেতন মনে চিন্তা করতে ভালোবাসেন যে শুদ্ধ অস্তিত্বের উপস্থিতি অতীতেই অবস্থান করছিল এবং অজানা আগামীর সম্ভাবনায় হয়তো-বা অস্তিত্বকে আবারও নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে।' দেরিদার বিনির্মাণের ওপর নির্ভর করে পল দ্য মান রচনা করেন Blindness and Insight (১৯৭১) এবং Allegories of Reading (১৯৭৯), যেখানে মান তার বিনির্মাণতত্ত্বকে বোঝানোর জন্য কিছু নতুন শব্দ চয়ন করেছেন। প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনাকে তিনি 'অন্ধের অর্ন্তদৃষ্টি' (insight through blindness) বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ এক ধরনের অন্ধত্বের দরুণ সমালোচকেরা সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যা বলতে চান, তা না বলে, অন্য কিছু বলে ফেলেন। পল দ্য মান-এর মতে, 'অন্ধের অর্ন্তদৃষ্টি'র সৃষ্টি হয় সমালোচকদের অবচেতনে, যেখানে চিন্তার কোনো একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বিচ্যুত হয়ে বা slide করে অন্য একটি পূর্বনির্ধারিত কিংবা নতুন কাঠামোতে

অবস্থান নেয়। Allegories of Reading-এ পল দ্য মান অলঙ্কারকেন্দ্রিক বিনির্মাণকে (Rhetorical deconstruction) বোঝাতে গিয়ে গূঢ়োক্তিতত্ত্ব (theory of trope) উপস্থাপন করেছেন। বাচনবৈশিষ্ট্য বা গূঢ়োক্তির (trope) মাধ্যকে একজন কবি বা লেখক এমন কিছু বলেন যার প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করে। গূঢ়োক্তিসৃষ্ট বহুমাত্রিক অর্থ রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের জন্ম দেয়। গূঢ়োক্তি বা trope ভাষার প্রচলিত ধ্রুব যুক্তিকে গ্রাহ্য করে না, ফলে মানুষের যুক্তিনির্ভর ভাষাকাঠামো গূঢ়োক্তি বা trope-এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। ব্যাপারটিকে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। 'আপনি ভালো আছেন?'- এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ যখন বলেন'– 'আজকাল ভালো আর মন্দ, সবইতো এক, আছি এ রকম, চলে যাচ্ছে', তখন প্রচলিত ভাষার যুক্তিতে ভালো ও মন্দ সমার্থক মনে হলেও, উত্তরদাতার অবস্থান, পরিবেশ ও সময়কে কেন্দ্র করে শ্রোতার মনে 'ভালো আছেন', 'মোটামুটি ভালো আছেন', 'ভালো নেই' এবং 'কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছেন না', এই চারটি অনুভূতি কাজ করতে পারে। সাহিত্যকর্মে যেহেতু গূঢ়োক্তি বা trope প্রচণ্ডভাবে উপস্থাপিত, সেহেতু সাহিত্যের ব্যঞ্জনা অসীম দ্যোতনা (endless signification) নিয়েই উপস্থিত। পল দ্য মানের মতে তিনি এ কথাও বলেন যে, কোনো সাহিত্য পড়ার অর্থই হল ভুলভাবে পড়া (reading is always necessarily misreading), কারণ ভাষার গূঢ়োক্তি বা trope, সাহিত্যের পাঠ (text) ও সাহিত্য উপলব্ধির মাঝে সবসময় কিছু পার্থক্য (difference/spacing) সৃষ্টি করে রাখে, যা সাহিত্যকর্মটিকেই self destructing বা স্ববিনাশী করে তোলে। ভাষাতাত্ত্বিক হেডেন হোয়াইট ঐতিহাসিক বিবরণেও বিনির্মাণ-দর্শনকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর লেখা Tropics of Discourse নামক বইটিতে। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যে-কোনো বিবরণকে বিষয়কেন্দ্রিক সত্য উপস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হলেও, তা কোনো অবস্থাতেই মানবিক-চেতনা-কাঠামোকে ডিঙাতে পারে না। ফলে সাহিত্যের মতো ইতিহাসেও গূঢ়োক্তি বা trope-এর উপস্থিতি থেকেই যায়, যা ইতিহাসের ঘটনাকেও বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিনির্মাণ করতে পারে। ভাষাবিদ হ্যারল্ড ব্লুম গূঢ়োক্তি বা trope সম্পর্কীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও মন্ত্রকেন্দ্রিক অতীন্দ্রিয়বাদকে (cabbalistic mysticism) উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে মিল্টন-পরবর্তী সব কবির চিন্তায়– 'অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, আমার আগেই অন্যান্য কবি-স্রষ্টা বলার মতো সব কথাই বলে ফেলেছেন'– এ ধরনের একরকম মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার অস্তিত্ব থাকে এবং এরূপ দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে যে-কোনো নতুন কবির মনে অবস্থান নেয় তাঁর অগ্রজ স্রষ্টা কবিকুল (founding fathers) সম্পর্কে ইদিপাস-এষণাজাত এক ধরনের ঈর্ষা। অগ্রজ কবির প্রতি নতুন কবির এই ঈর্ষা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নিত্যনতুন ব্যাখ্যা দিতে পারে, কারণ একজন নতুন কবি তার অগ্রজের কবিতাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই ভুলভাবে পাঠ করার পর নতুনভাবে বিনির্মাণ করতে চান। নতুন কবি তাঁর অগ্রজের কবিতা বিনির্মাণ করার সময়ে যে উপাদানগুলো ব্যবহার করেন তা হল, ব্যাজস্তুতি (irony), আংশিক উপস্থাপন (synecdoche), লক্ষণালঙ্কার (metonymy), অতিশয়োক্তি (hyperbole), রূপকালঙ্কার (metaphor) এবং রূপান্তর (metalepsis)। ব্লুম এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কিটস্‌ ও টেনিসনের নাম উল্লেখ

করেন, যাঁরা তাদের অগ্রজ কবিদের কবিতাকে বিনির্মাণ করেছেন বিভিন্নভাবে। উদাহরণ হিসেবে শেলির Ode to the West Wind-কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Immortality Ode-এর সাথে তুলনা করা সম্ভব। জিওফ্রে হার্টম্যান তাঁর লেখা Beyond Formalism (১৯৭০), The Fate of Reading (১৯৭৫) এবং Criticism in the Wilderness (১৯৮০) নামক বইগুলোতে সাহিত্যসমালোচনা ও সাহিত্যবোধকে সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবেই চিহ্নিত করে বলেন– 'সাহিত্যবোধ ও সাহিত্য সমালোচনার পাঠোদ্ধার সাহিত্যকর্মের মতোই জটিল। একজন সমালোচক সমালোচনার ক্ষেত্রে পাঠ বা ঃবীঃ-এর সীমানা ছাড়িয়ে অন্যদিকে চলে যেতে পারেন, কারণ পাঠ বা text-এর মূল্যায়ন করার সময় নিজস্ব পাণ্ডিত্যকে প্রকাশ করার সুপ্ত ইচ্ছাকে অনেক সময় সমালোচকেরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।' জিওফ্রে হার্টম্যান দেরিদার দর্শনকে গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি দেরিদার প্রয়োগ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করার পক্ষপাতী। পণ্ডিত সমালোচকদের হাতে পড়ে বিনির্মিত সমালোচনা মূল সাহিত্যকর্ম থেকে অনেক দূরে অবস্থান নিতে পারে বলে হার্টমান মনে করেন। আমেরিকান ডিকন্স্ট্রাকশনিস্ট হিলস্ মিলার বিনির্মাণের সপক্ষে থেকে বলেন– Language is not an instrument or tool in man's hand, a submissive means of thinking. Language rather thinks man and his 'World', including poems'.

সস্যুর, দেরিদা ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সত্য-জ্ঞানের যুক্তি বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈতন্যের যথার্থ রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করা এবং সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য-জ্ঞান লাভ করে সত্য বিশ্বাসকে উপস্থাপন করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব চর্চার মূল বিষয়। দর্শনচিন্তায় ভারতীয় দার্শনিকেরা কোনো সময়েই পিছিয়ে ছিলেন না। চার্বাকের জড়দর্শন এবং জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, বেদান্ত ও বেদান্ত-বৈষ্ণব দর্শনে আমরা জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় যে বিভিন্ন বস্তুবাদী ও ভাববাদী ব্যাখ্যা পাই তাকে প্রাচীন গ্রিক ও মধ্যযুগীয় যে-কোনো দর্শনের সাথে তুলনা করা সম্ভব। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক দর্শনচিন্তাকেও ধারণ করে।

জ্ঞানবিদ্যার উপাদান হিসেবে ভাষা ও শব্দসম্পর্কীয় ব্যাখ্যা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রাধান্য পেয়েছিল। বেদান্ত দর্শনে শব্দবোধের কারণকে শব্দ-প্রমাণ বলা হত এবং বাক্যের তাৎপর্য ও অর্থ অন্য কোনো প্রমাণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হলে বলা হত বাক্য-প্রমাণ (যস্য বাক্যস্য তাৎপর্যবিষয়ী ভূতসংসর্গো মানান্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্বাব্যং প্রমাণম্)। মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে পাণিনি-দর্শনের শব্দার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'স্ফোটতত্ত্ব' আলোচনা করেছেন। পাণিনি, পতঞ্জলি, ভতৃর্হরি,

বাদরায়ন, মণ্ডনমিশ্র, নাগেশ ভট্ট প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দের দর্শনসহ সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-বেদান্ত ও শৈববাদ দর্শনে স্ফোটতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। নাগেশ ভট্টের মতে, শব্দের স্ফোট-জ্ঞান অপরোক্ষ চৈতন্য মাত্র, যার কোনো পূর্বাপর নেই। স্ফোট শব্দটির অর্থ হল ব্যক্ত হওয়া, যার বাহ্য বৈশিষ্ট্য ধ্বনি ও অন্তর্বৈশিষ্ট্য অর্থ। মীমাংসাদর্শনের মতে দৈবী বাক্ (ধ্বনি)-ই আদি স্পন্দন এবং ব্রহ্ম ও বাক্ এক ও অভিন্ন সত্তা। উপনিষদে বাক্‌রূপ ব্রহ্মকে আকাশবৎ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে সংস্কৃত শব্দ ব্রহ্ম, লাতিন verbum logus ও ইংরেজি word শব্দের মূলে অবস্থান করে এক অপৌরুষেয় শব্দ-ব্রহ্মবাদ, যা দেরিদার দর্শনের স্বনকেন্দ্রিকতা বা Logocentrism-এর সমার্থক।

চার্বাকপন্থী দার্শনিকসহ বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকেরা মনে করেন শব্দ ও ভাষা কম বেশি প্রথাগত এবং অপৌরুষেয়। জৈব-দর্শন মতে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে বোঝায় না, শব্দ সর্বজনীনতা ধারণ করে, যেমন– 'গো' শব্দের বাচ্যর্থ 'গরুশ্রেণী'। সাংখ্যদর্শন জৈন মতবাদের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে শব্দের নির্দিষ্টতাকে মুখ্য করে তোলে। বৈয়াকরণ, মীমাংসক ও বৈদান্তিকদের মতে শব্দের জাত্যর্থ বা জাতিবাচক রূপই আসল, বস্তুর নির্দিষ্ট অবস্থান বা আকৃতিকেন্দ্রিক শব্দার্থ কখনো মুখ্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্ট বলেন– নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বং জাতিত্বম, অর্থাৎ শব্দের জাতিবাচক ধারণা নিত্য এবং এ কারণে নির্দিষ্ট কিছুকে শব্দ দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়। বেদান্ত দর্শনে বলা হয় যে শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্যের অর্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি ও তাৎপর্যজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল (বাচ্যজন্য জ্ঞানে চ আকাঙ্ক্ষ যোগ্যতা সতিত্তাৎপর্যজ্ঞানঞ্চেতি চত্তারি কারণানি)।

ধর্মকীর্তি তাঁর দর্শনে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বস্তুর উপস্থাপনা, প্রতিক্রিয়া ও বস্তুর প্রকৃত অর্থোপলব্ধিকে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, তস্নাৎ গ্রাহ্যে অর্থে বস্তুরূপে যদ্ বিপর্য্যস্তম্ তদাভ্রান্তমিহ বেদিতব্যম্, অর্থাৎ– ভ্রমাত্মক জ্ঞানে বস্তুসম্পর্কীয় যথার্থ জ্ঞান হয় না বলে তাকে সম্যক জ্ঞান বলা যাবে না। বস্তুকতগুলো ক্ষণিক অবস্থার প্রবাহমাত্র; বস্তু যে প্রবাহসহ উপস্থিত হয়, তদপরবর্তী সব অবস্থানসমূহের সম্যক উপলব্ধি হলেই জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভাবা যেতে পারে। ধর্মকীর্তির মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণই বস্তু সম্পর্কীয় অবিকৃত জ্ঞান প্রদান করে। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু জ্ঞানতত্ত্বে প্রমাণের প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের অবস্থানকে বিশ্লেষণ করেছেন। বসুবন্ধুর শিষ্য দিঙনাগ তাঁর দর্শনে বলেন, 'নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের কারণ শুধুমাত্র বাহ্যবস্তু আর সবিকল্প প্রত্যক্ষণের কারণ ইন্দ্রিয় সংবেদ, স্মৃতি ও কল্পনা মাত্র।' দিঙনাগ তাঁর গ্রন্থ 'প্রমাণ সমুচ্চয়ে' জ্ঞানতত্ত্বের উপাদান হিসেবে প্রত্যক্ষণ ও অনুমানকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, প্রত্যক্ষমনুমাঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণম্। প্রমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণান্তবং ভবেৎ–অর্থাৎ– প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই প্রমাণের দুই লক্ষণ, প্রমাণ সিদ্ধ হলে নতুন করে প্রমাণ করা প্রয়োজনহীন।

মানবিক প্রত্যক্ষণ ও অনুমানকে কেন্দ্র করে জ্ঞানতত্ত্বের যে বিস্তার প্রাচীন ভারতে ঘটেছিল তার মৌলিক উপাদান হিসেবে অবস্থান করছিল শব্দ ও ভাষার দার্শনিক বিশ্লেষণ, যাকে সমসাময়িক ভাষাদর্শনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে এসে জ্যাক দেরিদা বিনির্মাণের যে দর্শন আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন ঠিক একই রকম চিন্তার প্রকাশ প্রাচীন

বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায়। দিঙনাগ (৪২৫ খ্রি.) তার মুখ্য গ্রন্থ 'প্রমাণ সমুচ্চয়'-এ জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন তাতে সস্যুরের ভাষাতত্ত্ব ও দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন-এর সমার্থক ধারণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয়ে ন্যায়শাস্ত্র ও জ্ঞানতত্ত্বসম্পর্কীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছিল এবং বিষয় হিসেবে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান, পরার্থনুমান, দৃষ্টান্ত, অপোহ ও জাতি পরীক্ষার সূত্রাবলি। প্রমাণসমুচ্চয়ের মোট শ্লোক সংখ্যা ছিল ২৪৭টি, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বৌদ্ধ দার্শনিক জিনেন্দ্রবুদ্ধির (৭০০ খ্রি.) 'মহাবৈয়াকরণ কারিকাবিবরণ পঞ্জিকায়' পাওয়া যায়। দিঙনাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়ের' মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। তবে ধর্মকীর্তির (৬০০ খ্রি.) 'প্রমাণবার্তিকে' ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'কারিকাবিবরণে'র মাধ্যমে আমরা দিঙনাগের জ্ঞানতাত্ত্বিক দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। দিঙনাগ তাঁর গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'প্রমাণভূতায় জগদ্ধিতৈষিণে প্রণম্য শাস্ত্রে সুগতায় তায়িনে। প্রমাণসিদ্ধৈয় স্বমতাত্ সমুচ্চয়োঃ করিষ্যতে বিপ্রসিতাদিহৈক– অর্থাৎ– জগতের হিতৈষী প্রমাণভূত উপদেষ্টা বুদ্ধকে নমস্কার করে সর্বত্র প্রসারিত তার মতকে এখানে এক জায়গায় প্রমাণসিদ্ধির জন্য একত্রিত করা হল।' দিঙনাগ-সম্পর্কীয় আধুনিক ব্যাখ্যা শ্চেরবেৎস্কি (Stcherbatsky) রচিত Buddhist Logic (Dover Publication, Inc, New Work, ১৯৬২) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

দিঙনাগের দর্শনের সাথে সস্যুর ও দেরিদার দর্শনের যে সাযুজ্য রয়েছে তা 'প্রমাণসমুচ্চয়ে'র কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে উদ্ধার করা সম্ভব। দিঙনাগের ভাষায়– 'শব্দ থেকে সৃষ্ট জ্ঞান অনুমান থেকে ভিন্ন নয়। আসলে কোনো নামবাচক শব্দের অর্থ, বিপরীত কোনো অর্থ বা দ্যোতনার সাথে তুল্য হবার পরেই অর্থবোধক হয়, যেমন– 'সৃষ্টি' শব্দটির অর্থ 'সৃষ্টি নেই যার' এমন কোনো চরম ও পরম বস্তুর সাথে তুলনার পরই অর্থ বহন করে।' সস্যুরের ভাষাদর্শনে একটি ভাষাচিহ্ন যে রকম তুলনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থবোধক হয়ে ওঠে, দিঙনাগও ঠিক একই রকম প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। দার্শনিক প্রাধান্য বিচারে দিঙনাগের দর্শনকে অধিক মূল্য দিতে হয়, কারণ সস্যুর বিংশ শতাব্দীতে ভাষাদর্শন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, ঠিক একই তত্ত্ব দিঙনাগ পঞ্চম শতকে ব্যবহার করেছেন জ্ঞানতত্ত্বের বিশ্লেষণে। এ প্রসঙ্গে শ্চেরবেৎস্কি-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। দিঙনাগ ও প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন আলোচনাকালে তিনি বলেন– 'দিঙনাগের মতে শব্দ থেকে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা অনুমান থেকে পৃথক কিছু নয়, কারণ শব্দকেন্দ্রিক যে-কোনো জ্ঞানই হল পরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞানের প্রত্যক্ষ রূপের উৎস হল ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও বুদ্ধি, আর পরোক্ষ জ্ঞানের মূলে থাকে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান। ভাষা, জ্ঞানের কোনো পৃথক উৎস নয় এবং সর্বজনীন শব্দ দিয়ে বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে বোঝানো যায় না। বাস্তবতা যেহেতু কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে কেন্দ্র করে অবস্থান করে সেহেতু সর্বজনীন শব্দ দ্বারা বাস্তবতাকে প্রকাশ করা বাস্তবেই অসম্ভব। জ্ঞানবৃত্তির উপাদান হিসেবে ভাষা পরোক্ষভাবে বাস্তবতাকে বোঝায়, যা অনুমানের তুল্যমূল্য এবং ভাষা জ্ঞানবৃত্তির পরোক্ষ উপাদান হিসেবে মানবচেতনায় উপস্থিত। বাস্তবের সত্যমূল্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুদ্ধ 'হ্যা-সূচক' অনুভূতির প্রয়োজন। ভাষায় শুদ্ধ 'হা-সূচক' উপলব্ধি অনুপস্থিত এবং এ কারণে প্রকৃত বাস্তবতাকে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি

না। পরোক্ষ জ্ঞানের উপাদান হিসেবে কিছু দ্বান্দ্বিক নঞার্থক ও অনুমানকেন্দ্রিক অনুভূতি ও তার সমতুল্য অর্থ নিয়েই ভাষার অবস্থান।'

জিনেন্দ্রবুদ্ধি তার 'মহাবৈয়াকরণ কারিকাবিবরণ পঞ্জিকা'য় দিঙনাগের দর্শনের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাকে দেরিদার দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণার সাথে তুলনা করা যায়। জিনেন্দ্রবুদ্ধি বলেন– 'শব্দ নঞার্থক তুলনা ও প্রভেদকে (difference) গ্রাহ্য করেই অর্থবোধক হয় কারণ কোনো শুদ্ধ 'হা-বাচক' অনুভূতি 'না-সূচক' অনুভূতি ছাড়া অর্থবোধক নয়। কোনো শুদ্ধ 'না-সূচক' উপলব্ধিও 'হা-সূচক' উপলব্ধি ছাড়া অবস্থান করতে পারে না। কোনো অবস্থানকে (ঢ়ড়ংরঃরড়হ) নির্দিষ্ট করার জন্য অবস্থান-হীনতাকে (contraposition) ধারণ করতে হয় এবং ঠিক একইভাবে একটি শব্দ অর্থবোধক হবার জন্য তার বিপরীত 'নঞার্থক শব্দকে' গ্রাহ্য করে। জিনেন্দ্রবুদ্ধি আরও বলেন যে, 'শব্দের অর্থ বা দ্যোতনা (signification) বক্তার বক্তব্যকে প্রকাশের জন্য সর্বজনীন, কিন্তু এই সর্বজনীন রূপ প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। শব্দের অর্থ যদি সর্বজনীনই হয়, তবে কি শব্দের অবস্থান মানব মনের বস্তু বা বিষয়ী চিত্ররূপের (mental image) বিপরীতে? আমরা কি তবে ব্যক্তিমানুষের চেতনার চিত্ররূপকেই সর্বজনীন ভাবছি? তা কিভাবে হয়?' জিনেন্দ্রবুদ্ধির এসব প্রশ্নের উত্তরে সস্যুরের ভাষাচিহ্ন (sign) ও তার বিপরীতে দ্যোতক (signifier) ও দ্যোতিতের (signified) পিঠাপিঠি অবস্থানকে উপস্থিত করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, দিঙনাগ ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির ভাষাদর্শনের প্রাধান্য যখন অবস্থান করছিল সার্বজনীন দ্যোতনার ওপর, যা জ্ঞানবিদ্যার মুখ্য উপাদান, তখন সস্যুর ভাষাচিহ্নের বিপরীতে signifier ও signified-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বিস্তারিতভাবে। সস্যুরের দর্শন অনুযায়ী মানুষের মনের চিত্ররূপ সবসময় বৈষম্য (difference) নির্ধারণের মাধ্যমেই অর্থ পায়, যেমন– লাল রঙ শুধুমাত্র লাল হয়ে ওঠার মূল কারণ হল তা নীল নয়, সবুজ নয় কিংবা বর্ণালীর অন্য কোনো রঙের সাথে তার মিল নেই এবং এভাবেই কোনো ধারণা কিংবা দ্যোতনার শুরু হয় প্রত্যক্ষণ দিয়ে যেখানে ধারণা ও দ্যোতনার কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করে বৈষম্য ও বিলম্ব (difference and defferance) নির্ধারণ প্রক্রিয়া।

দেরিদা তাঁর ভাষাদর্শনের কেন্দ্রে অসীমের দিকে প্রবহমান 'অস্তিত্ব/অনস্তিত্বর যুগ্ম-বৈপরীত্যকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, দিঙনাগ ও জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রায় একই রকম যুগ্ম-বৈপরীত্যকে উপস্থাপন করেন। শেচরবেৎস্কি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বৌদ্ধ দার্শনিকদের চিন্তায় বাস্ত বতাকে অবাস্তবতা কিংবা জ্ঞানকে অজ্ঞান দ্বারা নির্ধারণ না করা হলেও, প্রত্যক্ষণকে অপ্রত্যক্ষণের পরবর্তী অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।' প্রত্যক্ষণ/অপ্রত্যক্ষণ, এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের মধ্যবর্তী অবস্থাকে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষণ-বাধা বা interrupted perception হিসেবে চিহ্নিত করেন। অস্তিত্ব/অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করে দেরিদা যে defferance বা যতি-র কথা বলেন তা দিঙনাগ ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির প্রত্যক্ষণ বাধার সমতুল্য।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বিশ্লেষণ করার পর প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে ওঠে, তা হল, পঞ্চম শতাব্দীতে দিঙনাগ ও সপ্তম শতাব্দীতে জিনেন্দ্রবুদ্ধ যে ভাষাদর্শন উপস্থিত করেছিলেন, প্রায় একই রকম দর্শন

কিভাবে সস্যুর ও দেরিদা বিংশ শতাব্দীতে উপস্থিত করলেন? সস্যুর ও দেরিদা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন থেকে তাদের দার্শনিক ধারণা নিয়েছিলেন; একথা চিন্তা করা অসম্ভব নয়। অবশ্য এমনও হতে পারে মানবিক চেতনার সর্বজনীন কাঠামোগতরূপই বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়কে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করেছে।

সাহিত্য সমালোচনায় দেরিদার ডিকন্সট্রাকশনের প্রয়োগ

মানবিক যে-কোনো চিন্তা ও কর্মের মাঝে গ্রহণ-বর্জন এবং সম্পূরকতার নীতি বিশেষভাবে কাজ করে, যার ফলে মানবিক চিন্তা-চেতনায় অবস্থান করে অনুভূতি সময়কেন্দ্রিক বিভিন্ন উগ্র শ্রেণী-মর্যাদার যুগ্ম-বৈপরীত্য। সময়ের সাথে প্রবহমান মানবিক প্যারাডাইম বা চেতনাকাঠামো যে-কোনো মুহূর্তে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসকে গ্রহণ কিংবা বর্জনের মাধ্যমে চিন্তার কেন্দ্রমূলে অবস্থানকারী যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণী-মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটিয়ে তৈরি করে নিতে পারে নতুন সময় কিংবা নতুন সত্তার উপস্থিতিকে। সাহিত্যকর্মের বেলায় এ রকম দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার অবস্থান থাকে বিশেষভাবে, যাকে সাহিত্য সমালোচনার দেরিদীয় বিশ্লেষণে আনা সম্ভব।

কাঠামোবাদী ধারণায় মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’ ভালো-মন্দের বৈপরীত্য নিয়ে রচিত, যেখানে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তার সাথে যুক্ত হয়েছে ভালো কিংবা উত্তমের অস্তিত্ব আর মন্দ কিংবা অধম-অস্তিত্ব, সম্পূরক হিসেবে অবস্থান নিয়েছে উত্তম সত্তার অধীনে। ভালো/মন্দ কিংবা উত্তম/অধম এই যুগ্ম-বৈপরীত্যকে অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব-কেন্দ্রীয় দ্বিতীয় চিন্তায় বিশ্লেষণ করলে শ্রেণী-মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটতে পারে এবং পতিত অস্তিত্ব কিংবা অধম উঠে আসতে পারে উত্তমের উপরে, যেখানে অধমের সাথে উত্তমের ছায়া-উপস্থিতি (trace) মানবিক চিন্তা-চেতনাকে বিনির্মাণ করতে পারে বিভিন্নভাবে। এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠবে, ঈশ্বর যদি শুদ্ধ-অস্তিত্ব হিসেবে উত্তম-সত্তার ধারক হন তবে শয়তানকে সৃষ্টি করল কেন? কেন সৃষ্টি হল অহমের? শয়তানের পতনের জন্য দায়ী ছিল কে? মানুষ কিংবা শয়তানকে পাপে প্রলুব্ধ করেছিল কোন সত্তা? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ শুদ্ধ ও উত্তম অস্তিত্ব-কাঠামো ভেঙে পড়ে, কারণ পাপ ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের এক অন্য রকম বিপরীত চরিত্রই উন্মোচিত হয়। এ অবস্থায় আমরা কোনো ধ্রুব উত্তম সত্তাকে খুঁজে পাই না, ফলে প্রচলিত ধারণায় গ্রাহ্য ‘ভালো/মন্দ’ যুগ্ম-বৈপরীত্যকে উগ্র বিচ্যুতির মাধ্যমে নতুনভাবে সাজিয়ে বলতে হয়, মন্দের (মন্দ হয়তো-বা ভালোই) পরই ভালো-র সৃষ্টি (ভালো হয়তো-বা ভালো নয়) আর মানুষের পতনের পরই অবস্থান করছে উত্তমের সত্তা। ঈভের প্রতি এডামের প্রেম ছিল উত্তম সত্তার অধীন, যাকে অশুভ শয়তান-সত্তা পতনের পূর্বে কলুষিত করেছিল। প্যারাডাইস লস্ট-এর ভালো ও মন্দ সত্তার কাঠামোগত বিনির্মাণ করেছেন বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচক। ব্লেকের ধারণায়, মিল্টন তাঁর কাব্যে শয়তানের পক্ষ নিয়েছিলেন আর শেলির মতে

প্যারাডাইস লস্ট-এ শয়তানের চরিত্র ছিল ঈশ্বরের চেয়ে মহৎ। শয়তান, এডাম ও ঈভের প্রেম ও দৈহিক মিলনের সপক্ষে ছিল বলেই হয়তো মানবিক চেতনার দৃষ্টিতে শয়তানকে ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য, দেরিদীয় দর্শন অনুযায়ী ঈশ্বর/শয়তান কিংবা ভালো/মন্দ সত্তার শ্রেণী-মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটলেও, 'ঈশ্বর-শয়তান' এবং 'ভালো-মন্দ' সত্তার অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব অবস্থান করে পাশাপাশি একটা সম্পূরক ও বিনিময়যোগ্য প্রবহমান ধারণাকে কেন্দ্র করে।

বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন কাব্য ও সাহিত্যকর্মের বিনির্মিত রূপ ও স্বরূপকে এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ বিনির্মাণের উদাহরণ হিসেবে খুবই উল্লেখযোগ্য। মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণের কিছু অংশকে কেন্দ্র করে লেখা, যেখানে ধ্রুপদী বিশ্বাসের অন্তর্গত 'রাম/রাবণ' যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বিনির্মাণ করা হয়েছে নতুনভাবে। এ কাব্য সম্পর্কে ড. মনিরুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি তাঁর আলোচনায় দেরিদার deconstruction-কে আনেননি (সত্তরের দশকে দেরিদার প্রসঙ্গ আনা সম্ভব ছিল না) তবু তাঁর আলোচনায় বিনির্মাণ-কাঠামোকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ কাব্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য– 'মেঘনাদবধ কাব্যে-র মূল ভিত্তি 'রামায়ণে'র খণ্ডাংশ। কিন্তু কাহিনী ও চরিত্র মধূসূদনের হাতে নবরূপে নির্মিত। রামায়ণের নায়ক, ধর্মের প্রতীক, রামচন্দ্র এখানে পররাজ্য আক্রমণকারী; লক্ষণ কাপুরুষাধম, বিভীষণ রক্ষোকুলগ্লানি। অন্যদিকে রামায়ণের রাক্ষস রাবণ এখানে নায়কের শৌর্যবীর্য ও গুণাবলী মণ্ডিত, দশানন তার রামায়ণানুগ দশমুণ্ড বিশিষ্ট বীভৎস আকৃতির বর্ণনা নয়–দশজন অতুলনীয় মহাবীরের শক্তির সমাহার রূপে কল্পিত। মেঘনাদ অমিতশক্তি রাবণেরই যৌবন-প্রতিরূপ। কাব্যের ট্রাজেডি, কবির পরিকল্পনা রাবণকে ঘিরেই আবর্তিত। রাবণের অতুল শক্তি ও তার নিয়তিনিহিত পরিণাম মধুসূদনের কালের নব্যবিকাশোন্মুখ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তেরই অসাধারণ বাণীরূপ।... চিত্রা, সীতা, জটায়ু এবং দেবদেবীদের সংলাপে সীতাহরণরূপ চরিতদৌর্বল্যই রাবণের ট্রাজেডির কারণ বলে নির্দেশিত। চরিত্রের অন্তর্গত ত্রুটির ফলে ট্রাজেডি ঘনীভূত হবার এই শেক্সপিয়রীয় কৌশল মধুসূদন সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করেছেন, মনে হয়। কিন্তু রাবণের উক্তিতে বা আচরণে এই 'পাপ' সচেতনতার কোনো চিহ্ন নেই। বরং বারবার তার বিমূঢ় প্রশ্ন– 'কি পাপে দেখিয়া রে দারুণ বিধি হরিলি এ ধন তুই?' বিশেষত সীতাহরণকে সে আদৌ পাপ বলে মনে করে না; ভগ্নি শূর্পনখার প্রতি রাম-লক্ষণ-সীতার অপমান প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যেই যেন তার সীতাহরণ। তাই তার ট্রাজেডি যেন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির বিধান–'

উপরিউল্লেখিত আলোচনা-অংশ থেকে আমরা রাম-রাবণের পৌরাণিক ঘটনার বিনির্মাণকে চিহ্নিত করতে পারি। মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণের কাহিনীবিন্যাসের সাথে প্রাচ্যের মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও পাশ্চাত্যের মিল্টন, ত্যাসো, ভার্জিল, দান্তে, হোমারের কাব্য ও গ্রিক পুরাণের বিনির্মিত উপাদানকেও চিহ্নিত করা যায়, যা আমেরিকান ডিকন্সট্রাকশনিস্ট হ্যারল্ড ব্লুমের তত্ত্বকে সমর্থন করে। মিল্টনের 'কোমাস' কাব্যে উল্লেখিত সেবার্ন নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাব্রিনা ও তার বান্ধবী লাজিয়া মেঘনাদবধে এসেছে বারুনী-মুরলা প্রসঙ্গে আর ত্যাসেরার Cerusalemme liberta কাব্যের কুহকিনী আর্মিডার উপবনে বিলাসমত্ত রিনাল্ডের কাহিনীর বিনির্মাণ হয়েছে অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরীর বাইরে মেঘনাদের প্রমোদ-উদ্যান ও প্রমীলাকে কেন্দ্র করে, যেখানে প্রমীলা সর্বাংশে

আর্মিডা নয় আর আর্মিডার উপবনের স্থানে উপস্থিত মেঘনাদের নিজস্ব প্রমোদ-উদ্যান। মেঘনাদ হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেবদেবীদের উল্লেখ মূল রামায়ণে নেই, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে এ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে, যা হেমারের 'ইলিয়াড' কাব্যে উল্লেখিত জুপিটার-পত্নী জুনো ও নিদ্রাদেব সমনাসের ষড়যন্ত্রের সাথে তুল্য। মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলা নারীত্বের কোমলতা ও শৌর্যের প্রতীক, যাকে ইলিয়াডে উল্লেখিত হেক্টরপত্নী এ্যান্ডোম্যাকি ও ত্যাসোর আর্মিডার সাথে তুলনা করা সম্ভব। ভার্জিলের 'ঈনিদ' কাব্যের নায়ক ইনিয়স তাঁর পিতা অঙ্কাইসিসের নিকট থেকে যেরূপ ভবিতব্য দর্শন লাভ করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ঠিক একই রকম ভবিতব্য দর্শন লাভ করেন তাঁর মাতার কাছ থেকে। মেঘনাদবধে লক্ষণ যখন চেতনাহীন তখন মায়াদেবীর যত্নে কাপুরুষ লক্ষণ চেতনা ফিরে পায় এবং মেঘনাদের প্রতি শর নিক্ষেপ করে। শরবিদ্ধ মেঘনাদ নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় যখন লক্ষণের দিকে হাতের কাছে পাওয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহার ইত্যাদি ছুঁড়তে থাকেন তখন 'মেয়াদেবী মায়া, বাহু-প্রসরণে, ফেলাইয়া দূরে সবে, জননী যেমতি খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে করপদ্ম-সঞ্চালনে।' মায়াদেবীর সাহায্যে কাপুরুষ লক্ষণের বেঁচে যাওয়া, ইলিয়াডে উল্লেখিত মেনেলাসের প্রতি প্যান্ডরাস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর দেবী মিনার্ভা কর্তৃক ব্যর্থ করার সমতুল্য। মেঘনাদবধ কাব্যে এ রকম অনেক উপাদান পাওয়া যাবে যা ইতিপূর্বে লিখিত ঘটনার বিনির্মিত রূপ। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রচ্যের প্রচলিত সাহিত্য-বিশ্বাসে যে-কোনো ধরনের কাহিনীর বিস্তার জন্ম-জন্মান্তরকালকেন্দ্রিক হলেও মধূসূদন দত্ত তাঁর কাব্য শুরু করেছেন পৌরাণিক রামায়ণের ঘটনাবিন্যাসের মধ্যবিন্দু থেকে। কাঠামোবাদী ও উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী, যে-কোনো সাহিত্যকর্মের যে-কোনো পর্বে একজন পাঠক পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়াই প্রবেশ করে অর্থ উদ্ধার কিংবা বিনির্মাণ করতে পারেন। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য সৃষ্টির বেলায়ও রামায়ণের মধ্যপর্বে প্রবেশ করেছেন আর উপস্থাপন করেছেন এক নতুন বিনির্মিত অসাধারণ সাহিত্যকর্মকে।

বিনির্মাণতত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ক্ষুদে কাব্যনাটক 'গান্ধারীর আবেদন'-কে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যে 'মহাভারতের' খণ্ডাংশকে বিনির্মাণ করা হয়েছে সুখ/দুঃখ, জয়/পরাজয়, হিংসা/অহিংসা, ধর্ম/অধর্ম, প্রশংসা/নিন্দা, ঔদার্য্য/হীনতা ইত্যাদির মতো মানবিক-গুণাবলি-কেন্দ্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণী-মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটিয়ে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস রচিত মহাভারতে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধৈর্যশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তির ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দুর্বৃত্ততাকে বিবৃত করেছেন। ন্যায়বিচারে পাণ্ডবরা সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার হলেও, সিংহাসনের লোভে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন তাঁর মাতুল শকুনির পরামর্শে কাপুরুষোচিতভাবে পাণ্ডুবপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এক দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়ে দেন এবং পঞ্চপাণ্ডবকে বারো বছরের বনবাস ও এক বছরের অজ্ঞাতবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের সত্যপরায়ণতা ও প্রতারক দুর্যোধনের কাপুরুষতা বিবৃত হলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুর্যোধনের প্রতি পাঠকের নেতিবাচক বা ঘৃণাত্মক উপলব্ধি কাজ করে না। বিনির্মাণ বিশ্লেষণের জন্য 'গান্ধারীর আবেদন' থেকে কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল।

পর্ব: এক

দুঃখ / সুখ　　সুখ / দুঃখ ।　　জয়/পরাজয়/　　পরাজয় / জয়

ধৃতরাষ্ট্র ।	ওরে দুরাশয় অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ!
দুর্যোধন ।	লভিয়াছি জয়
ধৃতরাষ্ট্র ।	এখন হয়েছো সুখী!
দুর্যোধন ।	হয়েছি বিজয়ী
ধৃতরাষ্ট্র ।	অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই রে দুর্মতি?
দুর্যোধন ।	সুখ চাহি নাই মহারাজ জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ

পর্ব: দুই

অহিংসা / হিংসা,　　হিংসা / অহিংসা

ধৃতরাষ্ট্র ।	ধিক তোর ভ্রাতৃদ্রোহী । পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ সে কি ভুলে গেলি?
দুর্যোধন ।	ভুলিতে পারি নে সে যে– এক পিতামহ, তবু ধানে মানে তেজে এক নহি । যদি হ'ত দূরবর্তী পর নাহি ছিল ক্ষোভ । শর্বরীর শশধর মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে কিন্তু পাতে এক পূর্ব-উদয়-শিখরে দুই ভাতৃ সূর্যালোক কিছুতে না ধরে ।
ধৃতরাষ্ট্র ।	ক্ষুদ্র ঈষাঃ বিষময়ী ভুজঙ্গিনী!
দুর্যোধন ।	ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী ।

ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম । দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান; লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন ।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র বন্ধনে
এক সূর্য, এক শশী ।

পর্ব: তিন

অর্ধম / ধর্ম, ধর্ম / অধর্ম

ধৃতরাষ্ট্র । আজি ধর্ম পরাজিত
দুর্যোধন । লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতা!
....
রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয় ।
....
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই
শুধু জয় ধর্মআছে; মহারাজ তাই
আমি আজি চরিতার্থ, আজ জয়ী আমি
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি ।

পর্ব: চার

হীনতা / ঔদার্য, ঔদার্য / হীনতা

ধৃতরাষ্ট্র । জিনিয়া কপট দ্যূতে তারে কোস্ জয়
লজ্জাহীন অহংকারী!
দুর্যোধন । যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল
ব্যঘ্রসনে নখে দন্তে নহিকো সমান,

তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু-মাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে। জয় লাভ এক লক্ষ্য তার।
আজি তুমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

পর্ব: পাঁচ

নিন্দা / প্রশংসা,　　　　প্রশংসা / নিন্দা

ধৃতরাষ্ট্র।　　　আজি তুমি জয়ী, তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে

দুর্যোধন।　　　নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ;
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
দুর্যোধন রাজা, দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম
....
অব্যক্ত নিন্দায়
কোন ক্ষতি নাহি করে রাজ মর্যাদায়;
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাই পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ? প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জারে
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডব ভ্রাতারে
.... আমি চাহি ভয়
সেই মোর রাজপ্রাপ্য– আমি চাহি জয়।

পর্ব: ছয়

ভালোবাসা / ঘৃণা, ঘৃণা / ভালোবাসা

গান্ধারী । ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে
কৌরবকল্যাণলক্ষী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন ।
ধৃতরাষ্ট্র । ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে সে লঙ্ঘন করেছে– আমি পিতা
গান্ধারী । মাতা আমি নহি? গর্ভভার জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ড তলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্তশুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছাসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
.... তবু কহি মহারাজ
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ ।
ধৃতরাষ্ট্র । ধর্মবিধি বিধাতার
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড কার
রয়েছে উদ্যত নিত্য; অয়ি মনস্বিনী
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য করিবেন তিনি
আমি পিতা–

উপরিউক্ত পর্বগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দুর্যোধনের যুক্তিপ্রবাহের শক্তি ও ধৃতরাষ্ট্রের ভালোবাসা-ঘৃণার দ্বান্দ্বিকতা প্রচলিত মানবিক গুণকে প্রচণ্ডভাবে বিনির্মাণ করেছে । দুর্যোধনের সুখ না থাকলেও তার ‘দুঃখের’ সম্পূরক স্থান দখল করে ‘জয়’ । ‘কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে’– তেমন জীবন দুর্যোধনের পছন্দ নয়, ‘হেমন্তের ভেকের মতো জড়ত্বের কূপে’ থাকতে দুর্যোধন চান না; ‘দূর্বাঘাস একে অপরের সাথে সহঅবস্থান করতে পারলেও দুই মহীরুহ নিজেদের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করে এবং চাঁদ-সূর্য একইসাথে আকাশে অবস্থান করতে পারে না’– এ সত্যকেও দুর্যোধন বোঝেন । লোকধর্ম ও রাজধর্ম যে এক কথা নয়, বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দুর্যোধন তা বোঝাতে চেয়েছেন । রাজনীতিতে কপটতা ও শঠতা গ্রাহ্য, এ কথা উপস্থাপন করতে গিয়ে দুর্যোধন বলেন– ‘যার যাহা বল, তাই তার যুদ্ধের সম্বল’; নিরস্ত্র বাঘকে যদি একজন মানুষ অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করতে পারে তবে দ্যূতক্রীড়ায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে দোষ কোথায়? দুর্যোধন নিন্দাকে ভয় করেন না, কারণ অব্যক্ত নিন্দা অর্থহীন; তিনি দুর্বলের প্রীতিও চান না, দুর্বলের প্রীতি পোষা বিড়াল

আর কুক্কুরের প্রাপ্য হলেও, দুর্যোধনের প্রাপ্য নয়। দুর্যোধনের যুক্তির প্রভাবে একজন পাঠক তার অবচেতনেই কৌরবকুলের সপক্ষে অবস্থান নেন এবং দুর্যোধনের অন্যায়কে ছায়ারূপে রেখে (under erasure) তার বীরত্বকে প্রাধান্য দেন। ধৃতরাষ্ট্রের বেলায়ও পাঠকের অনুভূতি বিনির্মিত। ধর্ম/অধর্ম-কে বোঝার পরেও ধৃতরাষ্ট্র ভালোবাসার কাছে পরাজিত, কারণ তিনি পিতা। একজন পিতার ভালোবাসাকেন্দ্রিক সামাজিক ও মানবিক উপলব্ধি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় বিচারকেও পাঠকের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে ন্যায়বিচার হিসেবেই উপস্থিত করতে চায়। পুত্রের প্রতি গান্ধারীর ঘৃণা আর দ্রৌপদীর প্রতি গান্ধারীর ভালোবাসা, ঈদিপাস-এষণার প্রচলিত রূপককে গ্রাহ্য করে না। ধৃতরাষ্ট্র/দুর্যোধন, গান্ধারী/দুর্যোধন আর গান্ধারী/দ্রৌপদীর সম্পূরক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যের বিনির্মিত উপলব্ধি, কৌরব পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যহীনতাকেও উপস্থাপন করে বিভিন্নভাবে। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্য-নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর গূঢ়োক্তি বা trope ব্যবহার করেছেন যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় ব্যাখ্যাযোগ্য হতে পারে আর এই বহুমাত্রিক উপস্থাপনার জন্যও কাব্যনাটকটির সাহিত্যমূল্য অসাধারণ।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঈশ্বর মানুষ এই যুগ্ম-বৈপরীত্যকে প্রচণ্ডভাবে বিনির্মাণ করেছেন, যেখানে 'আমি'-র অস্তিত্ব/অনস্তিত্বের পাশাপাশি ঈশ্বরের অস্তিত্ব/অনস্তিত্বও ছায়ারূপে অবস্থান নেয়। কবি তাঁর কবিতায় 'আমি' সত্তাকে স্থান দিয়েছেন ঈশ্বরের উপরে (সম্পূরক ও বিনিময়যোগ্যতাকে গ্রাহ্য করে, যদিও মানুষ ঈশ্বর নয়) এবং আমি কিংবা মানুষকে উপস্থিত করেছেন অসীম শক্তির ধারক হিসেবে। এ প্রসঙ্গে 'বিদ্রোহী'-র কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

বল বীর-
বল উন্নত মম শির।

....

বল   মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর।
মম   ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্তজয়শ্রীর!

....

আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর

....

আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম   এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্য;
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির

আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর ।
....
আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি ।
আমি উন্মাদ মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর ।
....
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিতচুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে-দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্ ।
আমি চিরশিশু, চির-কিশোর
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
....
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নিয়াদ্রি, বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
....
আমি শ্রাবণপ্লাবন বন্যা
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
....
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
....
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গ পাতাল মর্ত্য!
....
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির ।

কবিতাটির বিভিন্ন গূঢ়োক্তি বা trope বিশ্লেষণ করলে অহংসত্তার চরম ও পরম উপস্থিতিকে গ্রাহ্য/অগ্রাহ্য করা যায় । মনস্তাত্ত্বিক বিনির্মাণে, 'বিদ্রোহী' কবিতায় ইদিপাস-এষণাকে চিহ্নিত করা

সম্ভব, যেখানে জগৎ-পিতা ঈশ্বরের প্রতি একজন কবি-পুরুষ কিংবা অহং-এর ঈর্ষা প্রকাশ পেয়েছে চূড়ান্তভাবে এবং 'আমি'র মাঝে স্থান নিয়েছে 'রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর', 'ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য', 'বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর', 'কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি', 'ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম', 'চুম্বন-চোর কম্পন... প্রথম পরশ কুমারীর', 'কাঁকন চুড়ির কন্‌কন্', 'যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর', 'বসুধা বক্ষে আগ্নিয়াদ্রি', 'ছিন্নমস্তা চণ্ডী সর্বনাশী' ইত্যাদির মতো মাতা কিংবা নারীকেন্দ্রিক উপাদান। নারী ও পুরুষের বৈপরীত্য নিয়ে বিদ্রোহী কবিতার একটি বিনির্মিত বিপরীত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যায়। কবির নিজস্ব অবচেতনের 'নারী-রূপ আমি' এখানে প্রাধান্য পেয়ে চেতন 'পুরুষ-রূপ আমি'-কে অগ্রাহ্য করতে চায়। প্রতিটি মানবসত্তায় নারী ও পুরুষসত্তার সম্পূরক ও বিনিময়যোগ্য অবস্থান থাকে, এ কথা মেনে নিলে, কবিতার এই বিনির্মিত বিশ্লেষণ একটি নতুন ব্যঞ্জনাকেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে।

দেরিদার বিনির্মাণদর্শন অনুযায়ী যে-কোনো সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা অসীমের দিকে প্রবাহিত, যাকে text-এর free play বা মুক্ত ক্রীড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' নামক কবিতাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে অসীমের দিকে প্রবহমান ভাষা-দ্যোতনার উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করা সম্ভব। মৃত্যুর এগারো দিন আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ছিল!

প্রথম দিনের সূর্য
        প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে,–
        কে তুমি।
                মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
        দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি
        পেল না উত্তর॥

কবিতাটি অবশ্যই দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু অসাধারণ ব্যঞ্জনা ধারণ করে, পাঠকের অনুভূতিকে মুক্ত ক্রীড়া বা free play-র মাধ্যমে উপস্থিত করে বিভিন্ন মাত্রায়। কবিতাটি সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের ব্যাখ্যা– 'সত্তা নতুন আবির্ভাব-এর অন্তর্গত "সত্তা"' অস্তিত্বের পরিচয়বহ, আর উদ্‌গত কোনো এক নতুনতর খণ্ডের মাধ্যমে চিরপ্রবাহী অস্তিত্বের এই আবির্ভাবকে নিয়ে প্রথম দিনের সূর্যের প্রশ্ন। আবার নিজ অস্তিত্বের সূত্র ধরে এ জিজ্ঞাসা চলে যার সর্বময় সত্তা স্বভাবের প্রতি। তখন ব্যক্তিবিন্দু থেকে এই রহস্যোপলব্ধি আবার সরে যায় ব্যাপ্ত বহির্মুখে, কবিতাটি মুক্তি পেয়ে যায় বিশ্বতোমুখ জ্যোতির্ময়তার

মধ্যে। নিজের এবং নিজের বাইরে অস্তিত্বের যে সমজাল বিকীর্ণ আছে, তাকে ক্রমশই সরে যেতে দেখেছেন বিস্মিত অন্ধকারে, সেই অস্তিত্বের পরম শেষ পর্যন্ত রহস্যময় থেকে যাচ্ছে তাঁর কাছে, হয়তো সব কবির কাছেই থেকে যায় তাই। আধুনিক মন প্রবল সায় পায় এই কবিতায়, যে আধুনিক মন জানে সে নিজেই নিজের কাছে অন্তহীন রহস্য, আপনাকে এই জানা তার ফুরায় না। কবির অন্তিম সময়ে এক নতুন বিপন্নতার বোধ এখানে আরক্তিম হয়ে উঠেছে। নিরবধি "নীরব শূন্যতা আমারে কাঁপায়"– পাস্কালের এই ভীষণ নীরবতার চিহ্ন তাঁর মনকে এখন অধিকার করে নিতে চাইছে। অংশের উত্তর আছে পূর্ণের মধ্যে, এক মুহূর্তের জন্য যখন এ আশ্বাস অসম্পূর্ণ লেগেছে কবির কাছে তখনই জীবন-খণ্ড দাঁড়াতে পারল তার নিজের রহস্যে, নিজের প্রতিষ্ঠায়, নিজের মহিমান্বিত উত্তরহীনতার মাঝখানে।'

প্রজ্ঞাবান প্রাবন্ধিক আবু সায়ীদ আইয়ুবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী– 'কবিতাটির মূলে রয়েছে একটা প্রশ্ন "কে তুমি?" কী তুমি বা কেন তুমি নয়, কে তুমি? প্রশ্নটি সনাক্তের, আইডেনটিটির–এতগুলো লোকের মধ্যে কোন বিশেষ লোকটি তুমি, এমন কী পরিচয় আছে তোমার যাতে অন্য দশজনের মধ্যে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই চেনা যায়? এ প্রশ্ন ব্যক্তিবিশেষকেই; ব্যক্তিবিশেষকেই করা হয়েছে কবিতাটিতে। সে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টি বা স্রষ্টা বিষয়ে কোনো অজ্ঞাবাদ এখানে ব্যক্ত হয়নি, ব্যক্ত হয়েছে একজন ব্যক্তির অসম্পূর্ণ পরিচয়ের অসম্পূর্ণ আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠার বেদনা।'

দেরিদার বিনির্মাণদর্শনকে কেন্দ্র করে কবিতাটির কিছু নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। লেখকের ব্যাখ্যায়, প্রশ্নচিহ্নহীন সম্বলিত কবিতাটিকে দুটো পর্বে ভাগ করা সম্ভব, যার মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করে একটি কালকেন্দ্রিক বা temporal বাক্য– 'বৎসর বৎসর চলে গেল'। এ কথা ভাবা যেতে পারে যে, কবিতার উল্লেখিত দুটো পর্বকে কেন্দ্র করে অস্তিত্ব/ অনস্তিত্ব (being/nothingness) আর চেতন/অবচেতন (conscious/sub-conscious) যুগ্ম-বৈপরীত্যদ্বয়ই ক্রিয়াশীল। কবিতাটির প্রথম পর্বের প্রথম বাক্য 'প্রথম দিনের সূর্য' আর দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বাক্য 'দিবসের শেষ সূর্য' এক ও অভিন্ন সত্তা, এ কথা ভাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? কালকেন্দ্রিক মধ্যবাক্য (বৎসর বৎসর চলে গেল) দিয়ে বিভাজিত দুটো পৃথক সত্তাকেই কবিতায় উন্মোচিত করা হয়েছে যার মূলে রয়েছে অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব কিংবা চেতন/অবচেতনের দ্বন্দ্ব। প্রথম দিনের সূর্যরূপে কল্পিত অস্তিত্বশীল বা চেতনসত্তা তার বিপরীত সত্তাকে, অহং-স্বরূপ উদ্ধারের জন্য যে প্রশ্ন-চিহ্নহীন অতীন্দ্রিয় 'কে তুমি' প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, তার উত্তর মেলেনি। সমকেন্দ্রিক মধ্যপ্রবাহের ফলে এক সময় অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব বা চেতনা/অবচেতন যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণীমর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটে। এবার অনস্তিত্বশীল কিংবা অবচেতন সত্তা তার বিপরীত সত্তাকে আরও একটি প্রশ্ন-চিহ্নহীন 'কে তুমি' প্রশ্ন উত্থাপন করে, কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে কবিতার দুটো পর্বেই একই ধরনের প্রশ্ন-চিহ্নহীন প্রশ্ন থাকলেও উত্তর হিসেবে 'মেলে-নি উত্তর' আর 'পেল না উত্তর'-কে পাওয়া যায়। একই মাত্রায় প্রশ্নের বিপরীতে দুটো ভিন্ন মাত্রার প্রকাশ (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট), দুটো ভিন্ন সত্তার উপস্থিতি ও চরিত্রকেই চিহ্নিত করে। কবিতার বিনির্মিত ব্যাখ্যায় অনস্তিত্ব বা শূন্যতার প্রাধান্য লক্ষ করার বিষয়। সত্তার নতুন আবির্ভাবের উত্তরহীন কোলাহল পেরিয়ে 'পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়' যে বিপরীত সত্তা উত্তরহীন স্তব্ধতায় অবস্থান নেয়, সে 'নিস্তব্ধতা'

ও 'সন্ধ্যার' সাথে একাকার হয়ে শূন্যতা বা nothingness-কেই প্রকাশ করে, আর জীবনের সাথে শূন্যতা বা nothingness-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠভাবে। শঙ্খ ঘোষের 'অহং-রহস্য' কিংবা আবু সায়ীদ আইয়ুবের 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস' হয়তো-বা কবিতাটিতে অবস্থান করছে, তবে conscious/sub-conscious-এর বৃত্ত ছাড়িয়ে being আর nothingness-এর দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াই কবিতাটির মুখ্য উপাদান, এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়।

দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শনের উপাদান যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণী-মর্যাদার বিচ্যুতি ঘটিয়ে যে সাহিত্য-বিশ্লেষণ উপরে উপস্থাপন করা হল, তা কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আলোচিত সাহিত্যকর্মের প্রতিটি ভাষাচিহ্ন বা শব্দ এবং শব্দ-শৃঙ্খলের স্থানিক ও সমকেন্দ্রিক দ্যোতনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যকর্মগুলোর বিনির্মিত বিশ্লেষণ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, এ সত্যও দেরিদার পাঠ ও পঠনের মূল বিষয়।

অনুচিন্তন

বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-কাঠামো এখনো ত্রিশের দশকেই অবস্থান করছে, কারণ আমাদের দেশের সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকেরা আধুনিক সাহিত্য-দর্শনকে খুব একটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা জানতে পারি যে বাংলাদেশে একজন খ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞানী deconstruction-এর প্রয়োগ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন, 'দেরিদা দিয়ে কোনো কবিতার চার লাইনের বেশি ব্যাখ্যা করা আদৌ সম্ভব? 'সম্ভব/অসম্ভব' সম্পর্কীয় চূড়ান্ত মীমাংসা দেওয়ার যোগ্যতা লেখকের নেই, তবে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে আধুনিক সাহিত্যতাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনায় 'বর্তমান paradigm-গ্রাহ্য সাহিত্যগুণ' থাকবে না। আর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে শুধুমাত্র সাহিত্য-খোলস বিশ্লেষিত হবার পর চূড়ান্ত মন্তব্য হিসেবে উপস্থিত হবে একটি মুদ্রিত গ্রন্থের বাঁধাই, সেলাই ও মুদ্রণমানসম্পর্কীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ।

মিশেল ফুকো: জ্ঞান ও চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব

মিশেল ফুকো চিন্তা করেন এবং বলেন–

আমরা মানুষ, মানবিকতা মানুষের ধর্ম– এ ধরনের একটা আপাতমহৎ এবং স্বার্থপর দর্শনকে চিন্তা-চেতনায় রেখে আমরা চালু রেখেছি ক্ষমতার আয়োজন ও শোষণের সামাজিক প্রক্রিয়া। যদিও আমরা জানি, এ বিশ্বে অনেক অনেক কাল আগে থেকেই অবস্থান করছে প্রাণীরা, পশুরা, মাছেরা, বৃক্ষেরা, বস্তুরা এবং মানুষেরা, তবু এই অতি সাম্প্রতিককালেই আমরা আবিষ্কার করেছি মানুষকে, আর মানুষের ওপরে আরোপিত মানবত্ব আমাদের সাহায্য করছে যুক্তি/অযুক্তি, স্বাভাবিক/উন্মাদ, ক্ষমতা/অক্ষমতা ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলোর ইচ্ছেমতো ব্যবহারে। রেনেসাঁর পরবর্তী ক্লাসিকাল যুগ থেকেই আমরা অযথা নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছি যুক্তির আবর্তে এবং অযৌক্তিক উন্মাদকে নিক্ষেপ করেছি উন্মাদ আশ্রমে।

হঠাৎ করে হয়ে ওঠা এই মানুষ সৃষ্টি করেছে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী কিংবা সমাজসংস্কারক নামক কতক ক্ষমতালিপ্সু শ্রেণী এবং এখনো এই শ্রেণীগুলোই বিভিন্ন নামে ও নক্‌শায়, যুক্তি ও অযুক্তির সীমারেখা টেনে, শোষণ করছে সমাজকে। সত্যিকার স্বাধীন সত্তার মানুষকে বন্দী হতে হয়েছে কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধি-নিষেধের কারাগারে, যা যৌক্তিকভাবে তুলনীয় হতে পারে অযৌক্তিক সত্য-সত্তার জন্য সৃষ্ট উন্মাদ আশ্রম কিংবা প্যানঅপটিকান কারাগারের সাথে।

প্রকৃতির কিছু দ্বন্দ্ব ও ডায়ালেকটিকস্‌কে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে মানুষ সৃষ্টি করেছে মনোচিকিৎসার এক রূপকথার জগৎ, যার প্রেক্ষাপটে রয়েছে জ্ঞান ও ক্ষমতানির্ভর এক বিশেষ ক্ষমতাকাঠামো বা Power Structure। জ্ঞান ও ক্ষমতা যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে তথাকথিত যৌক্তিক মানবিক কর্মকাণ্ডে। জ্ঞান আর ক্ষমতার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত হয়েছে যৌনতা ও যৌন অনুষঙ্গ।

আজকের শিকড়হীন alienated মানুষের চিন্তার ইতিহাসও আসলে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিকতা নেই, জ্ঞানতত্ত্বেও নেই কোনো যুক্তির স্রোত। আসলে যা আছে তা হল চিন্তাশৃঙ্খলের কিছু বিচ্ছিন্ন জ্ঞানাণু বা এপিস্টেম আর ইতিহাসকেন্দ্রিক কিছু বিভিন্ন দেশ-কালচ্যুতির লক্ষণ। সময়ের সাথে এপিস্টেম বদলেছে বারবার আর জ্ঞানচর্চা বাধাগ্রস্ত হয়েছে ধারাহীন ইতিহাসের মানবত্ব আরোপণের (Onthropologisation) উদ্‌ভ্রান্ত প্রচেষ্টায়। জ্ঞানতত্ত্ব ও ইতিহাস সৃষ্টিতে মানুষের ভাষাও পালন করেছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। সামাজিক মৌখিক ভাষা (Speech Act) তার ক্রিয়া-কর্ম শেষে যখনই শুধুমাত্র উক্তি বা statement-এর রূপ নিয়েছে, ঠিক তখনই নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থসহ তৈরি করেছে নতুন এপিস্টেমের। মানুষ, মানুষের জ্ঞান আর ইতিহাস এগুচ্ছে এভাবেই।

মিশেল ফুকো তাঁর দর্শনে কিছু মৌলিক সমস্যাকে তুলে ধরলেও কোনো সমাধান দেননি। আর এ জন্য ফুকোর দর্শনকে অনেকে Nihilism বলে চিহ্নিত করতে চান। তবে বর্তমান সময়ের দর্শনে মিশেল ফুকোর চিন্তা-চেতনাকে বারবার আনতেই হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ফুকোর দর্শন কোনো পত্রিকার একটি পৃষ্ঠায় তুলে ধরা সম্ভব নয় (সে ধরনের জ্ঞান ও ভাষা লেখকের নেই)। পাঠক যদি মিশেল ফুকো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান তবে ফুকো রচিত Madness and Civilization; The Order of Things; An Archeology of Human Science; Archeology of Knowledge, Discipline and Punish; The Birth of Prison; History of Sexuality শিরোনামের বইগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

কার্ল পপারের 'বিশ্ব-৩' ও ভাষাদর্শন

মানুষের জন্ম হয় জ্ঞানী হবার জন্যই। এখানে 'জ্ঞানী' শব্দটির মর্মার্থ অবশ্যই 'পণ্ডিত' শব্দটির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। একজন মানুষ পণ্ডিত না-ও হতে পারে, কিন্তু পরিবেশ ও বিশ্ব থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ গ্রহণ-বর্জন করে সে জ্ঞানী হয়ে ওঠে তার নিজস্ব সত্তার তাগিদেই। প্রতিটি মানুষ যেহেতু তার 'নিজস্বতা' নিয়ে মৌলিক, সেহেতু 'জ্ঞানী' হয়ে ওঠার মাত্রাও নির্ধারিত হয় তার 'চেতনার আহ্বান' আর তার 'পরিবেশ-পৃথিবী'কে কেন্দ্র করে। মানবিক 'চেতনার আহ্বান' আর 'পরিবেশ-পৃথিবী' সব সময় ঘড়ি বা সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এ কারণে মানুষের জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়াকে আগামীর দিকে প্রবহমান ক্রিয়া হিসেবেই চিহ্নিত করা সম্ভব, যে ক্রিয়ার উদ্দেশ্যই হল জীবন ও জগৎ বিষয়ক বিভিন্ন অজানা সত্যকে বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যের মাধ্যমে মানবিক জ্ঞানে ইন্দ্রিয়তরঙ্গ-কাঠামোতে সংশ্লেষণ করা। হাইডেগারীয় দর্শন অনুযায়ী বিশ্বের 'অজানা কিন্তু উপস্থিত' সত্যকে 'হস্তগত-তৈরি' সত্য হিসেবে ধারণ করার অর্থই হল জ্ঞান, এ কথা বলা যায়। জ্ঞানতত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত এই 'উপস্থিত' আর 'অন্তর্গত' সত্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে গেলে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দার্শনিক কার্ল পপারের 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পকে উপস্থাপন করতে হয়। কার্ল পপারের এই দর্শন, জ্ঞানতত্ত্বের জটিল প্রশ্নসমূহের বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু সহজ উত্তর উপস্থিত করতে পারে, এমন ভাবা যায়।

মানবিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবহমান ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড প্রতিদিনই আমাদের উপস্থিত করছে নিত্য-নতুন সৃষ্টি আর আবিষ্কারের সম্মুখে এবং এই সৃষ্টি আর আবিষ্কার, যা উপস্থিত– কিন্তু-অজানা-বিশ্ব-সত্যের 'উন্মোচন কিংবা হস্তগত' হওয়ার বিষয়কে বোঝায়, তা জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ চিত্ররূপকে বিন্যস্ত করছে নিত্যনতুন মাত্রায়।

আমরা যদি মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাব, বিভিন্ন সময়ে কিছু অসাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিপ্লব (যার সাথে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড ও জড়িয়ে আছে) আমাদের চেতনাকাঠামো বা প্যারাডাইমে গ্রাহ্য বিশ্ব-চিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙচুর করে নতুন বিন্যাসে পুনঃনির্মাণ করেছে, আর নবনির্মাণের এই বৈপ্লবিক মুহূর্তগুলো মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে নতুন চিন্তার উপাদান, সৃষ্টি করছে নতুন বিশ্ব ও জীবনদর্শনের। নতুন চিন্তা ও দর্শনের প্রভাবে মানবিক জ্ঞানের স্তর বিন্যস্ত হয়েছে একটি নতুন কাঠামোকে কেন্দ্র করে এবং নতুনভাবে বিন্যস্ত মানবিক জ্ঞান-কাঠামোই নিজেকে প্রকাশের তাগিদে সৃষ্টি করেছে নতুন কবিতা, নতুন শিল্প, এমনকি সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাষা কিংবা ভাষা সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা।

দার্শনিক কার্ল পপার বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জ্ঞানতত্ত্বসম্পর্কীয় তাঁর নতুন দর্শন উপস্থিত করেন। জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল মানবিক চেতনাকাঠামো, ভাষাব্যবস্থা আর ভৌত জ্ঞানতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পপার মানবিক জ্ঞানকে তিনটি মৌলিক স্তরে বিভক্ত করতে চান, যা একজন মানুষের জীবন ও বিশ্ব-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে। কার্ল পপারের দর্শনের উল্লেখিত মানবিক জ্ঞানের স্তরগুলো নিম্নরূপঃ

বিশ্ব-১: বিশ্বজগৎ, জীবন ও প্রকৃতির ভৌতরূপ।

বিশ্ব-২: বিশ্ব, জীবন ও প্রকৃতির ভৌত বাস্তবতাকে গ্রাহ্য করে মানবিক চেতনায় উপস্থিত জ্ঞানের মৌলিক স্তরসমূহ।

বিশ্ব-৩: বিশ্বজগৎ, জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন যৌক্তিক ও গাণিতিক সত্য, তত্ত্ব, সূত্র, সমস্যা, সমস্যাসমূহের স্তর বিন্যাস, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি যা ভাষা-মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পুস্তক, সাময়িকী ও পাঠাগারসমূহে অবস্থান করছে।

জ্ঞানের মৌলিক স্তর হিসেবে কার্ল পপারের 'বিশ্ব-৩' প্রকল্প বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। কারণ, মানবিক চেতনার বাইরেও যে জ্ঞানের মৌলিক স্তর অবস্থান করতে পারে, এ সত্যকে কার্ল পপারের দর্শন-চিন্তার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি প্রথমবারের মতো। পপারের 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পের সাথে প্লাতোর Theory of Forms or Ideas, হেগেলের Theory of Objective Spirits এবং বোলজানের তত্ত্ব- Truth in Themselves and Ideas in Themselves-এর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও পপারের এ প্রকল্পটিকে একটি মৌলিক, নতুন ও স্বাধীন দর্শন-সত্য হিসেবে গ্রাহ্য করা যায়। পপার তাঁর 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পে দোকার্ত, লক, বার্কলে, হিউম, কান্ট ও রাসেলের বিষয়কেন্দ্রিক বিশ্বাসের দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, কেবলমাত্র বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো সমস্যার যৌক্তিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য সবসময়ই কিছু আলোচনা-সমালোচনার অবতারণা করতে হয় এবং সমালোচনাফলের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেই আমরা কোনো একটি বিষয়কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হিসেবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব কিংবা প্রকল্প উপস্থাপন করতে পারি।

'বিশ্ব-৩' প্রকল্পে পপার নিজেকে একজন বাস্তববাদী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন– মানবিক চেতনা-জগৎ প্রতিমুহূর্তে ভৌতজগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে জগৎ ও জীবনসম্পর্কীয় 'চিন্তা-উপলব্ধি' নির্ধারণ করলেও, 'বিশ্ব-৩' অবস্থান করে একটা তাত্ত্বিক সংগঠন হিসেবেই। 'বিশ্ব-৩'-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে অবস্থান নেয় বিভিন্ন স্তরের জাগতিক সমস্যা ও সমস্যার সমাধান, যা প্রচলিত ভাষার যুক্তিকে গ্রাহ্য করে ভাষাচিহ্ন বা শব্দের শৃঙ্খলে, লিপিবদ্ধ হয় বিভিন্ন পুস্তক ও সাময়িকীতে এবং এইসব লিপিবদ্ধ 'বিশ্ব-৩' সমস্যা ও সমাধান পরবর্তী পর্যায়ে সংরক্ষিত হয় কোনো পাঠাগারে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'বিশ্ব-৩'-এ লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহ একজন মানুষের 'বিশ্ব-২' অবস্থানকে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন মাত্রায় বিন্যস্ত করতে পারে এবং এর ফলে মানুষের কাছে 'বিশ্ব-১'-এর উপস্থিতিও নতুন মাত্রায়, নতুন অর্থে, নতুন অনুভূতিতে প্রকাশ পায়।

কার্ল পপারের 'বিশ্ব-৩' সবসময় সার্বভৌম ও স্বাধীন। 'বিশ্ব-১' কিংবা 'বিশ্ব-২'-এর সাথে কোনো রকম সম্পর্ক স্থাপন না-করেই 'বিশ্ব-৩' তার নিজস্ব সত্তা ও সংগঠনকে সংরক্ষণ করতে পারে। 'বিশ্ব-৩'-এর এই সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করার জন্য পপার দুটো কাল্পনিক পরিস্থিতিকে তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করছেন। উদাহরণগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

উদাহরণ ১

এই পরিস্থিতিতে কল্পনা করা হবে যে, বর্তমানের বিশ্ব থেকে সব ধরনের কারখানা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করা হয়েছে এবং মানুষও ভুলে গেছে কিভাবে কারখানা চালাতে হয়, ব্যবহার করতে হয় যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি। কিন্তু 'বিশ্ব-৩'-এর জগতে অবস্থানকারী বইপত্র, লাইব্রেরি, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি যেমন থাকার কথা ঠিক তেমনই আছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে দেখা যাবে যে অল্প কিছুদিনের জন্য মানুষের সভ্যতা থমকে দাঁড়িয়েছে, এগুতে পারছে না। এমন একটা স্তব্ধ অবস্থা কিন্তু খুব বেশিদিন থাকতে পারে না। এক সময় দেখা যাবে, পাঠাগারে সংরক্ষিত (বিভিন্ন পুস্তক ও সাময়িকীতে অন্তর্ভুক্ত) 'বিশ্ব-৩'-ই মানুষকে আবার নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই।

উদাহরণ ২

এ অবস্থায়, এমন কল্পনা করা হবে, যখন বর্তমান বিশ্বের সব ধরনের কারখানা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদির সাথে সব ধরনের বইপত্র, পাঠাগার এবং পাঠাগারযোগ্য সবকিছুই ধ্বংস করা হয়েছে এবং মানুষও ভুলে গেছে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য। এমন পরিস্থিতিতে পুস্তক, সাময়িকী কিংবা পাঠাগারকেন্দ্রিক 'বিশ্ব-৩'-এর কোনো অস্তিত্ব না থাকার কারণে মানুষ নতুনভাবে তার বর্তমান সভ্যতায় ফিরে আসতে পারবে না এবং তার জ্ঞান-কাঠামো ফিরে যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

উপরোক্ত উদাহরণ দুটো বিশ্লেষণ করলে কার্ল পপারের 'বিশ্ব-৩' যে সার্বভৌম ও স্বাধীন, এ সত্য নিশ্চয়তাসহ প্রমাণিত হয়। মানবিক চেতনায় অবস্থানকারী 'বিশ্ব-২' ও স্বাধীন-সার্বভৌম 'বিশ্ব-৩'-এর মাঝে বিদ্যমান সময়কেন্দ্রিক সম্পর্কও প্রযুক্ত উদাহরণগুলো থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব। এ

কথা আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে ভৌত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্তে সময়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন থেকেই সময় একরৈখিক চরিত্র ধারণ করে শুধুমাত্র আগামীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। সময় যে শুধুমাত্র আগামীর দিকেই যায়, এ বিশ্বাস বা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জন্ম-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এবং এ ধারণার পেছনে কাজ করছে এক ধরনের অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধি। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান আর সভ্যতাকেন্দ্রিক সময় নিয়ে চিন্তা করি, তবে দেখা যাবে 'বিশ্ব-৩'-এর অস্তিত্বকে ধ্বংস করে বর্তমান সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরিয়ে নেওয়া বাস্তবেই সম্ভব। কার্ল পপারের দেওয়া উদাহরণ দুটো বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায়, 'বিশ্ব-২' এবং 'বিশ্ব-৩'-এর সময় উভয়তোমুখী এবং মানুষের জৈবিক উত্তরণ ও বিবর্তনের ধারা 'বিশ্ব-১'-এর বিষয়বস্তু হিসেবে একরৈখিক আগামীকেন্দ্রিক সময়প্রবাহকে গ্রাহ্য করলেও, 'বিশ্ব-৩'-এর প্রভাবে একে বিপরীতমুখী করা সম্ভব।

কার্ল পপার তাঁর 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী সনাতন জ্ঞানবিদ্যায় অহংসত্তার প্রভাব এত প্রবল যে, কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভের সময় 'আমি জানি' আর 'আমি চিন্তা করি'– এই বাক্যযুগলই আবর্তিত হয়েছে বারবার। সক্রেটিস-উত্তর দার্শনিকেরা 'আমি'কে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ এবং অহংসত্তার 'জানা-না জানা' আর 'চিন্তা করা-না করার' বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্বে অহংসত্তার প্রভাব প্রবল থাকার ফলে জ্ঞানবিষয়ক দর্শনচর্চায় চলে এসেছে বিভিন্ন অনাবশ্যক বিষয়। এমনকি শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার সময় এমন অনেক বিষয়কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়েছে, যা আদৌ বিজ্ঞানের বিষয়ই নয়। পপারের মতে বিজ্ঞানের সূত্র, প্রকল্প, তত্ত্ব বা গণিত হল এমন এক ধরনের জ্ঞান, যা 'আমি জানি' কিংবা 'আমি চিন্তা করি' এই বাক্যযুগল দিয়ে ধারণ কিংবা প্রকাশ করা যায় না। 'আমি জানি' এবং 'আমি চিন্তা করি'– এই বাক্য বা ধারণাযুগল শুধুমাত্র মানবিক চেতনা কিংবা 'বিশ্ব-২'-এর মন্ময় প্রকাশকে উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব, আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবস্থান হল 'বিশ্ব-৩'-এর তাত্ত্বিক বাস্তবতায়। জ্ঞানতত্ত্বসম্পর্কীয় পপারের এই বিশ্লেষণ দেকার্ত, লক, বার্কলে, হিউম রাসেল ও অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকের ধ্রুপদী চিন্তাকাঠামো ও দর্শনকে সত্যিকারার্থে এক অযৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং নতুনভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় জ্ঞানের প্রকৃত রূপ ও স্বরূপকে কেন্দ্র করে। পপার জ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ধ্রুপদী দর্শন ও তত্ত্বকে অস্বীকার করে বলেন, প্রকাশযোগ্য জ্ঞানের অন্তর্গত-উপাদান হল:

১. মানবিক চেতনার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফসল হিসেবে উপস্থিত মন্ময় জ্ঞান, যা 'বিশ্ব-২'-এর বিষয়।

১. বিভিন্ন সূত্র, প্রকল্প, সমস্যা, সমস্যার স্তর নিয়ে গঠিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যা 'বিশ্ব-৩'-এর অন্তর্ভুক্ত।

‘বিশ্ব-৩’-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কারো ‘জানা-না জানা’ কিংবা ‘বিশ্বাসের’ ওপর নির্ভরশীল নয় এবং এর ফলে ‘বিশ্ব-৩’ বা ‘বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে Knowledge without a knower কিংবা Knowledge without a knowing subject হিসেবে গণ্য করা যায়।

‘বিশ্ব-৩’ প্রকল্পে কার্ল পপার মানুষের প্রচলিত ভাষাব্যবস্থাকেও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রচলিত জাগতিক যুক্তির ভাষা দিয়ে ‘বিশ্ব-২’ এর মন্ময় এবং ‘বিশ্ব-৩’-এর বিষয়ী সত্যকে একই মাত্রায় প্রকাশ করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিষয়টি পপার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন কতগুলো একই মাত্রার ‘বিশ্ব-২’ ও ‘বিশ্ব-৩’ বাক্য উপস্থাপন করে।

বিশ্ব-২ বাক্যাবলি

ক. আমি জানি ও বিশ্বাস করি যে, এই প্রকল্প জ্ঞানচর্চায় মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

খ. আমি জানি ফারমেটের শেষ উপপাদ্য এখন পর্যন্ত সমাধান করা যায়নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, একদিন না একদিন এর সমাধান পাওয়া যাবে।
অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী জ্ঞান শব্দের অর্থ হল কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা বা জ্ঞাত হওয়া।

প্রাগুক্ত বাক্যগুলোকে যদি ‘বিশ্ব-৩’-এর ভাষাতে লেখা হয় তবে তা হবে নিম্নরূপ:

বিশ্ব-৩ বাক্যাবলি

ক. আমি প্রত্যয়ন করছি যে এই প্রকল্প জ্ঞানচর্চায় মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

খ. এই সময়ের গণিতবিদ্যা পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে যে ফারমেটের শেষ উপপাদ্য এখন পর্যন্ত হয়তো-বা সমাধানযোগ্য নয়।

গ. অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী জ্ঞান শব্দের অর্থ হল শিক্ষাগ্রহণের একরকম প্রক্রিয়া; বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ‘বিশ্ব-২’ ও ‘বিশ্ব-৩’-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় একই মাত্রায় একই অর্থে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকল্প, সূত্র ও তত্ত্ব প্রকাশ করার সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রে ‘বিশ্ব-২’-এর ভাষা ব্যবহার করি, যা ‘বিশ্ব-৩’ সম্পর্কীয় বিষয় শুদ্ধমাত্রায় সত্যমূল্যসহ প্রকাশ করতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রচলিত ‘বিশ্ব-২’-কেন্দ্রিক ভাষার এই সীমাবদ্ধতাকে আমরা আরও প্রকটভাবে উপলব্ধি করছি। আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, হাইজেনবার্গ, নীল বোর, শ্রোয়েডিংগার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কর্তৃক আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতত্ত্ব, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রাবলি ও অনিশ্চয়তাবাদসহ এমন কিছু ‘বিশ্ব-৩’ সূত্র ও সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে যা প্রচলিত ‘বিশ্ব-২’ কেন্দ্রিক ভাষাব্যবস্থায়

শুদ্ধভাবে প্রকাশ করা আসলেই সম্ভব নয়। কোয়ান্টামতত্ত্বের বিষয়গুলো যেহেতু শুধুমাত্র কোয়ান্টাম বিশ্বেরই ঘটনা, সেহেতু এ-ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করতে গেলে 'বিশ্ব-৩' কাঠামোর অন্তর্গত একটা কোয়ান্টাম ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা এসে যায়। কারণ, সনাতন 'বিশ্ব-২' ভাষাকাঠামো দিয়ে কোয়ান্টাম বিশ্বকে বোঝাতে গেলে প্রকাশিত তথ্য 'যা সত্য নয় সেই সত্য'কেই উপস্থিত করতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানসূত্রাবলি গ্রাহ্য করে 'বিশ্ব-২' ভাষায় আমরা যদি বলি 'আলোই কণা, আলোই তরঙ্গ', কিংবা 'সময় প্রসারিত হয়, সংকুচিত হয়', তবে বাক্যগুলো কবিতার মতো ব্যঞ্জনা দিতে পারে। অথচ 'বিশ্ব-৩' ভাষাকে গ্রাহ্য করলে আলো সম্পর্কে বলব– যে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আলো তরঙ্গ, তখন আলো কণা নয় এবং যে পরীক্ষা করে আলোর কণারূপ ধরা পড়ে, তখন আলো তরঙ্গ নয়।' সময় সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আপেক্ষিকতত্ত্বের সূত্র বোঝানোর পরই 'প্রসারণ' 'সংকোচন' সম্পর্কে কথা বলা উচিত। 'বিশ্ব-২' ভাষার এই সীমাবদ্ধতাকে কার্ল পপারসহ এই সময়ের অনেক বিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিক বুঝতে পেরেছেন। বিজ্ঞানী নীল বোর ও হাইজেনবার্গ প্রচলিত ভাষার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে বলেন– 'কোয়ান্টাম বিশ্বের বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য কোয়ান্টাম ভাষাতত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে।' ভাষাতত্ত্ববিদ জাক দেরিদা প্রচলিত 'বিশ্ব-2' ভাষার পিচ্ছিল রূপ ও স্বরূপকে সনাক্ত করে ভাষার মুক্তক্রীড়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন, যেখানে একটি একক ভাষাচিহ্ন দেশ ও কালকে গ্রাহ্য করে অস্তিত্ব/ অনস্তিত্ব-কেন্দ্রিক অসীম দ্যোতনা উপস্থিত করে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিক পল দ্য মান প্রচলিত ভাষার চরিত্র গ্রাহ্য করে বলেছেন– 'Reading is always necessarily misreading'। 'বিশ্ব-৩' বিষয় সম্পর্কে যেহেতু 'misread' বা 'ভুলভাবে পড়া'র কোনো অবকাশ নেই, সেহেতু বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপার 'বিশ্ব-৩'-কে প্রকাশ করা যায় এমন একটি ভাষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তা করেন।

'বিশ্ব-৩'-এর বিষয় ও অনুভূতিকে কোন কারণে 'বিশ্ব-২' ভাষাকাঠামো দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, কার্ল পপার তা নির্ধারণ করেছেন। পপারের মতে একটি ভাষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল:

১. অহংসত্তাকে প্রকাশ করা

২. চিন্তার আদান-প্রদান করা

৩. কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া

৪. কোনো বিষয় বা ঘটনার পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা

কিন্তু ধ্রুপদী দর্শনের প্রবক্তরা ভাষার উদ্দেশ্য হিসেবে 'অহংসত্তাকে প্রকাশ' এবং 'চিহ্ন আদান-প্রদান' ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যদিও ভাষার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল কোনো বিষয় ও সমস্যা-সম্পর্কীয় বিবরণ প্রদান করা এবং প্রয়োজনবোধে বিবরণের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা। অহংসত্তার প্রকাশ ও চিহ্ন আদান-প্রদান ক্রিয়ার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

করার ফলে প্রচলিত যুক্তির ভাষা শুধুমাত্র ভাবপ্রকাশ ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে, যা পপারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, কোনো বিষয় বা সমস্যার যৌক্তিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেওয়াই হল ভাষার মূল উদ্দেশ্য এবং ভাষার এই যুক্তি ও বিবরণ দেওয়ার ক্ষমতাই প্রকৃত সত্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে। 'বিশ্ব-৩'-এর অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো বিষয়ের প্রকৃত সত্যরূপ ও বিবরণ পাওয়ার জন্য অহং-বহির্ভূত একটি বিষয়কেন্দ্রিক বিবরণ 'উপস্থাপনযোগ্য' ভাষাব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন, যা 'বিশ্ব-৩' বিষয় ও ঘটনাসমূহ উপস্থাপন করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মানুষ যেহেতু জৈবিকভাবে যুক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু মানবিক চেতনার জগতেই 'বিশ্ব-৩'-এর ভাষাকে তার নিজস্ব প্রকাশের তাগিদেই তৈরি করে নেবে– এ সত্যকেও কার্ল পপার স্বীকার করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রচলিত ভাষার মৌলিক যুক্তিকাঠামো ভাষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন সময় নতুন বিন্যাসে উপস্থিত করে নতুন তাৎপর্য দেয় এবং এ কারণে কার্ল পপার মনে করেন যে, কোনো এক সময় আমাদের প্রচলিত ভাষা বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে 'বিশ্ব-৩' প্রকাশযোগ্য ভাষা হিসেবে উপস্থিত হবে। ভাষার বিবর্তনে মানবিক যুক্তি প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকে এবং এই যুক্তির প্রবাহকে নিম্নোক্ত সূত্রে দেখানো সম্ভব:

$$P^1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P^2$$

যেখানে,

P^1= Initial problem

P^2= New Problem

TT= Tentative Theory

EE = Error Elemination

পপারের দেওয়া প্রাগুক্ত সূত্রে কোনো একটি প্রাথমিক সমস্যা (P1) একটি সাময়িক তত্ত্ব (TT) সৃষ্টি করে, এক সময় ভুল সংবর্ধনের মাধ্যমে (EE) একটি নতুন সমস্যা (P2) সৃষ্টি করে এবং নতুন সমস্যা পুনরায় সংশোধন হবার আগ পর্যন্ত সাময়িক তত্ত্ব হিসেবে ভাষাব্যবস্থায় থাকে উপস্থিত। 'বিশ্ব-৩' কে কেন্দ্র করে ভাষার এই যৌক্তিক বিবর্তন সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে। কোনো এক সময় আমরা 'বিশ্ব-৩'-এর জগৎকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার পর আমাদের চেতনায় অবস্থিত 'বিশ্ব-২' জগৎকেও নতুনভাবে বুঝতে পারব এবং 'বিশ্ব-১'-এর রূপ ও স্বরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত হবে সত্যমূল্যসহ গাণিতিক বিশ্বাস হিসেবে। আমরা মুক্তি পাব অধিবিদ্যাজাত সমস্ত উপলব্ধি অনুভূতির মিথ্যা কারুকাজ থেকে, এ রকম চিন্তা করা অযৌক্তিক নয়।

পূর্বকথা

বিংশ শতাব্দীর চিন্তা-চেতনায় সিগমুক্ত ফ্রয়েড ও জাক লাকাঁ-র দর্শন বিশেষভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে, কারণ একজন মানুষের 'মন' নামক মেটাফিজিক্যাল অস্তিত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এর আগে কোনো দার্শনিক বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেননি। ধ্রুপদী দর্শনের মানুষের 'মন' নামক ধারণা কিংবা concept-কে একটি স্থিতিশীল বিষয় হিসেবেই গ্রাহ্য করা হয়েছিল এবং মনের সাথে ভালো/মন্দ, সত্য/মিথ্যা, ঈশ্বর/মানুষ ইত্যাদির মতো কিছু যুগ্মবৈপরীত্যের ধ্রুব অবস্থানই দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় উপস্থাপিত হয়েছে বারবার। মানুষের মনের সচেতন প্রক্রিয়া নির্ণয়, তার রূপ ও স্বরূপ নির্ধারণ এবং সচেতন প্রক্রিয়াগুলোর মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ-ই প্রাধান্য পেয়েছিল ফ্রয়েড-পূর্ববর্তী মনোবিদ ও দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনার মাঝে। আর এ কারণেই ফ্রয়েড যখন মনের নির্জ্ঞান স্তরের বিভিন্ন উপাদান, যেমন অবদমিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ, গূঢ়ৈষা (complex) ইত্যাদির কথা চেতন-জগতের কাছে প্রকাশ করলেন, তখন তা চিন্তার বিপ্লব হিসেবেই নব্য-মনোবিদ্যার (New Psychology) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে উপস্থাপিত হয়েছিল আলফ্রেড এ্যাডলার, কার্ল যুঙ ও জাক লাকাঁর মতবাদ এবং এঁদের মাঝে জাক লাঁকার দর্শন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনকে আলোড়িত করেছিল বিশেষভাবে।

জাক লাকাঁর দর্শনের ভিত্তি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই বিস্তার লাভ করে, এমন ভাবা যায়। তবে ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের স্ট্রাকচারালিস্ট নৃতত্ত্বের চিন্তা-চেতনাও যে জাক লাকাঁর দর্শনে প্রভাব ফেলেছিল–এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। লাকাঁর দর্শনের মূল বিষয় ছিল মানবিক চেতনার অস্তিত্ববাদী সমস্যাগুলোকে নির্ধারণ করে তার চরিত্র উদ্ধার করা এবং এ কারণেই লাকাঁ সবসময় 'ফ্রয়েডীয় চিন্তায়' ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। ফ্রয়েড ছাড়া লাকাঁর দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, আর এ জন্যই লাকাঁ উপস্থাপনের আগে ফ্রয়েড সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া সব সময়ই প্রয়োজন।

ফ্রয়েডের মতবাদ

মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদ্ধতি আর মানুষের মনের গঠন ও স্বরূপ সম্পর্কে প্রস্তাবিত কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রকল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ফ্রয়েডীয় মতবাদ। এ মতবাদে মানবিক মনের কোনো স্থিতিশীল অবস্থান নেই, এবং শুধুমাত্র জ্ঞানকে কেন্দ্র করে মনের বিস্তারও লাভ করে না। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মন প্রচণ্ডভাবে গতিশীল বা Dynamic এবং তা প্রধানত সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ, গূঢ়ৈষা, অবদমন ইত্যাদির মতো কিছু ইচ্ছামূলক (Conative) ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৈশ্বিক বাস্তবতায় অবস্থানরত মানুষ সব সময় তার চিন্তাকে

অভ্যন্তরীণ বিরোধ (conflict) আর বাধার (resistance) সম্মুখে রাখে এবং এর ফলে চিন্তার কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ নেই। অভ্যন্তরীণ বিরোধ আর বাধার অবস্থান হল মানবিক মনের নির্জ্ঞান স্তরে এবং বিরোধ ও বাধার মূলে অবস্থান করে লজ্জা, দুঃখ, ভয় ইত্যাদির মতো অনুভূতি-সংবেদ, যার উৎস হল মানুষের যৌন-অতৃপ্তি-জাত অবদমিত ইচ্ছা ও কামনা। পরিবেশ কিংবা সমাজের বাস্তবতায় যখন একজন মানুষ তার যৌন-কেন্দ্রিক ইচ্ছার বাস্তব রূপ দেখতে পায় না, তখন সে তার অবদমিত ইচ্ছার পূর্ণতা আনতে চায় স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নের উপাদান হিসেবে অবস্থান করে অবদমিত ইচ্ছায় ব্যক্ত রূপ (manifest content) আর অব্যক্ত রূপ (Latent content), এবং একটি স্বপ্নের ব্যক্ত রূপে যে প্রতীকের সৃষ্টি হয় তা অব্যক্ত অংশের অর্থ নির্ধারণ করে। ফ্রয়েড মনের নির্জ্ঞান স্তরের বিশ্লেষণ করার জন্য স্বপ্নকে ব্যবহার করেছেন এবং স্বপ্ন-সম্পর্কীয় মতবাদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Interpretation of Dreams-এ প্রকাশিত হয়েছে।

ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে মানুষের মনের সচেতন (conscious), অবচেতন (pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious) অবস্থার কথা উপস্থাপন করেন (যা কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণযোগ্য নয়) এবং বলেন যে সচেতন মনে অবস্থান করে ধারণা, ইচ্ছা ইত্যাদির মতো ভাষামাধ্যমে প্রকাশযোগ্য সুস্পষ্ট বিষয় এবং অবচেতনে অবস্থান করে স্মৃতিতে গ্রন্থিত বিষয়সমূহ, যাকে প্রয়োজনমতো সচেতন স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব। নির্জ্ঞান স্তর হল অবদমিত কামনা-বাসনার নিবাস। সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তির কামজ ইচ্ছায় প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত, এমন সব বিষয় অবদমিত সুপ্ত অবস্থায় নির্জ্ঞান স্তরে অবস্থান নিয়ে স্বপ্ন, মানসিক বিকার ইত্যাদির মতো বাহ্যিক প্রকাশে বাস্তবতায় ঘুরেফিরে আসে। ফ্রয়েডের মতে সচেতন ও অবচেতন মনের স্তর নিয়েই তৈরি হয় ব্যক্তির ইগো (Ego) এবং এই 'ইগো'ই বাস্তবতার সূত্র বা reality principle গ্রাহ্য করে নির্জ্ঞান স্তরের কামজ ইচ্ছাকে সামাজিক বাস্তবতায় আসতে দেয় না। অর্থাৎ একজন মানুষ সব সময় নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং সে চায় না যে তার কামজ ইচ্ছা অবদমনমুক্ত হোক, অগ্রাহ্য করুক সামাজিক নিয়মের শৃঙ্খলকে। ফ্রয়েডের সংশোধিত মতবাদে ইগোর আংশিক সচেতন ও আংশিক নির্জ্ঞান রূপকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। আংশিক সচেতন ইগো-কে ইগো হিসেবে চিহ্নিত করে, নির্জ্ঞান ইগো'কে ফ্রয়েড বলেন অদ (Id)। অদ সব সময় সুখসূত্র বা Pleasure Principle অনুসরণ করে এবং এর ফলে প্রবৃত্তি, তাড়না ইত্যাদি হল অদ-এর প্রকাশিত রূপ। কিন্তু ইচ্ছে করলেই অদ তার সুখসূত্রকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে না, কারণ ইগো reality principle বা বাস্তবতার সূত্র গ্রাহ্য করে অদে-র কামনা, বাসনা ইত্যাদিকে সমাজের নৈতিক আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকাশ করতে দেয়, আর অদের যে ইচ্ছা সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাকে চালান দিয়ে দেয় অবদমিত নির্জ্ঞান স্তরে। ইগোর যে অংশ reality principle গ্রাহ্য করে হয়ে ওঠে নৈতিক সমালোচক, তাকে ফ্রয়েড Super-ego বা অতি-অহং বলে নির্ধারণ করেন।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব যৌন-আকাঙ্ক্ষা (Libido), অবদমন (Repression) আর শৈশবকালীন যৌনতা (Infantile sexuality) নিয়ে সংগঠিত। মানুষের আত্মরক্ষামূলক কার্য হল

অহংবৃত্তি বা ego-tendency এবং বংশরক্ষামূলক কার্য হল কামপ্রবৃত্তি বা Libido। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে Libido অর্থ যৌন-আকাঙ্ক্ষা এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে সব ধরনের ভালোবাসা, প্রেম, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি উপস্থিত। লিবিডোর সময়কেন্দ্রিক স্তরে একজন মানুষ বিভিন্নভাবে তার কামভাব প্রকাশ করে। একটি শিশু সবসময়ই আত্মকামী, কারণ সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না এবং এ অবস্থাতে সে হয়ে যায় নার্সিসাস, আর শিশুর আত্মকামকে ফ্রয়েড বলেন Narcissism। বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটি বালক যখন তার বন্ধু অন্য একটি বালকের ভালোবাসা চায়, তখন জন্ম নেয় অন্য এক ধরনের লিবিডো, যাকে বলা হয় henosexuality এবং পরবর্তী পর্যায়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানব কিংবা মানবী heterosexual লিবিডোর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কামপ্রবৃত্তি বা Libido-র আরও কয়েকটি রূপের বর্ণনা করেছেন ফ্রয়েড, যার মাঝে ইদিপাস এষণা (Edipus Complex), ইলেক্ট্রা এষণা (Electra Complex), মর্ষকাম (Masochism), ধর্ষকাম (Sadism), জীবনবৃত্তি (Eros) এবং মরণবৃত্তি (Death instinct/thenatos) উল্লেখযোগ্য।

একটি পুরুষ শিশু তার অস্তিত্বকে গ্রাহ্য করে বিপরীত লিঙ্গের মাতার প্রতি যে যৌন-আকর্ষণ অনুভব করে এবং একই সাথে সমলিঙ্গের পিতাকে ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যে ঈর্ষা বা ঘৃণা পোষণ করে, তাকে ফ্রয়েড ইদিপাস এষণা বলে চিহ্নিত করেন। ইদিপাস এষণার বিপরীত রূপ হচ্ছে স্ত্রী-শিশুর পিতার প্রতি যৌন আকর্ষণ এবং মাতাকে ঘৃণা বা ঈর্ষা করা, যাকে ফ্রয়েড বলেন ইলেক্ট্রা এষণা। মর্ষকাম হচ্ছে ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রী দ্বারা নিগৃহীত হয়ে যৌনসুখ লাভ করা, আর ধর্ষকাম হচ্ছে ভালোবাসার পাত্র কিংবা পাত্রীকে নিপীড়ন করে যৌনসুখ উপভোগ করা। বর্তমান দেশ-কালে গ্রাহ্য নৈতিকতায় মর্ষকাম ও ধর্ষকামকে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও, ইদিপাস এষণা আর ইলেক্ট্রা এষণা সবার চেতনা-কাঠামোতে গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়।

ফ্রয়েডির মতবাদে একজন নারী সবসময় লিঙ্গহীনতার কারণে এক ধরনের হীনমন্যতায় (penis envy) ভোগে। একটি পুরুষ শিশু যখন একটি স্ত্রী-শিশুকে দেখে এবং বুঝতে পারে স্ত্রী-লিঙ্গের লিঙ্গ নেই, তখন তার মনেও লিঙ্গ হারানোর ভয় ঢুকে যায়। এ রকম অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেন, যে প্রতিটি পুরুষের মাঝে অবস্থান করে লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি (castration fear) এবং প্রতিটি নারীর মাঝে অবস্থান নেয় লিঙ্গহীনতাজনিত হীনমন্যতার। লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি আর লিঙ্গহীনতাজনিত হীনমন্যতার কারণে ইদিপাস ও ইলেক্ট্রা এষণা মানুষের মনে প্রচণ্ডভাবে কাজ করে– এরকম একটা চিন্তা-চেতনাই আমরা ফ্রয়েডের দর্শন থেকে পাই।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফ্রয়েড তার দর্শনে কাম-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, বিশেষ করে তাঁর নির্জ্ঞান মনের রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ, যৌন অনুভূতি আর যৌন-অবদমনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত এবং এ কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ফ্রয়েড সমালোচিতও হয়েছেন।

জাক লাকাঁর দর্শন

জাক লাকাঁ তার দর্শনে মানবিক চেতনার অস্তিত্ববাদী সমস্যাগুলো আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং নির্ধারণ করতে চেয়েছেন অস্তিত্বের রূপ ও স্বরূপকে। মানুষের অস্তিত্বের সাথে যেহেতু 'মন' নামক একটি ধারণা সবসময় জড়িত, সেহেতু অস্তিত্বের সমস্যা নির্ধারণের জন্য লাকাঁকে বারবার ফ্রয়েডের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তবে, এটাও সত্য যে লাকাঁ ফ্রয়েডের অনেক যুক্তিহীন বক্তব্যের মাঝে যুক্তি স্থাপন করেছেন সফলভাবে।

জাক লাকাঁ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আয়না-পর্ব' উপস্থাপনের মাধ্যমে আমি বা ব্যক্তিসত্তার বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে দেকার্তের দর্শনে ব্যক্ত 'cogito ergo sum' বা 'আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি', এ ধরনের প্রকাশ সরাসরি গ্রাহ্য নয়। লাকাঁর কজিতো বা আমি শুধুমাত্র চিন্তা দ্বারাই সত্তায়িত হয় না, বরং এই আমিত্ব লাভের পেছনে কাজ করে জন্ম-পরবর্তী দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা। একটি শিশু জন্মের পর এক অসহায় অবস্থায় থেকে শুধুমাত্র নিজেই নিজেকে চিনতে পারে সম্পূর্ণভাবে এবং তার চারপাশে অবস্থানকারী সমগ্রের সাথে একাত্ম হয়ে তৈরি করে নেয় এক প্রতীকী 'আমি'-কে। জন্মের পর 'আয়না পর্বে'র একটি 'শিশু-আমি' যে পূর্ণতাসহ নিজস্ব প্রতিবিম্বকে দেখতে পায়, তাকে লাকাঁ ইমাগো (imago) নামে আখ্যায়িত করেন এবং এই ইমাগো'র মাঝেই অবস্থান নেয় এক কাল্পনিক আমি-সত্তা, যার সামাজিক চরিত্র তখনো নির্ধারিত হয়নি। আয়না-পর্বের এই 'আমি' এক অসহায় অবস্থায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, উৎকণ্ঠা আর ক্লান্তিকে নিয়েই দেখতে পায় 'নিজস্ব পূর্ণপ্রতিচ্ছবিকে' এবং এ পর্বেই অসহায়তা, মানসিক ভগ্নাংশতা আর অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় মানবিক বিচ্ছিন্নতা বা alienation-এর। আয়না-পর্বে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে একটি মানুষ ইহজীবনে আর কখনোই মুক্তি পায় না এবং এ কারণে লাকাঁ বলেন কজিতো-নির্ভর মানবিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা বাস্তবে অসম্ভব।

ফ্রয়েড কথিত শিশুর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ইত্যাদি নির্ভর আত্মকাম বা Narcissism লাকাঁর দর্শনেও গ্রাহ্য, তবে লাকাঁ এই আত্মকামের বিস্তার বাড়াতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, একটি শিশুর আত্মকাম শুধুমাত্র শৈশবের বিষয় নয়, আত্মকাম মানুষের সমস্ত জীবনের উপাদান হয়েই– 'জীবন-সত্তায়' অবস্থান করে। জন্মের পর একটি শিশু তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও পরিবেশের সাথে যে আন্তর্ব্যক্তিক এবং আন্তবৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই ক্রিয়া ও কর্মের মাঝে আত্মকামের উপাদানও থেকে যায় সত্তাবোধের কারণেই। লাকাঁ শিশুর প্রাথমিক আত্মকামের সাথে আক্রমণ-প্রবৃত্তি এবং মরণ-প্রবৃত্তির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। বাস্তবতার সূত্র (Reality principle) আর সুখসূত্রের (Pleasure principle) উপাদান হিসেবেই আক্রমণ আর মরণ-প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে উপস্থিত এবং এ প্রবৃত্তিগুলোর শুরু হয় আয়না-পর্ব থেকেই। একটি শিশু যখন তার একান্ত নিজস্ব প্রতিবিম্বের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য দেখে, ঠিক তখনই সৃষ্টি হয় এক ধরনের সংঘর্ষশীল উত্তেজনার এবং অন্যের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি একটি শিশুর বাসনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় আদিম প্রতিযোগিতার। এই আদিম প্রতিযোগিতাই পরবর্তী জীবনে মানুষের সত্তায় অবস্থান করে আক্রমণ-প্রবৃত্তি হিসেবে। মৃত্যুকাম বা মরণ-প্রবৃত্তির শুরু হয় একটি শিশুর জরায়ুতে ফিরে যাওয়ার উগ্র বাসনা থেকে। জন্মের পর হঠাৎ করেই একটি শিশু বিশ্ব-জগতের প্রতিকূল পরিবেশ অবস্থান নিয়ে

ভাবতে থাকে– আহা! জরায়ুর ঐ নরম-গরম সুখের পরিবেশই আমার জন্য সুখকর ছিল, এই অপরিচিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর সংগ্রামের জগৎ আমার জন্য নয়। এই জরায়ুতে ফিরে যাওয়ার উগ্র বাসনাই পরবর্তীকালে মৃত্যুকাম হিসেবে মানবিক চেতনায় অবস্থান নেয়। মৃত্যুকাম বা মরণ-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লাকাঁ শিশুর স্তন্যপান বন্ধকালীন মানসিক সংকটকে (weaning complex) উপস্থিত করেছেন। যে শিশু এ সংকটকে এড়াতে পারে না, তার মনে মৃত্যুকামের অংশ হিসেবে এক ধরনের উৎকণ্ঠা সব সময়ই অবস্থান করে এবং তা অবস্থান নেয় উত্তরকালের অবচেতনে। এখানে উল্লেখ্য যে মৃত্যুকামের জন্যেই একজন মানুষ নিজের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত হতে পারে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে, বাসনার অতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে এবং জগৎ-জীবনের ক্ষুধাকে অস্বীকার করে তুলে নিতে পারে মৃত্যুর সুখ।

জাক লাকাঁ ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভাষাকেন্দ্রিক রূপক ও প্রতীকের সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর এই তত্ত্ব বহুলাংশে ফ্রয়েডীয় অবচেতন, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব আর ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের নৃতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সস্যুর বর্ণিত দ্যোতক (signifier) শূন্যতাসহ অবস্থান করলেও দ্যোতিত (signified) হবার পর অর্থ যোগান দেয়। যেমন– গাছ শব্দটির বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে কোনো গাছের অবস্থান থাকে না, বরং এই ভাষাচিহ্নটি দ্যোতক হিসেবে অবস্থান করে এবং দ্যোতিত হয়ে একটি গাছের অর্থ কিংবা চিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। মানুষের অবচেতনে/ নির্জ্ঞান স্তরে যে অবদমিত ইচ্ছা বা বাসনা অবস্থান করে সেগুলো শূন্য-অর্থসহ দ্যোতকের ভূমিকা নিতে পারে এবং দ্যোতিত হয়ে সৃষ্টি করতে কিছু অর্থ/ অনর্থকেন্দ্রিক রূপকের। লাকাঁ রূপকের সৃষ্টির পেছনে অবদমিত ইচ্ছার (ভাষা-মাধ্যমে) বারবার ফিরে আসার ঘটনাকে উন্মোচন করতে চান। একজন কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী কিংবা একজন সাধারণ মানুষও তার অবদমিত কামনা-বাসনার বিপরীতে কিছু রূপকের সৃষ্টি করতে পারে এবং তা উপস্থাপন করতে পারে ভাষামাধ্যমে। লাকাঁর মতবাদ গ্রহণ করলে, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে একজন মানুষ বাস করে প্রতীকী শৃঙ্খলার জগতে এবং এই প্রতীকী-শৃঙ্খলা মূলত ভাষাসৃষ্ট।

লাকাঁ বলেন– মানুষের চেতনা সংগঠিত হয় কল্পনা, প্রতীক আর সত্যের সমন্বয়ে। তার এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানসিক রোগীর চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে, যেখানে ভাষাকেন্দ্রিক মনোচিকিৎসাই হল একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। আমাদের পরিচিত বিশ্বে একমাত্র মানুষের ভাষা আছে এবং এ কারণে মানুষই হচ্ছে একমাত্র চেতনাযুক্ত প্রাণী (এখানে উল্লেখ্য যে মানুষ নিজেই মানুষের ওপর চৈতন্যের উপাদান আরোপন করেছে)। চেতনাযুক্ত মানুষের অবচেতনে বেড়ে ওঠা কোনো অবদমিত ইচ্ছাকে উদ্ধার করা কিংবা কোনো মানসিক বিপর্যয়কে (trauma) আবিষ্কার করার একমাত্র পথই হচ্ছে ভাষা-মাধ্যমে কথোপকথন চালিয়ে অবচেতনের দ্যোতককে অর্থবোধক করে দ্যোতিত করা। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, অবচেতনকে তখনই চেতনে আনা সম্ভব যখন অবচেতনের প্রতীকী রূপকে সমাজের গ্রাহ্য ভাষা-ব্যবস্থা-কাঠামোতে তুলে আনা সম্ভব। অবচেতন ও ভাষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার পর লাকাঁ বলেন যে, অবচেতন ভাষার আকারে গঠিত কিংবা

অবচেতনের কোনো ভাষাহীন অস্তিত্ব নেই। অবচেতন ও ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লাকাঁ, মার্টিন হাইডেগার-এর দর্শনের দ্বারস্থ হন এবং মৌলিক সত্তা (Dasein) সৃষ্ট ধ্বনি 'Rede' এবং সমগ্র-সত্তার (The they) বাচাল উচ্চারণ 'Gerede'-কে উপস্থিত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে ভাষার মৌলিক চিহ্ন-তাত্ত্বিক পদ্ধতি মৌলিক সত্তার অধীন হলেও, প্রতিদিন আমরা সমগ্র-সত্তার প্রতীকী শৃঙ্খলার সাথেই যুক্ত রাখি আমাদের।

মানুষ ও সমাজের মাঝে যে সম্পর্ক, তা ভাষা মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত এবং এ কারণেই জন্মের পর থেকে ভাষা-মাধ্যমেই সমাজের নিয়ম ও কানুন আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে অবদমন হিসেবে অবচেতনে অবস্থান নেয়। যে এই ভাষাসৃষ্ট অবদমনকে মেনে নিতে পারে না, সে-ই হয় মানসিক রোগী। লাকাঁ ভাষাসৃষ্ট প্রতীকের সামাজিক ব্যবহারের বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে বিভিন্ন মন্ত্র, ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন বাক্যের উচ্চারণ ইত্যাদি মানুষের অবচেতনে প্রচণ্ডভাবে কাজ করে। এরকম ঘটনার প্রেক্ষাপটে কাজ করে মানুষের অবচেতনে রক্ষিত ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন, যা মন এবং শরীরকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। কোনো এক পীর সাহেবের দোয়া কিংবা এক ওঝার মন্ত্র, রূপক হিসেবেই, একটি মানুষের অবচেতনে রক্ষিত দ্যোতককে দ্যোতিত করতে পারে এবং এমন অবস্থা মনঃসমীক্ষণের বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

মানুষের ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের নিয়ম-কানুন জন্মের পূর্ব থেকেই নির্ধারিত এবং একটি নিয়ন্ত্রিত ভাষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদান হিসেবেই বিশ্ব-জগতে মানুষ হঠাৎ করেই উপস্থিত। এমন একটা পূর্বনির্ধারিত অবস্থাকে গ্রাহ্য করে লাকাঁ বলেন– Man speaks therefore, but it is because the symbol has made him man'। ভাষাসৃষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ভাষামাধ্যমেই মানুষকে বন্দি করে সামাজিকতায়। ফ্রয়েড বর্ণিত ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা, লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি, লিঙ্গহীনতা-জনিত হীনমন্যতা ইত্যাদি ভাষামাধ্যমেই মানুষের মনে চূড়ান্তভাবে অবস্থান নেয়। আত্মীয়-সম্ভোগকে কেন্দ্র করে যে ওহপবংঃ ঃধনড়ড় আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করেছে (ভাষা মাধ্যমে) তার সাথে চেতন সত্তার কোনো বিরোধ না থাকলেও অবচেতনের অবস্থা থাকে বিপরীত মেরুতে। লাকাঁ আত্মীয়তার নামকরণ বা kinship nomination-কে incest taboo-র ঐতিহাসিক বিবর্তিত রূপ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। বাবা, মা, খালা, খালু, বোন, ভাই– এ ধরনের নামকরণের অর্থ-ই হল একজন ব্যক্তি-একককে বুঝিয়ে দেওয়া, কার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা যাবে এবং কে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে লাকাঁর মন্তব্যঃ For without kinship nomination, no power is capable of instituting the order of preferences and taboos which bind and weave the yarn of lineage through succeeding generations.

সমাজ ও সভ্যতাকেন্দ্রিক আইনের দাবিতে মানুষের যে যৌন-অবদমন হল, তার প্রেক্ষাপট কাজ করে পিতা ও পরিবারকেন্দ্রিক ভাষা-সৃষ্ট কিছু প্রতীকী শৃঙ্খলা এবং এ প্রতীকী শৃঙ্খলার মাধ্যমেই আমরা স্বীকার করে নেই পিতার প্রভুত্বকে। এ বিষয়ে লাকাঁ বলেনঃ It is in the name of the fathers that we must recognize the support of the symbolic function which from the down of history, has identified his person with the figure of the law'। পিতার প্রভুত্ব আর পারিবারিক

নিয়ম-কানুনকে কেন্দ্র করে যে ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা ইত্যাদি মানুষের মনে কাজ করে তাকে লাকাঁ ভাষা-সৃষ্ট প্রতীকী শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবেই গ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে পিতার প্রভুত্ব ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম, কাব্য, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি মানুষকে বন্দি করে রেখেছে এবং এই বন্দিত্ব দশা থেকে মুক্তি পাওয়াও বাস্তবে অসম্ভব।

জাক লাকাঁ মানুষের জীবনে প্রকৃত সত্য কী, তা-ও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণের পর তিনি মৃত্যুকামকেই প্রকৃত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেন। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার যে-কোনো মৌলিক বিশুদ্ধ সত্তাকেই 'Sein-zum-tode' বা 'মৃত্যুর দিকে ধাবমান' সত্তা হিসেবে দেখেন এবং মৃত্যুকে মৌলিক সত্তার শেষ ও পরিপূর্ণ অবস্থা হিসেবে গ্রাহ্য করেন। লাকাঁর দর্শনে truth বা সত্য যে রূপে আবির্ভূত তা হাইডেগারের দর্শনেও পাওয়া যায়।

লাকাঁ তাঁর দর্শনে বর্জন বা foreclosure-কে অবদমনের পাশাপাশি অবস্থান দিয়েছেন, যদিও অবদমন ও বর্জন দুই মেরুতে অবস্থান করে। একটি মানুষ যে সব বিষয় বর্জন করতে পারে না অথচ বর্জন করার প্রয়োজন বোধ করে, সেগুলোকে অবদমন হিসেবে নির্জ্ঞান স্তরে রেখে দেয়। লাকাঁ মনে করেন, যে বিষয় একবার বর্জন করা হয়েছে, সে বিষয়ের চিহ্ন অবচেতন কিংবা নির্জ্ঞান স্তরে আবশ্যিকভাবেই থেকে যায় এবং জীবনের কোনো এক সময়ে বর্জিত বিষয়ের রূপ ও স্বরূপ প্রতীক কিংবা রূপক হিসেবে মানুষের চেতন স্তরে প্রকাশিত হতে পারে। বিষয়টিকে বর্জিত অনুষঙ্গের ক্রিয়া-কর্মরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব।

ফ্রয়েড মানুষের জীবনে লিঙ্গের অবস্থানকে কামনা-বাসনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে উপস্থিত করেছেন। লাকাঁর দর্শনে উপস্থিত লিঙ্গ কিন্তু রক্ত-মাংসের পুরুষাঙ্গ কিংবা ভগাঙ্কুর নয়: লিঙ্গের অবস্থান এখানে একটা প্রতীক কিংবা concept হিসেবেই বিবেচিত। লিঙ্গ-কেন্দ্রিক এই প্রতীক ভাষা-মাধ্যমে বস্তু কিংবা বিষয়ের ওপর লিঙ্গের তাৎপর্য স্থাপন করে এবং এর ফলেই বস্তু ও বিষয়ের মাঝে আমরা 'একটি পুরুষ' কিংবা 'একটি নারীকে' খুঁজে পাই। ভাষা-মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন উপলব্ধি সংবেদ তাই কখনো (হয়তো-বা) লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়। লিঙ্গকেন্দ্রিক লাকাঁর এই মতবাদ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। দার্শনিক জ্যাক দেরিদা লাকাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে লৈঙ্গিক-অর্থকেন্দ্রিকতার (phallogocentrism) অভিযোগ এনেছিলেন।

ফ্রয়েড, লাকাঁ ও সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শন

ফ্রয়েড বা লাকাঁর মতবাদ কোনো গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। তবে এই মতবাদগুলোর সত্যমূল্য বর্তমান সময়ে গ্রাহ্য বিজ্ঞান-দর্শনের যৌক্তিক সূত্র, প্রকল্প ও গণিতকে মেনে নিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব এবং এ বিষয়ে লেখকের মূল্যায়ন নিম্নরূপ।

ফ্রয়েডের মতবাদ মানুষের মনের Fantasy-র অন্তর্ভুক্ত বিষয়– এ কথা মেনে নিলেও আমাদেরকেই আবার বলতে হবে Fantasy হল ফ্রয়েডীয় অবদমনের বিষয়। এ প্রসঙ্গে The Myth of Analysis গ্রন্থের লেখক জেমস্ হিলম্যান-এর একটি বক্তব্য তুলে ধরা যাক। তিনি বলেছেন– The theory of the human body is always a part of world picture. The theory of the

human body is always a part of a fantasy। হিলম্যান-এর বক্তব্য থেকে যদি ভধহঃধং শব্দটি বাদ দেই, আর বর্তমান বিজ্ঞান-দর্শন গ্রাহ্য ড়িৎষফ ঢ়রপঃঁৎব-কে যদি আলোনায় আনি, তবে নারী ও পুরুষের চিত্র কেমন হবে? কেমন হবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলার আগে জাক মেনোদের (Chance and Necessity, Random House, New York, 1972, p. 110-11) কিছু বক্তব্য তুলে ধরা যাক। তিনি বলেছেন- 'The entire system is totally, intensely conservative, locked into itself, utterly impervious to any 'hints' from the outside world. Through its properties, by the miroscopic clockwork function that establishes between DNA and protein, as between organism and medium an entirely one-way relationship, this system obviously defies any 'dialectical' description. it is not Hegelian at all, but thoroughly Cartesian: the cell is indeed a machine'। মোনোদের বক্তব্য ছিল জৈবিক জীবন-বস্তু সম্পর্কে এবং এ বক্তব্য অনুসরণ করে নারী ও পুরুষের চিত্র হবে জৈব-মেশিনের ধারণাকে কেন্দ্র করে। মানুষকে বাস্তবে আমরা দু'ভাগে ভাগ করব, বলব 'নারী-মেশিন মানুষ' ও 'পুরুষ-মেশিন মানুষ'। বিষয়টি যদি খুবই যান্ত্রিক হয়ে যায় তবুও এরকম বর্ণনা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না যৌক্তিক কারণেই।

হোমো সেপিয়েনস্ প্রজন্মের অন্তর্গত 'নারী-মেশিন' ও 'পুরুষ-মেশিন'-এর জৈবিক সংগঠনে নিম্নতম কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থানকারী কতগুলো জড় পরমানুর উপস্থিতিই লক্ষ করা যায় এবং ক্রোমোজমের অন্তর্গত DNA-এর কোয়ান্টাম নক্শাই নারী ও পুরুষের চরিত্র ও গুণাবলি নির্ধারণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, XX এবং XY ক্রোমোজম নারী ও পুরুষ সত্তা নির্বাচনের মূল চাবিকাঠি এবং মানুষ নামক জৈব যন্ত্রের মাঝে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান সৃষ্টির একমাত্র উপাদান। XX এবং XY ক্রোমোজমের অন্তস্থ কোয়ান্টাম নক্শা নারীকে নারীত্ব আর পুরুষকে পুরুষত্ব উপহার দেয় বিভিন্ন স্বানালী ও অনালী গ্রন্থির হরমোন রস ক্ষরণের মাধ্যমে। একটি পুরুষের লিঙ্গ এবং নারীর যোনি, আর লিঙ্গ ও যোনির সম্পূরক অন্যান্য দেহ-সংস্থাপনের সৃষ্টি হয় এক পূর্বনির্ধারিত কোয়ান্টাম নক্শার প্রভাবে, এ সত্যকে আজ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জন্মের পর জগৎ ও পরিবেশের কণা-তরঙ্গ শক্তি আর চিত্ররূপ একজন নারী কিংবা পুরুষ শিশুর মাঝে একই মাত্রার এবং একই রকম উপলব্ধি-সংবেদ উপস্থিত করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতি কিংবা পরিবেশ শিশুটির নারীত্ব কিংবা পুরুষত্বের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

ফ্রয়েড বর্ণিত 'আত্মকামী শিশু' আর লাকাঁ বর্ণিত 'আয়না-পর্বের শিশু'র মাঝে ভয়, উৎকণ্ঠা আর অসহায়ত্ব-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয় বাস্তবতাসহ, তা ক্রোমোজমের অন্তর্গত সহজাত ধারণার সাথে বিশ্ব ও সমগ্রের ধারণা হঠাৎ করে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়। এমন একটি অবস্থায় একটি শিশুর পূর্বনির্ধারিত নক্শার 'আমি', প্রকৃতি ও পরিবেশের বিভিন্ন 'আমিত্ব'কে গ্রাস করতে চায় এবং হয়ে উঠতে চায় 'যৌগ আমি', কিন্তু সে হারিয়ে ফেলে তার মৌলিক 'আমিত্ব'কে। 'মৌলিক আমি' হারানো সত্তা সব-সময় একাকিত্ব আর বিচ্ছিন্নতাবোধসহই এই বিশ্বে অবস্থান করে। আত্মকামী কিংবা আয়না-পর্বের শিশুর বিবর্তনও হয় চেতনা-কাঠামো আর দেশ-কালকে গ্রাহ্য করে। বাংলাদেশের একটি শিশু আর আমেরিকার একটি শিশুর বিবর্তন কিংবা বস্তিবাসী একটি

শিশু আর আমেরিকার একটি শিশুর বিবর্তন কিংবা বস্তিবাসী একটি শিশু আর ধনাঢ্য এলাকায় বসবাসকারী একটি শিশুর বিবর্তন একই মাত্রায় হবে এমন ভাবাও সঠিক নয়। জন্মের পর একটি নারী কিংবা পুরুষ-শিশুর সত্তায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য যে কামজ উপাদান থাকে তা তার ক্রোমোজমবাহিত সহজাত প্রবৃত্তি, বিশ্ব কিংবা পরিবেশ তাকে এ বিষয়ে নতুন কিছু দিতে পারে না। তবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য কামজ উপাদানের পার্থক্য দেশ-কালকে গ্রাহ্য করে বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে।

ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা, লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি আর লিঙ্গহীনতাভিত্তিক হীনমন্যতার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই এবং এ ধরনের প্রকল্প fantasy-র অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। একটি নারী-শিশু কিংবা বালিকা যদি সত্যি সত্যি ভাবতে পারে যে তার লিঙ্গ নেই কেন, তবে যৌক্তিকভাবেই বলা উচিত, একটি পুরুষ-শিশু কিংবা বালকও চিন্তা করে তার লিঙ্গ আছে কেন! বাস্তবে কিন্তু এমন কিছু ঘটে না। ক্রোমোজমের অন্তর্গত কোয়ান্টাম নক্‌শাই ফেনমেনা বা চেতনচিত্র হিসেবে নারীত্ব কিংবা পুরুষত্ব সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় এবং উপাদানকে মানুষের চেতনায় সত্যমূল্যসহ উপস্থিত করে দেয়। কোনো সত্তাই যেহেতু বিপরীত সত্তা ছাড়া অসম্পূর্ণ, সেহেতু নারী কিংবা পুরুষের বিপরীত শারীরিক ও মানসিক রূপ ও স্বরূপ মানুষের মনে পূর্ণতার অনুভূতি নিয়েই উপস্থিত থাকে। লিঙ্গ আছে আর তার বিপরীতে অবস্থান করেছে যোনি, এমন একটা যুগ্ম-বৈপরীত্য নিয়েই মানুষ নিজেকে সত্তায়িত করতে চায়। বৈপরীত্য ছাড়া যে-কোনো সত্তাই শুধুমাত্র শূন্যতার অংশ।

ম'ার সাথে পুরুষ কিংবা কন্যাসন্তানের প্রাথমিক সম্পর্ক ক্ষুধা ও উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করেই স্থাপিত হয়। স্তন্যদাত্রী মা একটি শিশুর কাছে জরায়ুর বিকল্প হিসেবে উপস্থিত এবং এ বিষয়টি ক্রোমোজমে অঙ্কিত সহজাত প্রবৃত্তির অংশ হিসেবেই মানুষের জীবনে গ্রাহ্য। জন্মের পর একটি শিশুর মুখ আর মা'র স্তনের বোঁটার সম্পর্ক যে সহজাত প্রবৃত্তির অংশ তা শিশুর ক্ষুধাকেন্দ্রিক উৎকণ্ঠার প্রকাশ থেকেই বোঝা যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাবা, মা, কন্যাসন্তান ও পুরুষসন্তানের সম্পর্ক ক্রোমোজমে অঙ্কিত পুরুষ সত্তা আর নারী সত্তার উপাদানসহ প্রকাশ পায় এবং বিপরীত সত্তার প্রতি যে মানুষের সহজাত আকর্ষণ আছে তার প্রকাশ পায় শরীরের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন এনজাইম আর হরমোনের লিঙ্গ-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের ফলে। এখানে উল্লেখ্য যে আদিম গুহাকেন্দ্রিক, ক্ষুদ্র পারিবারিক সংগঠনের বাবার প্রতি পুরুষ-সন্তানের যে ঈর্ষা বা ঘৃণা কাজ করত যৌনসম্পর্ককে কেন্দ্র করে, তা সহজাত প্রবৃত্তির অংশ হলেও, একথাও সত্য যে ইতিহাসের কোনো উপাদানই ক্রোমোজমের কোয়ান্টাম নক্‌শায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। ক্রোমোজমের অভ্যন্তরে অঙ্কিত সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্তন শুধু মাত্র দেশ-কাল-কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা সংগঠিত হয় এবং এ বিষয়টি ডারউইনের তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত। বর্তমান দেশ-কালে যেহেতু পরিবার কোনো এক ক্ষুদ্র গুহাকেন্দ্রিক সংগঠন নয় এবং সহজাত যৌন-প্রবৃত্তিকে পিতার হস্তক্ষেপ ছাড়াই শান্ত করা সম্ভব, সেহেতু মানুষের জীবনে ইদিপাস গূঢ়ৈষা এখন আদৌ কাজ করে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। (তবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের যে সহজাত আকর্ষণ, যা ক্রোমোজমের অভ্যন্তরীণ নকশা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) তা মাতা/পুত্র এবং পিতা/কন্যা-কেন্দ্রিক যুগ্ম-

বৈপরীত্যের সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য এবং এ রকম সম্পর্কের মাঝে সহজাত যৌন প্রবৃত্তির উপাদান অবশ্যই থাকতে পারে।

ফ্রয়েড মানুষের মন নামক ধারণা কিংবা concept-কে শুধুমাত্র যৌন কর্মকাণ্ড দ্বারা উপস্থাপন করতে চেয়েছেন (মানুষের যেন অন্য কোনো কাজ নেই)। আসলে ফ্রয়েড যাকে নির্জ্ঞান স্তর বলতে চান তা হল মানুষের ক্রোমোজমের কোয়ান্টাম নক্‌শায় অঙ্কিত সহজাত প্রবৃত্তির রূপ ও স্বরূপ, যাকে হঠাৎ করে আমরা আমাদের বাস্তবতায় আনতে পারি না মানবত্ব আরোপিত বিভিন্ন নিয়ম কানুনের ফলে (এ প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোর দর্শন গ্রাহ্য করা যায়)। নির্জ্ঞান স্তর যেহেতু ক্রোমোজম অঙ্কিত কোয়ান্টাম নক্‌শা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু এ স্তরে মানুষের ভাষাচিহ্ন কিংবা ভাষাচিহ্নসৃষ্ট অর্থ কাজ করে না। নির্জ্ঞান স্তরের অনেক কর্মকাণ্ডের রূপ ও স্বরূপ মানুষের ভাষামাধ্যমে উপস্থাপনযোগ্য না হওয়ার কারণেই মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন রূপক, প্রতীক আর Grede বা বাচাল বক্তব্যকে উপস্থিত করে।

মানবিক মনের চেতন স্তর, বর্তমান এবং যা ঘটছে, এইসব বিষয় ও ঘটনা দ্বারা সংগঠিত। জন্ম-পরবর্তী সময়ে সমগ্রের ‘ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-রূপ’ শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ ও যৌন অনুভূতিসহ মস্তিষ্কের নিওরোন-শৃঙ্খলে কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে চেতন-সত্তার। চেতনা কোনো সময়ই ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ নয় এবং চেতনার চেতনাপ্রাপ্তি হয় ভাষার মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য যে সস্যুর কথিত দ্যোতক (signifier) এবং দ্যোতিত (signified) ভাষাব্যবস্থার অর্ন্তগত উপাদান হলেও, মানব-মস্তিষ্কে দ্যোতক ও দ্যোতনার মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্থাপন/ প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ/ বিশ্লেষণ ও গ্রহণ/ বর্জন বিশেষভাবে কাজ করে (এ প্রসঙ্গে লেখক রচিত ‘সমস্যা, সমস্যার সমাধান ও ভাষাদর্শন’ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, যা এই বই-এ গ্রন্থিত হয়েছে)। একটি মানুষ যখন ভাষাচিহ্ন সৃষ্ট কোনো বিষয় ও ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং তা যদি মস্তিষ্কে পূর্ব অঙ্কিত-গ্রন্থিত ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্রের সাথে সংশ্লেষণ/ বিশ্লেষণযোগ্য না হয় কিংবা স্থাপন/ প্রতিস্থাপনযোগ্য না হয় কিংবা গ্রহণ/ বর্জনযোগ্য না হয়, তবে তা সৃষ্টি করে কিছু রূপক ও প্রতীকের এবং ভাষাসৃষ্ট এ ধরনের রূপক ও প্রতীক স্থান নেয় মস্তিষ্কের অবচেতন স্তরের নিওরোন শৃঙ্খলে। এখানে উল্লেখ্য যে মনের চেতন স্তর সব সময় বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত এবং সংরক্ষণ করে বর্তমানের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু অতীতকে। যে অতীত বর্তমানের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এবং মানুষ যে অতীতকে ভুলে যেতে চায় সে অতীতের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-রূপ স্থান পায় অবচেতনের নিওরোন শৃঙ্খলে, যা লাকাঁ বর্ণিত Foreclosure এবং ফ্রয়েডের ‘অবদমনের’ সমার্থক। মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় ক্রোমোজমের অন্তস্থ ভাষাহীন সহজাত প্রবৃত্তি, সুপ্ত ভাষাচিহ্নের অবচেতন আর ভাষাগ্রাহ্য চেতন সত্তার সংঘর্ষের কারণে। যে মানুষ তার ক্রোমোজমে অঙ্কিত সহজাত প্রবৃত্তি, অবচেতনের সুপ্ত ভাষা-অর্থ আর চেতন-সত্তার ভাষাকে একই মাত্রায় গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা যুক্তি দ্বারা একই অবস্থানে আনতে পারে না, সেই হয় রোগী। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে ভাষার যে প্রয়োগ করা হয় তাকে অবচেতনে রক্ষিত সুপ্ত ভাষাচিহ্নের পুনঃউদ্ধার ক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একটি মানুষ, যে অতীতকে বর্জন করেছে, তার বর্তমান চেতনায় সহজ-সত্য হিসেবে ভুলে যাওয়া অতীতকে পুনঃস্থাপন করা গেলেই মানসিক রোগ সেরে যায়। কিন্তু যে মানসিক রোগ ক্রোমোজমের কোয়ান্টাম নক্‌শার ভাঙ্গনের ফলে নির্জ্ঞান স্তরে সৃষ্টি

হয়, তাকে ভাষাচিহ্ন প্রয়োগের মাধ্যমে সুস্থ করা যায় না। এমন রোগীর জন্য প্রয়োজন এমিট্রিপটিলিন, সেরোটোনিন-জাতীয় ঔষধ কিংবা ইলেকট্রিক শকের।

মানুষের সমাজে পিতার যে প্রভুত্ব আমরা দেখতে পাই, তার কারণ অবশ্যই মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিক নয়। পিতা কিংবা পুরুষের প্রভুত্বের পেছনে কাজ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান। যে দিন থেকে আমি শব্দটির সাথে 'আমার' নামক একটি সম্পদ ভিত্তিক ধারণা যুক্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই একজন পুরুষ কিংবা পিতা সবসময় চায় যে তার পছন্দের নারীর জরায়ুতে শুধুমাত্র তার সন্তানই জন্ম নেবে এবং জন্মের পর বহন করবে তার নাম ও সম্পদ-কে। বর্তমানের বিজ্ঞান-দর্শনকে গ্রাহ্য করে আমরা যদি এমন একটা আইন প্রণয়ন করি (যা বাস্তবে সম্ভব নয়) যে একজন নারী শুধুমাত্র সরকার-নিয়ন্ত্রিত শুক্রানু ব্যাংকে রাখা স্বামীর বীর্য গ্রহণের মাধ্যমেই সন্তানের জন্ম দিতে পারবে এবং জন্মের পর প্রতিটি শিশুর ক্রোমোজম বিশ্লেষণ করে পিতার পিতৃত্ব রক্ষা করা হবে, তখন দেখা যাবে যে একটি নারী তার জরায়ুর স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু তার পরও যদি কোনো 'প্রভুত্ব' থেকে যায়, তবে তা হবে একটি নারী কিংবা পুরুষের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে (এখানে ভালোবাসা শব্দটি ক্রোমোজমের কোয়ান্টাম নক্শায় অঙ্কিত বিপরীত সত্তার প্রতি সহজাত আকর্ষণকে বোঝায়)।

বিজ্ঞান ও লাকাঁ বর্ণিত মৃত্যুকাম বা Thenatos আসলে মানুষের ক্রোমোজমে অঙ্কিত কোয়ান্টাম নক্শার-ই উপস্থাপিত বিষয়। আমরা এখন জানি যে, মানুষের জীবন একটি জৈব ঘড়ি (Biological clock) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জৈব ঘড়ির শূন্য ও শেষ বিন্দুর মধ্যবর্তী সময়কেই আমরা বলি জীবন। জৈব কোষের ভাঙা-গড়া, স্থির ও অস্থির হওয়া ইত্যাদি আসলে জৈব ঘড়ির এক পূর্বনির্ধারিত যাত্রা এবং এ কারণেই প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব ঘড়িকে কেন্দ্র করে মৃত্যুকে তুলে নেবার জন্য অপেক্ষা করে। জৈব-ঘড়ির সময়কেন্দ্রিক Program-ই হল মৃত্যুকামের উপাদান।

অনুচিন্তন

ফ্রয়েড, লাকাঁ ও সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শন সম্পর্কে যা উপস্থাপন করা হল তা কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফ্রয়েড ও লাকাঁ তাঁদের মতবাদে যা বলতে চেয়েছেন বা যে সত্য উন্মোচন করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, এমন দাবিও লেখকের নেই। তবে সমকালীন বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে ফ্রয়েড ও লাকাঁর মতবাদের বিশ্লেষণ মননশীল পাঠকের মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, এমন ভাবা অযৌক্তিক নয়।

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ ও জীবনদর্শন

পূর্বকথা

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে জীবন এখনো অসংখ্য প্রশ্ন ও আশ্চর্যবোধক চিহ্নের সম্মুখীন। এইসব অবাক ও প্রশ্নবোধক উপলব্ধিকে ন্যূনতম মাত্রায় বিশ্লেষণ করে জীবনকে জানতে হলে গাণিতিক বিজ্ঞান দর্শন কিংবা বিজ্ঞান-দর্শনসৃষ্ট ভাববাদী বিশ্বাসের কাছে সমর্পিত হতে হয়। জীবনের অন্তর্গত যেসব প্রশ্ন এখনো আমাদের সজ্ঞা, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস ও মননকে প্রভাবিত করে, সেগুলোর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর জন্য গাণিতিক বিজ্ঞান দর্শন ও বিজ্ঞান দর্শনবাহিত কিছু বিশ্লেষণ দেওয়াই এ-প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। জীবনকে আমরা যেহেতু এখনো গাণিতিক বিন্যাসে উপস্থিত করতে পারিনি, তাই এ প্রবন্ধকে স্বতঃসিদ্ধ গাণিতিক নিয়মে কেটে-ছিঁড়ে না দেখাই সঙ্গত হবে। কোনো কোনো বিষয় ভাববাদী বিজ্ঞান দর্শনের আবর্তে বিতর্কিতও হতে পারে।

জীবনের মৌল উপাদান যেহেতু অণু ও পরমাণু, সে কারণে আজকের এ প্রবন্ধের মূল বিষয় হবে মৌলবস্তু ও কণা-কোয়ান্টাম। তবে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদসম্পর্কীয় বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনা শুরু করার আগে সনাতন ভাববাদ, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান-দর্শনসম্পর্কীয় কিছু বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ভাববাদ, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান-দর্শন

ভাববাদী দর্শনকে আমরা মনময় ভাববাদ ও বাস্তব ভাববাদে বিভক্ত করতে পারি। মনময় ভাববাদে চেতনাকে অস্তিত্বের মূল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, আর বাস্তব ভাববাদে বলা হয়েছে মনের ভাব, বস্তু ও ঘটনা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। বাস্তব ভাববাদী বিশ্বাসে, বিশ্বজগতের সবকিছু নিয়েই সমগ্র এবং সমগ্রের মাঝেই নিহিত আছে সবকিছুর অস্তিত্ব। সমগ্র বলতে কোনো বস্তু বোঝায় না, কিন্তু বস্তুও সমগ্রের বাইরে কোনো ভিন্ন অস্তিত্ব নয়। ভাববাদ পরবর্তী পর্যায়ে নিত্যনতুন দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে দৃষ্টিসত্তাবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, নববাস্তবতাবাদ, অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি নামের বিভিন্ন দর্শনতত্ত্বের সৃষ্টি করেছিল। এনিসিডেমাস, প্লাতো, বার্কলে, ফিক্‌টে, কোঁতে, জাসপার্স, হিউম, কিয়ার্কেগার্দ, কান্ট, শোপেনহাওয়ার, আলেকজান্ডার, ক্রোচে, সার্ত্রে ও অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকরা জীবনকে চেতনা ও ভাবের প্রাধান্য দিয়েই বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। সক্রেটিস, দেকার্ত, হোয়াইটহেড প্রমুখ দার্শনিকরা ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বৈততার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের সার্বিক দর্শনকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বস্তুবাদী দর্শনে জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, জগতের এককই হচ্ছে বস্তু এবং বস্তুজগৎ সম্পূর্ণভাবে মন বা চেতনা-নিরপেক্ষ। চীনের দার্শনিক লাওৎসে, ওয়াং চুং, ভারতের চার্বাক ও গ্রিসের হেরক্লিটাস, এনক্সাগোরাস, এনক্‌সিমেন্ডার, ডিমোক্রিটাস প্রমুখ দার্শনিকেরা ছিলেন

প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তা। প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনে ধর্মীয় অন্ধ অলীক বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। এমনকি মধ্যযুগে ইউরোপীয় বস্তুবাদী দর্শনেও ধর্মীয় প্রকৃতিবাদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

মনসহ সব কিছুই বস্তু এই তত্ত্ব দিয়ে বিশ্বের জটিল বিকাশকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে। এ সময় গ্যালিলিও, বেকন, জন লক, স্পিনোজা প্রমুখ দার্শনিক-বিজ্ঞানী, অভিজ্ঞতাবাদকে বস্তুবাদী দর্শনের সাথে সংযুক্ত করে জীবন ও জগতের একটা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের অর্ন্তনিহিত সূত্র প্রকাশে এঁদের দর্শনও ব্যর্থ হয়। অষ্টাদশ শতকে দার্শনিক ডিডেরো, হেলভেটিয়াস ও হলবাক এই সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করেন। দার্শনিক হলবাক তাঁর দর্শনে বলেন বস্তুর বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই, বস্তুই আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে এবং তার ফলেই সৃষ্ট হয় জীবনের সব অনুভূতি। বস্তুর মৌলিক পদার্থ হচ্ছে অণু এবং বস্তু সামগ্রিকভাবে গতিসম্পন্ন, এ রকম একটা যান্ত্রিক জীবনদর্শন আমরা হলবাকের বিশ্বাস থেকে পাই। পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাক নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের বিকাশ ঘটান এবং বস্তুবাদের পূর্ণতর বিকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতকে কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং ভি.আই. লেনিনের দর্শনচিন্তায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিজ্ঞান-দর্শনের আলোচনা শুরু হয় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান-দর্শন আন্দোলনের শুরু করেন বিভিন্ন দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। এ সময় বিজ্ঞানী আর্নস্ট মাখ, অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত অধিবিদ্যার আওতাধীন সমস্ত বিষয়কে বিজ্ঞান-দর্শন থেকে দূরে রাখার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। মাখের দর্শন-ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে ভিয়েনা-কেন্দ্রিক এক আন্দোলনের শুরু হয় ১৯২০ সালের প্রথম দিকে। এ আন্দোলন ভিয়েনা সার্কেল নামে পরিচিতি লাভ করে এবং সার্কেলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন মরিস শ্লিক, হ্যানস্ হ্যান, অটো ন্যুরেথ এবং ফিলিপ ফ্র্যাংক। ভিয়েনা সার্কেল-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান-দর্শন আন্দোলনের মূল আদর্শ ছিল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বা পরখনীতি। বিজ্ঞানে যে সব বিষয়কে অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ বা পরখ করা যায় না, সেসব বিষয় অধিবিদ্যার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে গণ্য হবে, এই ছিল ভিয়েনা সার্কেলের মূল দর্শন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের অনেক সাধারণ সূত্রকেও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একজন বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার জন্য গাণিতিক যুক্তিতে, প্রমাণ ছাড়াই, যে-কোনো প্রকল্প বা অনুমান গ্রহণ করতে পারেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁর অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণও উপস্থিত করতে পারেন, কিংবা তাঁর অনুমান ও প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে নতুন বিষয়ও প্রমাণ করতে পারেন। প্রায়োগিক বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেহেতু অনুমান ও প্রকল্পের যথার্থ ভূমিকা রয়েছে, সেহেতু ভিয়েনা সার্কেলের প্রস্তাবিত পরখনীতি প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয়। কার্ল পপার পরখনীতির বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তাঁর ‘মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্যতা-নীতি’ (Falsificationism) উপস্থাপন করেন। পপারের দর্শনে বলা হয়, বিজ্ঞানের মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্য যে-কোনো বিষয়কে আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদিও তা মিথ্যা নয়। অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষে বিজ্ঞান যেহেতু পরম সত্য নয় এবং সময়ের সাথে তা নতুন সূত্র বা প্রমাণে উপস্থিত হতে পারে, সেহেতু আপাতত মিথ্যাপ্রমাণযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ও বিজ্ঞান-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, একটি গাণিতিক বিশ্বাস বা কনজেকচার হিসেবে, এ যুক্তিই পপার তার মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্যতা-নীতিতে উল্লেখ করেছেন। পল ফেয়েরাবেন্ড তাঁর

তাত্ত্বিক নৈরাজ্যবাদী দর্শনে বলেছেন যে, বিজ্ঞান মূলত মানবিক প্রকৃতির এবং এ জন্যই ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে থাকবে। কোনো নীতি, পদ্ধতি বা সূত্র দিয়ে বিজ্ঞানের নিত্য প্রবাহমান অনুসন্ধিৎসাকে গণ্ডিভূত করা ঠিক হবে না। টমাস কুনের দর্শনতত্ত্বে বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে কতগুলো সাধারণ বিজ্ঞানের সময়পর্ব উত্তরিত হয়ে, কিংবা কোনো বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সাধিত হবার পর। কোনো নির্ধারিত সাধারণ বিজ্ঞানের সময়পর্ব অদ্বৈতবাদী সত্তা নিয়ে বিরাজ করে এবং এ সময় বিজ্ঞানীরা কোনো এক একক চেতনা-কাঠামোতে থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা করেন। কতগুলো বিজ্ঞানের বিপ্লব হয়ে যাবার পর নতুন চেতনা-কাঠামোর সৃষ্টি হয় এবং নতুন সাধারণ বিজ্ঞানের সময়পর্ব উপস্থিত হয়। মার্গারেট মাস্টারম্যানের মতে, কুনের চেতনা-কাঠামোকে মূলত তিন ভাগে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, তা হল অধিতাত্ত্বিক চেতনা-কাঠামো, সামাজিক চেতনা-কাঠামো এবং সৃষ্টিশীল চেতনা-কাঠামো।

টমাস কুনের 'সাধারণ বিজ্ঞান' ও 'প্যারাডাইমের দর্শন' পপার সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মেনে নেননি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে পপার, কুন, ফেয়েরাবেন্ড, লাকাতোস, মাস্টারম্যাস, টোলমিন, ওয়াটকিন্স, উইলিয়ামস্, প্রমুখ বিজ্ঞান-দার্শনিকেরা প্রচুর তাত্ত্বিক আলোচনা ও দর্শনের সৃষ্টি করেছেন এবং এঁদের মাঝে অনেকেই এখনো সক্রিয়।

কণা-কোয়ান্টাম তত্ত্ব

আমাদের জীবনের পারমাণবিক সংগঠনে যখন কোনো বস্তুদৃশ্য গ্রহণ করি, তখন সেখানে আলোর একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। আলো বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে কিভাবে আমাদের মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করে তোলে, তার একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে দিয়ে দু'রকম তত্ত্বের উদ্ভব হয়। একটি তত্ত্বে বলা হয়, আলো ফোটন কণিকা এবং অন্য তত্ত্বে, আলোকে একটি প্রবহমান তরঙ্গব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। আলোর ব্যবর্তন ও ব্যতিচারকে মেনে নিলে আলো তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই নয়; কিন্তু আলো সব সময় সরল রেখায় চলে, এ কথা মেনে নিলে, আলোর তরঙ্গব্যবস্থাও সঠিকভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

বিজ্ঞানী ম্যাকস্ওয়েল ও হার্ৎস পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, আলো প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বিদ্যুৎ-চৌম্বিক ঢেউ (Electro Magnetic Wave)। বিজ্ঞানী ম্যাকস্ওয়েল ও হার্ৎস আলোর তরঙ্গ-তত্ত্বের সপক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন, সেই একই পরীক্ষাকার্যে আলোর কণা-তত্ত্বের সপক্ষেও কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯০০ সালে বিজ্ঞানী ম্যাকস্ প্লাঙ্ক উপস্থিত হলেন তাঁর বিখ্যাত কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে, যা জগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে কিছুটা হলেও বিচ্যুত করেছিল। ম্যাকস্ প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূলে ছিল পরমাণু-উৎসারিত বিকিরণ ধর্মের গাণিতিক ব্যাখ্যা। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উত্তাপের বিভিন্ন মাত্রায়, বিকিরিত শক্তির যে ভিন্নতর প্রকাশ ঘটে, তা প্লাঙ্কের সমীকরণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। প্লাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটি হল, কোনো শক্তি নিঃসৃত হয় কতগুলো শক্তি বা কোয়ান্টামগুচ্ছে এবং প্রতিটি কোয়ান্টামগুচ্ছে নিহিত শক্তি, বিকিরণ কম্পাঙ্কের (Wave length) সাথে একটি সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত। নিঃসৃত শক্তির পরিমাণকে বিকিরণ কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে

আমরা একটা ধ্রুবক পাই, যাকে প্লাঙ্কের ধ্রুবক (Planck’s Constant) হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের পরিচিত কোয়ান্টায়িত বিশ্বজগৎ ও বস্তুসম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে গেলে, এই ধ্রুবকই পরমাণু পদার্থবিদ্যার সমস্ত হিসাব-নিকেশের ধ্রুব হিসেবে উপস্থিত হয়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আলোক বিদ্যুৎ-সূত্র উপস্থিত করতে গিয়ে বলেন যে, আলো ও উত্তাপের মতো সকল প্রকার বিকিরিত শক্তি শূন্যে পৃথক পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টামে বিচ্ছুরিত হয়। প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের আলোক কোয়ান্টাম-তত্ত্ব মেনে নিলেও, আলোর ব্যবর্তন ও ব্যতিচার ধর্মের নিরিখে, আলোর তরঙ্গব্যবস্থাকেও বাতিল করা যায় না এবং যার জন্য ‘আলোই তরঙ্গ, আলোই কণিকা’– এরকম একটা দ্বৈতবাদকেই গ্রহণ করতে হয় আমাদের।

১৯১১ সালে আর্নস্ট রাদারফোর্ডের পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছিল যে, একটা পরমাণুর গঠন আমাদের পরিচিত সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মতোই। একটি পরমাণু কেন্দ্রকণার (Atomic Nucleus) চারপাশে গ্রহের মতো ইলেকট্রন কণা কিছু নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। একটা পরমাণুকেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত ইলেকট্রন-কণাকে সাধারণ অবস্থায় কক্ষচ্যুত করা সম্ভব নয় এবং একটি ইলেকট্রন-কণা অসীম সময়ে গতিশীল থেকেও তার কক্ষ পরিভ্রমণ বল হারায় না। এ রকম অবস্থা আমাদের পরিচিত সৌরজগতের বেলায় প্রযোজ্য নয়। বিজ্ঞানী ম্যাকস্‌ওয়েলের সূত্র অনুযায়ী, একটা ইলেকট্রনের জন্য স্বাভাবিক হল কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে, আলো বিকিরণ করে, পরমাণু-কেন্দ্রে ধসে পড়া এবং এমন অবস্থায় পরমাণুর অস্তিত্বই না-থাকা। নিলস বোর প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনুসরণে ধরে নিলেন যে, আলো কোয়ান্টায় গঠিত এবং একটা ইলেকট্রন তার নিজস্ব কক্ষপথে পাক খেতে খেতে অন্য কোনো কক্ষপথে ঝাঁপ দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সর্বনিম্ন একটা কক্ষপথ অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করা একটা ইলেকট্রনের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতিতে আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাই, তার ইলেকট্রনকে নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করতে হলে একটা সুনির্দিষ্ট গুচ্ছমাত্রায় বা কোয়ান্টামে তেজ প্রয়োগ করতে হয় এবং সেই নির্দিষ্ট তেজ প্রয়োগের ফলে একটা নির্দিষ্ট তেজ-মাত্রা ও তদ-উৎসারিত বিকিরণ মাত্রা সবসময় কোয়ান্টায়িত এবং বিভিন্ন কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থান করে। প্রকৃতিতে আমরা যে-সব বস্তু সাধারণ অবস্থায় দেখি, তা হল সেই বস্তুর সর্বনিম্ন কোয়ান্টাম তেজের অবস্থা বা রূপ।

একটি পরমাণুর কেন্দ্রকণা গঠিত হয় নিউট্রন ও প্রোটন নামক উপপারমাণবিক কণা দিয়ে, আর এই উপপারমাণবিক কণার সংগঠনও কোয়ান্টায়িত। উপপারমাণবিক কণার অর্ন্তনিহিত উপাদানও কতগুলো বস্তুকণা, যাদেরকে কোয়ার্ক (Quark) নামে অভিহিত করা হয়। এই কোয়ার্ক কণাকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যেমন– উঁচু বা u-কোয়ার্ক, নিচু বা d-কোয়ার্ক, অদ্ভুত ং-কোয়ার্ক, মধুর বা c-কোয়ার্ক, সুন্দর বা b-কোয়ার্ক এবং সত্য বা t-কোয়ার্ক। এই কোয়ার্ক কণাগুলোকে একত্রে বেঁধে রাখার জন্য আটটি গ্লুয়ন (Gluon) বা আঠালো কণার অস্তিত্বকে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই-সব মৌলিক উপপারমাণবিক কণার রয়েছে কতগুলো সাধারণ গুণ বা ফ্লেভার (Flavour) এবং এগুলোর গুণ বা ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম-সংখ্যা বা রঙ (color) দিয়ে নির্ধারিত। রঙিন কোয়ার্ক ও গ্লুয়নের পরিমাপতত্ত্বের প্রসারের সাথে সাথে,

সক্রিয় হয়ে উঠেছে কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিদ্যার (Quantum Chromodynamics) জগৎ এবং আজকের বিজ্ঞানীরা এইসব উপপারমাণবিক কণার জগৎ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরমাণু বা উপপারমাণবিক কণার কোয়ান্টাম অবস্থা স্বীকৃত হলেও, তাদের তরঙ্গ-অবস্থার চিত্রও বিজ্ঞানীদের কাছে বারবার ধরা পড়ে। ১৯৫২ সালে লুই দ্য ব্রগলি (Louis de Broglie) নতুনভাবে প্রমাণ উপস্থিত করে বলেন যে, বস্তু ও বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া সবচেয়ে সফলভাবে উপস্থাপন করা যায় তরঙ্গব্যবস্থা হিসেবেই। প্লাঙ্ক ও তৎপরবর্তী বিজ্ঞানীদের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, ব্রগলির গাণিতিক সূত্রের মুখোমুখি হয়ে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিছুদিন পর ভিয়েনার পদার্থবিজ্ঞানী শ্রেয়েডিংগারও (Schroedinger) প্রমাণ করেন যে, ইলেকট্রন সবসময়ই তরঙ্গের চরিত্র বহন করে এবং তৎপরবর্তী পরীক্ষাকার্যে এটাও জানা গেল যে, একটি পরমাণু, এমনকি একটি অণুও, আসলে এক নিহিত তরঙ্গব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয়। পদার্থবিজ্ঞানের এ সব তত্ত্বের আলোকে বাস্তবে যে অবস্থাটা দাঁড়াল, তাতে বস্তু বলতে বোঝাল তরঙ্গ এবং আলো বলতে কণিকা। দর্শনের দৃষ্টিতে জীবনবস্তু হয়ে উঠল কতগুলো তরঙ্গ-সমষ্টি এবং দৃশ্যমান জগৎ হল আলোর কণার একটি নির্দিষ্ট কোয়ান্টায়িত বিকিরণ। বস্তুর এই দ্বৈতসত্তাকে একটি সমন্বয়কারী সূত্রে প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ ও ম্যাকস্ বর্ন। তাঁদের সমন্বয়কারী সূত্র অনুযায়ী, একটা বস্তুর, তা তরঙ্গই হোক বা কণাই হোক, মৌলিক কোয়ান্টাম অবস্থার নির্ভুল বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। হাইজেনবার্গ ১৯২৭ সালে তাঁর অনিশ্চয়তা নীতি (Uncertinity Principle) তত্ত্বে বললেন যে, একটা একক ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতি একই সময়ে নির্ণয় করা বাস্তবে অসম্ভব, বরং একটা সামগ্রিক ইলেকট্রন ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার পর একজন বিজ্ঞানী, কোনো এক নির্দিষ্ট ও বিবেচনাধীন ইলেকট্রনের সম্ভাব্য গতি কিংবা অবস্থানের কথাই বলতে পারেন মাত্র।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জ্ঞানালোকে সনাতন পদার্থবিদ্যার কারণতা (Causality) ও নির্ধারণীয়তার (Determinism) নীতি বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেক পদার্থবিজ্ঞানী, এমনকি আইনস্টাইন স্বয়ং অনিশ্চয়তাবাদকে মেনে নিতে পারেননি। অনিশ্চয়তাবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আইনস্টাইন প্রায়ই বলতেন– 'ঈশ্বর নিশ্চয় বিশ্বজগৎ নিয়ে পাশা খেলেন না'। আমাদের পরিচিত জগৎ নিয়ে ঈশ্বর পাশা খেলুক আর নাই খেলুক, অনিশ্চয়তাবাদ ছাড়া আপাতত কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ও অণু-পরমাণু সংগঠনের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

জীবনও যেহেতু কতগুলো মৌলিক পরমাণুর সমষ্টিমাত্র, সেহেতু পরমাণু-কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও অনিশ্চয়তানীতি জীবনের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ কারণেই জীবনের কোয়ান্টাম অবস্থা কী ও কোন অবস্থায় কাজ করে, তার একটা বিবরণও আমাদের জানা প্রয়োজন।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও জীবন

আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক জড় জগতে বিভিন্ন বস্তু-পরমাণু নিম্নতম কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অণু গঠন করে, ঠিক তেমনি জীবনের অণুও নিম্নতম কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থানকারী কতগুলো জড় পরমাণুর এক জটিল সংগঠন। একটি জীবন্ত জীবন-পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন, এই চারটি মৌলিক

পদার্থের প্রাধান্যই লক্ষ করি। এ ছাড়া লোহা, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, মেঙ্গানিজ ইত্যাদির মতো অন্যান্য মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব জীবন-পদার্থে পাওয়া যায়। জড় ও জীবনবস্তুর পারমাণবিক সংগঠন এক অভিন্ন অন্তঃক্রিয়ার ফলে সংগঠিত হলেও, জীবন-পদার্থের গঠন অত্যন্ত জটিল এবং জড় পদার্থের অণু-পরমাণুর ধর্ম থেকে আশ্চর্যজনকভাবে পৃথক। একটি জৈব-জীবন্তকোষে দুই শ্রেণীর বৃহদাণু থাকে, যাকে আমরা প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড বলে চিহ্নিত করি। প্রোটিনের বৃহদাণু বিশ প্রকার এমিনো এসিডের অণুর শৃঙ্খলে গঠিত হয়, আর নিউক্লিক এসিডের বৃহদাণু ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক এসিড ও রিবো নিউক্লিক এসিডের অন্তঃস্থ সাইটোসিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও এডেনিন নামক চার প্রকার নিউক্লিওটাইড দ্বারা সংগঠিত। নিউক্লিক এসিডের বাইরের কাঠামোতে দেখা যায় এক প্রকার কোয়ান্টায়িত শর্করা ও ফসফেট অণু।

জীবনের প্রাথমিক বৃহদাণু-সংগঠন, প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড, তৈরি হয় এক জটিল ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, যার জন্য প্রয়োজন হয় জীবনের অণুমূলে নিহিত কোয়ান্টায়িত তেজের। একটি জীবনকোষ সাধারণত শর্করা অণু থেকে প্রয়োজনীয় তেজ গ্রহণ করে এবং জীবনের অণু সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করে। শর্করা অণুর দহনতেজ এক বিশেষ জৈব প্রক্রিয়ায় তেজশালী কোয়ান্টাম অবস্থায় অবস্থান নেয় এবং কতগুলো বিশেষ প্রোটিন এই বিশেষ জৈব-ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। জীবন-কোষের অভ্যন্তরে এডিনোসিন ট্রি-ফসফেট (ATP) নামক এই বিশেষ প্রোটিন দুটি পৃথক কোয়ান্টাম অবস্থায় অবস্থান করতে সক্ষম। শর্করার দহনক্রিয়ার সময় ATP অণু উচ্চতর কোয়ান্টাম অবস্থায় উন্নীত হয় এবং জীবন-দেহের কোথাও অণু সংশ্লেষণের জন্য তেজের প্রয়োজন হলে, সেই অবস্থানে তেজ বিকিরণ করে নিম্ন কোয়ান্টাম ধাপের এডিনোসিন ডি-ফসফেটে (ADP) রূপান্তরিত হয়। জীবন-পদার্থের মাঝে এনজাইম নামের আরো অনেক জটিল প্রোটিন রয়েছে, যারা দহনশীল শর্করা থেকে ATP অণুতে কোয়ান্টায়িত তেজ স্থানান্তর করে থাকে এবং এমিনো এসিড ও নিউক্লিওটাইডের মতো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিচালন ও সংগঠন করতে পারে।

পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা ও জীবনের সর্বোচ্চ পারমাণবিক কাঠামোর সম্পর্ক খুবই কাছাকাছি। জীবনপদার্থের দীর্ঘ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিউক্লিওটাইডও অবস্থান করে এক সুনির্দিষ্ট কোয়ান্টাম ধাপে এবং একটি নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম নকশার ইলেকট্রনে আবদ্ধ থাকে। জীবনপদার্থের ভেতরে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রিয়া চলতেই থাকে, কিন্তু নিউক্লিওটাইডের কোয়ান্টাম নকশায় কোনো পরিবর্তন হয় না। বংশবিস্তার করার সময় একটি জীবনপদার্থ নতুন প্রজন্মের মাঝে একই রকম কোয়ান্টাম নকশা DNA মারফত হস্তান্তর করে থাকে।

শ্রেণিবিস্তার ও বংশবৃদ্ধির সময় DNA-র কোয়ান্টাম অবস্থা এক থাকলেও, জন্মের পর পুষ্টিগ্রহণ, পুষ্টিসংশ্লেষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতর কোয়ান্টায়িত অভিঘাত, প্রতিটি জীবনপদার্থকে এক মৌলিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলে। মানুষ বা যে-কোনো প্রাণীর বেলায় দৈহিক শক্তি, ওজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্কের কাঠামো ও অন্যান্য শারীরিক ও জৈবিক উপাদানও এক ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, সময়ের সাথে আপেক্ষিক মাত্রায় বেড়ে ওঠে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, জন্মের পর একজন মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয় (লেখকের মতে যৌনাঙ্গকে পৃথক ইন্দ্রিয় হিসেবে ধরা যায় এবং এমন অবস্থায় ইন্দ্রিয় সংখ্যা হবে ছয়), প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উপলব্ধি-সংবেদ গ্রহণ করে এবং তা সংরক্ষণ করে তার মস্তিষ্ক-নিউরোনে। প্রাকৃতিক দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শের অনুভূতি-সংবেদগুলো মস্তিষ্কে নিউরোন-কোষে আবদ্ধ হয় এক ধরনের বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে, যা আংশিকভাবে কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক (Quantum Mechanical), কারণ উপলব্ধি-সংবেদ আদান-প্রদান ক্রিয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের আয়ন, সোডিয়াম-পটাশিয়াম দরজা, স্নায়ু-সংবেদবাহক ইত্যাদির ভূমিকাই থাকে মুখ্য। বেলর, ল্যাম্ব এবং ইয়াও ১৯৭৯ সালে পরীক্ষা করে জানান যে, কুনোব্যাঙের চোখের রেটিনাতে একটি একক আলোর কোয়ান্টাম আঘাত করলেই ব্যাঙটির স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এর আগে ১৯৪১ সালে হেক্ট, শ্লেয়ার এবং প্রেনের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছিল, আলোর উপলব্ধি-সংবেদ গ্রহণের জন্য একজন মানুষের রেটিনাতে কম করে হলেও সাতটি কোয়ান্টার অভিঘাত প্রয়োজন। প্রাগুক্ত বিষয় ও উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, জীবন ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা জীবনের ওপর কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রোজার পেনরোজ-এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:

'Since there are neurons in the human body that can be triggered by single quantum events, it not reasonable to ask whether cells of this kind might be found somewhere in the main part of the human brain? ...One might speculate, however, that somewhere deep in the brain, cells are to be found of single quantum sensitivity. If this proves to be the case, then quantum mechanics will be significantly involved in brain activity.'

মানুষের দেহে কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক ক্রিয়া অবস্থান করলে, মানব-মস্তিষ্কে একক কোয়ান্টাম ক্রিয়া-কোষ আছে কি নেই, এ সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। যদি কোনো সময় মানব-মস্তিষ্কে একক কোয়ান্টাম কোষের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা কৃত্রিম-বুদ্ধিসম্পন্ন কম্পিউটার তৈরির কাজে তাত্ত্বিক ভিত্তি দিতে পারবে, এরকম ভাবার কোনো গাণিতিক যুক্তি আপাতত আমাদের হাতে নেই এবং এজন্য আমরা ভাবতে পারি যে মানব-মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উন্নততর কোনো অজানা-অচেনা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রাধান্যই হয়তো-বা থাকে বেশি। এ প্রসঙ্গে পেনরোজের মন্তব্য হল:

"There is certainly a puzzle for any 'ordinary' quantum description of our brains, since the actions of 'observation' is taken to be an essential ingredient of the valid interpretations of conventional quantum theory. Is the brain to be regarded as 'observing itself' whenever a thought or perception emerges into conscious awareness? The conventional theory leaves us with no clear rule as to how quantum mechanics could take this into account and thereby apply to the brain as a whole. I have attempted to formulate a criterion for the onset of R (State-vector Reduction) which is quite independent of consciousness (the 'one-graviton

criterion') and if something like this could be developed into fully a coherent theory, then there might emerge a way of providing a quantum description of brain, more clearly than exist at present."

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ ও জীবনদর্শন

জড় ও জীবনপদার্থের ওপর অণু, পরমাণু ও উপপারমাণবিক কণার কোয়ান্টাম অবস্থা সমানভাবেই প্রযোজ্য এ সিদ্ধান্ত আমরা জড় ও জৈব পদার্থের কোয়ান্টাম বলবিদ্যাজাত বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই নিতে পারি। মৌলিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও জীবনের কোয়ান্টাম অবস্থার ওপর আলোচনার নিরিখে এবং বিভিন্ন অবরোহী, আরোহী ও গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমেই, আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের পারমাণবিক কাঠামোই বিভিন্ন কোয়ান্টাম অবস্থায় আমাদের সজ্ঞা, সত্তা, জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, মন ও সামগ্রিকভাবে জীবন ও জীবনের মূল উপলব্ধিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবন উত্তরিত হয় এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও অনিশ্চয়তানীতি যেহেতু জীবন বিশ্লেষণে তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োগ করা চলে, সেহেতু জীবন বিষয়ক বিজ্ঞানদর্শনকে আমরা 'কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ' বলে আখ্যায়িত করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করতে পারি।

এক :

পারমাণবিক সংগঠনের দিক থেকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ও মৌলিক জীবনবস্তু এবং বিভিন্ন মাত্রার জীবনবস্তু হিসেবে প্রতিটি মানুষের কোয়ান্টাম ধাপও মৌলিকভাবে ভিন্ন। নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, শরীরবিজ্ঞান বা অন্যান্য গাণিতিক বিজ্ঞানের নিরিখে, বিভিন্ন বিজ্ঞানী বা দার্শনিক, মানুষের সামগ্রিক জৈবজীবন, ধর্ম, সংগঠন ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করে কতগুলো জৈব ধ্রুবক বা Organic Constant বের করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে বলতে গেলে কতগুলো নির্দিষ্ট জৈবধ্রুবক ব্যতীত প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে আপেক্ষিকভাবে অবস্থান করে।

দুই :

ভৌত প্রাকৃতিক জগতের কোয়ান্টায়িত উত্তেজনা বা বিকিরণ, জীবনপদার্থের পারমাণবিক সংগঠনে প্রতিনিয়ত আঘাত করে জৈব অণু-কোষের মৌল ক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে। জন্মমুহূর্তে একজন মানুষ (DNA) বাহিত নিম্নতম কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থান করে মৌলিক জীবনপদার্থ হিসেবে কিছু সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায়। পরবর্তী পর্যায়ে পরিবেশ ও প্রকৃতির দৃশ্যমান বস্তুসমূহের ছবি-প্রতিচ্ছবি আলোক ফোটন হিসেবে আঘাত করে জীবনকাঠামোকে সচল করে তোলে এবং দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির কণা বা তরঙ্গব্যবস্থা, আরোহী, অবরোহী কিংবা গাণিতিক পদ্ধতিতে জীবন-অণুতে বিভিন্ন বিদ্যুৎ-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়, যাকে আমরা আত্মস্থ জ্ঞান হিসেবে ধারণ করি।

তিন :

একজন মানুষ জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিভিন্ন কোয়ান্টাম ধাপ অতিক্রম করে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বাণী এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপসর্গ, জ্ঞান-তেজ হিসেবে, একজন মৌলিক মানুষের পারমাণবিক কোয়ান্টাম ধাপ উত্তরণে সাহায্য করে।

চার :

মানুষের জীবন বিভিন্ন কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থানকালে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় চিন্তা বা জ্ঞানের বিকিরণ করতে পারে, যা পূর্ব-আহরিত জ্ঞানতেজের সাথে সম্পর্কিত।

পাঁচ :

একজন মানুষ তার মস্তিষ্কের পরমাণু অবকাঠামোতে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বা গুচ্ছে জ্ঞান-তেজ গ্রহণ করতে পারে এবং এই জ্ঞান-তেজ পরবর্তী পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট তেজমাত্রায় বিকিরিত হয়ে শব্দ, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সূত্র ইত্যাদির জন্ম দেয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির মতো সৃষ্টিশীল কাজ সব সময় সর্বজনীন হয় না, কারণ স্রষ্টা ও সাধারণ মানুষের কোয়ান্টাম ধাপ একরকম নয়।

ছয় :

জন্ম, মৃত্যু ও জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবন ও জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কোয়ান্টায়িত এবং কোয়ান্টায়িত জীবনবস্তুর বিকিরণও এক অনিশ্চয়তা নিয়ে বিরাজমান। ফলে জন্ম, মৃত্যু, জীবন ও জীবনকালের সৃষ্টি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও সত্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ কেবল কিছু সম্ভাবনার কথাই বলতে পারে।

সাত :

অনিশ্চয়তাবদ্ধ ও কোয়ান্টায়িত জীবনব্যবস্থাধীন যে-কোনো তেজবিকিরণ, কখন ও কিভাবে উত্তীর্ণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কবিতা বা দর্শনের সৃষ্টি করবে, তা পূর্ব-নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং এর ফলেই গুহামানবের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত যে-কোনো জৈবিক, যান্ত্রিক বা শৈল্পিক উত্তরণ এক অনিশ্চয়তার মধ্যেই গতিশীল থেকে প্রবাহিত হয়েছে।

আট :

জৈবিক উত্তরণ বা বিবর্তনও কোয়ান্টায়িত তেজ বা জ্ঞান-তেজের প্রভাবে প্রভাবিত, কারণ জীবন-তেজ ও জ্ঞান-তেজের আঘাতজনিত কারণেই যে কোনো জীবনবস্তুর পারমাণবিক কাঠামোর কোয়ান্টাম অবস্থান প্রতিদিনই প্রভাবিত হয়।

নয় :

চিন্তা, আত্মা, মন, জ্ঞান, সত্তা, উপলব্ধি ইত্যাদি জীবনের প্রকরণ এবং তাই এগুলো জীবনবস্তু-নিরপেক্ষ নয়, বরং জীবনবস্তুর পারমাণবিক সংগঠনের মৌলিক কার্য হিসেবে এসব এক কোয়ান্টায়িত যান্ত্রিক উল্লম্ফন বা বিকিরণ-ফল। আত্মা, চিন্তা, মন ইত্যাদির কোনো নির্দিষ্ট উপ-পারমানবিক কণা আছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। প্যারাসাইকোলজি বা মেটাফিজিক্স-এর বিভিন্ন অনুদ্‌ঘাটিত বিষয় যেমন– চেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়া, সম্মোহন বল, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি আত্মা, ইচ্ছা বা চিন্তার কণা বা তরঙ্গ-ব্যবস্থারই একরকম প্রকাশ, এই সিদ্ধান্ত আপাতত তাত্ত্বিকভাবেই গ্রহণ করা সম্ভব।

দশ :

ক্রমাগত কোয়ান্টায়িত তেজ বিকিরণের ফলে একটি সুপার্নোভা নক্ষত্র যেমন তার নিজস্ব কেন্দ্রের মাঝে ধসে পড়ে এবং মহাশক্তিমান কালো বিবরের সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক তেমনি একজন মানুষও তার নিজস্ব কেন্দ্রের মাঝে বিলীন হতে পারলে মহাশক্তির স্বাদ পেতে পারে। সুফি দর্শনে উল্লেখিত সবুজ মৃত্যু, লোহিত মৃত্যু, শ্বেত মৃত্যু ও ফানা প্রাপ্তি এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাববাদী দর্শনে আলোচিত সিদ্ধিলাভের বিষয়, ক্ষুদ্রমাত্রায় মহাশক্তির কোয়ান্টাম অবস্থায় উপনীত হওয়ারই পরোক্ষ বিবরণ।

এগারো :

জীবনের দর্শন উপস্থাপন করতে গিয়ে বস্তুবাদ, ভাববাদ, সন্দেহবাদ, অস্তিত্ববাদ, সজ্ঞাবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি নামের যে-সব প্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে সময়-আপেক্ষিক বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোয়ান্টাম অবস্থান কিংবা চেতনা-কাঠামো (Paradigmn)। বিজ্ঞান-দর্শনের আলোকে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদই সমস্ত দর্শন প্রকল্পকে একীভূত তত্ত্বে প্রকাশ করতে পারে।

বারো :

বস্তুবাদ ও ভাববাদের মাঝে দূরত্ব অসীম নয়, কারণ শুদ্ধতম গণিতও শূন্যতা বা অসীমতা নিয়ে ভাবের উৎপত্তি ঘটাতে পারে, আবার ভাবও সৃষ্টি করতে পারে অসংখ্য গণিতের। দশ সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে, পূর্ণ সংখ্যা তিন-এর পর দশমিক তিন-এর পৌনঃপুনিকতা আমাদের অসীমে পৌঁছে দেয়। ঠিক তেমনি, পরম সত্তার ভাববাদী বিশ্লেষণও আমাদের পৌঁছে দেয় শুদ্ধতম গণিত-এককের কাছে এবং ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গণিতের মাঝেই, হঠাৎ হলেও, জীবন-অস্তিত্বকে আমরা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ দর্শনের মূল সত্তা হিসেবে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান থাকলেও, যৌক্তিক বা গাণিতিক ভাববাদের অস্তিত্বকে আপাতত এ দর্শন স্বীকার করবে।

তেরো :

জীবন ও জীবনসম্পর্কীয় কোনো দর্শনই জৈব-ধ্রুবক ছাড়া ধ্রুব নয়, কারণ জীবনের কোয়ান্টাম অবস্থা ব্যক্তি-একক এবং ব্যক্তি-সমগ্রের বেলায় প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল, বিবর্তন-সাপেক্ষ ও প্রবাহমান।

অনুচিন্তন

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে যে-সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন হল, তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিজ্ঞান-দর্শনভিত্তিক আলোচনা হবে এবং বর্তমানের বিজ্ঞানচিন্তা আমাদের জীবনকে বিশ্লেষণ করে সমস্ত প্রশ্নের ও অবাক উপলব্ধির অবসান ঘটাবে, এ আশাই শুধু আমরা এ মুহূর্তে করতে পারি।

সৃষ্টির কণা-তরঙ্গ রূপ ও কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব

পূর্বকথা

একটি নির্দিষ্ট শিল্পকর্ম কোনো একক ও নির্দিষ্ট সময়ে, কিংবা পৃথক পৃথক দেশ-কালে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মানব-এককের মনে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ব্যঞ্জনা-অনুভূতির সৃষ্টি কিভাবে করে এবং কেনই-বা করে, এ প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত সঠিক উত্তর এখনো আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারিনি। বর্তমানের গ্রাহ্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্শনের আলোকে আমরা শুধু একথাই বলতে পারি যে, বিবর্তনশীল মানবিক চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম কোনো এক একক দেশ-কাল-মাত্রায় অবস্থানকালে, বিজ্ঞান ও দর্শনকেন্দ্রিক কোনো বৈপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, জগৎ ও জীবনসম্পর্কীয় সমগ্র উপলব্ধি-সংবেদকে এক নতুন কাঠামো ও বিন্যাসে উপস্থিত করে থাকে এবং এর ফলেই সৃষ্টি বিষয়ক নান্দনিক উপলব্ধিও নতুন মাত্রা নিয়েই আমাদের চেতনায় আন্দোলিত হয়। বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে বর্তমান পর্যন্ত যে কোনো জৈব-অজৈব সৃষ্টিই জটিল থেকে জটিলতর সংগঠনের দিকে প্রবহমান এবং এ জন্য, সৃষ্টি বিষয়ক নান্দনিক উপলব্ধিও জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে এক জটিল থেকে জটিলতর জৈবগণিতকে কেন্দ্র করেই উত্তরিত হয়। সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে জৈবের দেশ-কাল-মাত্রানির্ভর এই উপলব্ধি-সংবেদকে বর্তমানের প্রচলিত দর্শন-সর্বস্ব

কিংবা মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্ব দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং এ কারণে আমরা চিন্তা করতে পারি যে, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞানের মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্য সর্বশেষ ধ্রুবক, সূত্র ও দর্শনের সর্বশেষ যৌক্তিক তত্ত্বকে নির্ভর করে কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব নামে একটি নতুন নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি রচনা করা সম্ভব।

প্রস্তাবিত কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প ও উপসংহার রচনা করার আগে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান, জৈববিদ্যা ও সর্বশেষ বিজ্ঞান-দর্শনের তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব সংযোজিত ‘কোয়ান্টাম’ শব্দটি শুধুমাত্র গাণিতিক যুক্তির অবয়ব ও জৈব-অজৈব বস্তুর মৌলক্রিয়ার সত্তাসার প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কিংবা কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স-এর গণিতকে সরাসরি নন্দনতত্ত্বের বিশ্লেষণে আনার প্রয়োজনীয়তা আপাতত নেই; তবে এ কথাও সত্য যে, পরোক্ষভাবে হলেও চেতনচিত্রবিজ্ঞান, সত্তাবিজ্ঞান, সাইবারনেটিকস্ ও জৈব-অজৈব বিজ্ঞান-দর্শনের সূত্র ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যাই হতে পারে নন্দনতত্ত্বের মূল ভিত্তি।

বস্তুর কণাতরঙ্গরূপ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব

আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের চারপাশে যে-সব বস্তুসমগ্রকে ইন্দ্রিয়মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি তার মৌলিক সংগঠনে অণু ও পরমাণুর উপস্থিতিই মুখ্য। কোনো বস্তু কিংবা বস্তুউৎসারিত কোনো বিষয় বিশ্লেষণ করার আগে বস্তুর একক পরমাণুকে ন্যূনতম মাত্রায় হলেও আমাদের বোঝা উচিত।

১৯১১ সনে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল যে একটা পরমাণুর সংগঠন আমাদের পরিচিত সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মতোই। রাদারফোর্ডের মডেলে, একটি পরমাণুর কেন্দ্রকণা বা নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রন নামক উপ-পারমাণবিক কণা দ্বারা গঠিত এবং তার চারপাশের গ্রহের মতো উপ-পারমাণবিক ইলেক্ট্রনকণা নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে থাকে। একটি পরমাণুতে কতগুলো ইলেক্ট্রনকণা থাকবে, তা নির্ভর করে বস্তুধর্ম ও কেন্দ্রকণা বা নিউক্লিয়াসের ভরের ওপর। পরমাণু-কেন্দ্রকণার চারপাশে আবর্তিত ইলেক্ট্রনকণাকে সাধারণ অবস্থায় কক্ষচ্যুত করা সম্ভব নয় এবং এই ইলেক্ট্রনকণাসমূহ অসীম সময়ে গতিশীল থেকেও তার কক্ষ-পরিভ্রমণ-বল হারায় না। প্রকৃতিতে আমরা যে-সব বস্তু দেখতে পাই তার পারমাণবিক সংগঠনে উপস্থিত ইলেক্ট্রন কণাসমূহকে তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করতে হলে কোনো এক সুনির্দিষ্ট গুচ্ছমাত্রায় বা কোয়ান্টামে বাহ্যিক-তেজ প্রয়োগ করতে হয় এবং এই কোয়ান্টায়িত তেজ প্রয়োগের ফলে পরমাণুটিও এক নির্দিষ্ট গুচ্ছমাত্রায় বা কোয়ান্টামে তেজ বিকিরণ করে। কোনো ইলেক্ট্রনকণাকে বিচলিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট তেজমাত্রা ও তদ্‌উৎসারিত বিকিরণমাত্রা সব-সময় কোয়ান্টায়িত এবং এ কারণেই বাহ্যিক তেজ-অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বস্তুর রূপ ও স্বরূপ বিভিন্ন কোয়ান্টামধাপে অবস্থান করতে পারে। প্রকৃতিতে আমরা যে-সব বস্তু সাধারণত গ্রাহ্য অবস্থায় দেখি, তা হল সেই বস্তুর সর্বনিম্ন কিংবা তার কাছাকাছি কণা-কোয়ান্টাম তেজের অবস্থা বা রূপ।

বস্তুর কোয়ান্টাম অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হলে বিজ্ঞানী ম্যাকস্ প্লাঙ্কের কোয়ান্টামতত্ত্বকে উপস্থিত করতে হয়, কারণ প্লাঙ্কের সূত্র দিয়ে বস্তু-পরমাণু-উৎসারিত বিকিরণধর্মের গাণিতিক ব্যাখ্যা

দেওয়া সম্ভব। শক্তির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উত্তাপের বিভিন্ন মাত্রায় বিকিরিত শক্তির যে ভিন্নতর প্রকাশ ঘটে, তা প্লাঙ্কের সমীকরণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। প্লাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টামতত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটি হল, কোনো শক্তি নিঃসৃত হয় কতগুলো শক্তিগুচ্ছ বা কোয়ান্টামগুচ্ছে এবং প্রতিটি কোয়ান্টামগুচ্ছের নিহিত শক্তি, বিকিরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের সাথে একটি সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত। নিঃসৃত শক্তির পরিমাণকে বিকিরণ কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে আমরা যে গাণিতিক সংখ্যা পাই তাকেই প্লাঙ্কের ধ্রুবক হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে বলা আবশ্যক, পারমাণবিক কেন্দ্রকণায় অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন কণার সংগঠনও কোয়ান্টায়িত এবং এসব উপ-পারমাণবিক কণার অর্ন্তনিহিত উপাদানে রয়েছে কোয়ার্ক নামের কতগুলো কণা। পারমাণবিক কাঠামোর অর্ন্তগত উপ-পারমাণবিক কোয়ার্ক কণাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব এবং এসব কণারও রয়েছে কতগুলো সাধারণ গুণ বা ফ্লেভার, যা কোনো নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত। উপ-পারমাণবিক কোয়ার্কের এই চেনা-অচেনা জগৎকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কোয়ান্টাম রঙিন-গতিবিদ্যা বা কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স-এর জগৎ এবং আজকের বিজ্ঞানীরা এ সব কণা নিয়ে তাঁদের গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বস্তুর কণা-কোয়ান্টাম অবস্থা স্বীকার করে নিলেও তাদের তরঙ্গ অবস্থাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না। ১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী ব্রগলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখান যে, বস্তু ও বিকিরণের পারস্পরিক সম্পর্ক সবচেয়ে সফলভাবে উপস্থাপন করা যায় তরঙ্গব্যবস্থা হিসেবেই। ভিয়েনার পদার্থবিজ্ঞানী শ্রোয়েডিংগার ও তদ্‌পরবর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে ইলেক্ট্রন সবসময়ই তরঙ্গের চরিত্র বহন করে এবং একটি পরমাণু এমনকি একটি অণুও আসলে এক নিহিত তরঙ্গব্যবস্থারই অন্তর্গত বিষয়।

পদার্থবিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধি-দর্শনের সৃষ্টি হয়, যেখানে জীবন ও বস্তু হয়ে যায় কতগুলো তরঙ্গসমষ্টি ও দৃশ্যমান জগৎসত্তায় ভেসে ওঠে আলোর কণার কিছু নির্দিষ্ট এবং কোয়ান্টায়িত বিকিরণ। বস্তুর এই দ্বৈতসত্তাকে একটা সমন্বয়কারী সূত্রে প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ ও ম্যাকস্‌ বর্ন। তাঁদের সমন্বয়কারী সূত্র প্রয়োগ করে কোনো বস্তুর কণা কিংবা তরঙ্গব্যবস্থার মৌলিক কোয়ান্টাম স্তর নির্ণয় করা সম্ভব।

বস্তুর অভ্যন্তরীণ সংগঠনে কণা-তরঙ্গ ব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, ঠিক সে রকমেই একটা কণা-তরঙ্গ ব্যবস্থাকে আমরা বস্তুসত্তা প্রকাশের বেলায়ও শনাক্ত করতে পারি। বস্তুসত্তা উৎসারিত কণা-তরঙ্গের রূপ ও স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন্দ্র করেই গ্রাহ্য। দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, যৌন অনুভূতি ও স্বাদ, এই ছয়টি আপাতগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় আমাদের উপলব্ধিসমূহকে আমাদের চেতনা ও সত্তায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে-কোনো সংবেদই কণা-তরঙ্গ ব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয় এবং এ কারণে ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ বা চেতনচিত্রই (Phenomenon) আমাদের চেতনা ও সত্তার মূল ভিত্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ বা চেতনচিত্রসম্পর্কীয় আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ করতে হলে মানবিক জৈবসত্তা এবং জীবনের অন্তঃকাঠামোতে ক্রিয়াশীল জৈবিক ও যান্ত্রিক সংযোগ ব্যবস্থা (জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ বা Cybernetics) সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

তত্রসত্তা, পতিতসত্তা ও মানবিক কোয়ান্টাম স্তর

মানবিক চেতনা ও সত্তাসম্পর্কীয় যৌক্তিক বিজ্ঞান-দর্শন আলোচনা করার জন্য চেতনচিত্রবাদ বা Phenomenology সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখা আবশ্যক। চেতনচিত্রবাদের প্রবক্তা দার্শনিক হুসার্লের মতে, মানবিক চেতনা হল একটি জৈবিক ক্রিয়া বিশেষ এবং চেতনা নামক জৈবিক ক্রিয়ার উপাদানসমূহ যে অর্ন্তদর্শন দ্বারা বোঝা যায় তার প্রকৃতিও এক জটিল কাঠামো নিয়েই বর্তমান। চেতনার এই জটিল চরিত্র গঠনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক পরিবেশ বা প্রকৃতি নিজেই নিজেকে কিছু ফেনমেনন বা চেতনচিত্র হিসেবে, ভাবজ ঐক্যরূপে উপস্থাপন করে এবং চেতনায় গ্রন্থিত ভাবগত সারসত্তা ফেনমেনন বা চেতনচিত্র হিসেবেই উপস্থিত।

কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-অভিজ্ঞতা-জ্ঞান চেতনা-কাঠামোতে যে ভাবগত সত্তাসারসমূহকে মৌলিক বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য করে তাকে আমরা ফেনমেনন বা চেতনচিত্র বললেও, উল্লেখিত ভাবগত সত্তা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়গত উপস্থাপনা, ধারণা, কিংবা ভাবগত বা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে বোঝায় না। এখানে সত্তা বলতে আমরা বুঝি চেতনার অভিমুখ্যতা (Intentionality) যুক্ত একটি বিষয় যা চেতনার মাঝেই সম্পৃক্ত। চেতনার অভিমুখ্যতাকে আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, সব চেতনাই কোনো কিছুর চেতনা, যা স্বয়ং-সৎ-বস্তু বা চরম নিরপেক্ষ বস্তু-ধারণার ঊর্ধ্বে এবং চেতনার অভিমুখ্যতা নতুন চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা-উত্তর অহংকে এক মূর্ত অহং-এর জগতে নিয়ে আসে।

মানবিক সত্তার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আমরা মার্টিন হাইডেগারের সত্তাবিজ্ঞানে (Ontology) পাই। হাইডেগারের মতে, যে-কোনো চিন্তাশীল মানুষ জগতে তার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে দুটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। প্রশ্ন দুটি হল– 'বিশ্বে কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে কেন'? এবং 'আমি কে?' প্রশ্ন দুটির উত্তরে সক্রেটিস-উত্তরকালে বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তি-তর্কের আবর্তে পড়ে অধিবিদ্যার দিকে এগুতে থাকেন। দেকার্ত তাঁর দর্শনে, 'কতো এরগো সুম' বা 'আমি ভাবছি তাই আমি আছি'– এরকম একটি বাক্য দ্বারা 'আমি' বা 'অহং'-কে নির্ধারিত করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখিত বাক্যটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অহংসত্তাকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ যে ভাবনা দ্বারা 'আমি'-র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, সে ভাবনাটি করার জন্য আরও একজন 'আমি'-র প্রয়োজন থেকেই যায় এবং ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে 'ঐ আমিটা কে?' হাইডেগারের মতে, কোনো মানুষই তার নিজের সত্তাকে প্রকাশ করে না বরং সত্তাই একটি ফেনমেনন বা চেতনচিত্র হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে। জন্মমুহূর্তে মানবিক চেতনচিত্রসত্তা তাৎক্ষণিকভাবেই জগতে উপস্থিত এবং জগতের বিরূপ পরিবেশের চেতনচিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। হাইডেগার তাঁর দর্শনে মানবিক চেতনচিত্র-সত্তাকেই 'ডা-জাইন' (Dasein) বা তত্রসত্তা (Being There) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'ডা-জাইন' যেহেতু ইন্দ্রিয়তরঙ্গ বা চেতনচিত্র হিসেবেই উপস্থাপিত, সেহেতু মানবিক 'বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা' (Being-in-the-world) এবং জগতকে পৃথক সত্তায় পৃথকভাবে দেখা আদৌ উচিত নয়। দেশ-কাল-মাত্রার যে-কোনো অবস্থায় ও অবস্থানে 'ডা-জাইন' ও জগৎ

যৌক্তিকভাবেই বিশ্ব-মধ্যে-সত্তার একক সংগঠন। এখানে উল্লেখ্য যে মানবিক বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা ও জগৎ-পরিবৃত-সত্তার (Being-in-the-midst-of-the-world) মাঝে পার্থক্য রয়েছে। মানবিক 'ডা-জাইন' যখন বিশ্ব-মধ্যে-সত্তার অংশ হয়েও জাগতিক বস্তু ও বিষয়ের মাঝে অবস্থান করে জগৎসম্পর্কীয় তার ভাবনার মাঝেই বিলীন হয়ে যায় তখন 'ডা-জাইন' অবস্থা থেকে তার পতন ঘটে। এই পতিত জগৎ-পরিবৃত্ত-সত্তার বিষয়ীগত স্বরূপককে হাইডেগার 'ডাসমান' (Das Man) বা 'পতিত-সত্তা' (The They) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একজন মানুষ যখন 'ডা-জাইন' স্তর থেকে সরে গিয়ে 'ডাসমান' বা 'পতিত-সত্তা'র স্তরে উপস্থিত হয়, তখন এক রকমের জাগতিক মিথ্যা-বিষয়ীগততা (Pseudo-Subjectivity) তার ব্যক্তিচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং সে 'ডা-জাইন'-এর মৌলিক স্বাধীনতাকে ভুলে গিয়ে 'ডাসমান'-সৃষ্ট বস্তুজগতের মাঝেই ডুবে যায়। পতিত-সত্তার অবস্থান থেকে মুক্তি পেতে হলে একজন মানুষকে যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে মানবিক ও অমানবিকের দ্বৈততা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং 'ডা-জাইন'-এর 'জগৎ-মধ্যে-সত্তা' ও 'ডাসমান'-এর 'জগৎ-পরিবৃত-সত্তা'র মাঝে যে পার্থক্য বর্তমান তাকে সনাক্ত করতে হবে গ্রাহ্য অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে।

হুসার্ল ও হাইডেগারের দর্শনে মানবিক চেতনা ও সত্তার যে রূপ ও স্বরূপ গ্রাহ্য করা হয়েছে তা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দর্শনের আলোকেও যথেষ্ট যৌক্তিক। বস্তু-উৎসারিত যে ইন্দ্রিয়তরঙ্গ বা চেতনচিত্র মানুষের চেতনা ও সত্তার দেশ-কাল মাত্রিক জৈবজ্যামিতি নির্ধারণ করে তার মূলে থাকে কিছু কণাতরঙ্গ ব্যবস্থা এবং এ কারণেই হুসার্ল ও হাইডেগারের দর্শনের সাথে সমসাময়িক বিজ্ঞান-দর্শন যোগ করে আমরা বলতে পারি যে, কণাতরঙ্গ-তেজ অভিঘাতেই মানবিক চেতনা ও সত্তার উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তর 'ডা-জাইন' পতিত হয়ে নিম্নতর 'ডাসমান' কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থান নেয়। 'ডা-জাইন' ও 'ডাস-মানে'র কোয়ান্টাম স্তর ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-অভিঘাতে আপেক্ষিকভাবে নিয়তই পরিবর্তনশীল, কারণ জন্মমুহূর্তে একজন মানুষ তার ক্রোমোজম-অন্তর্গত 'আরএনএ' ও 'ডিএনএ' বাহিত কিছু কোয়ান্টাম নক্‌শার সহজাত ধারণা নিয়ে একটি নিম্নতম কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থান করলেও, জাগতিক পরিবেশে এসে বস্তু-পরিবৃত-সত্তায় আরও নিম্নতর কোয়ান্টাম ধাপের পতিত-সত্তায় উপস্থিত হয়। এ রকম একটা অসহায় অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তরঙ্গই একজন মানুষের 'ডা-জাইন'-এর কোয়ান্টাম স্তর জ্ঞান-তেজ গ্রহণের সাথে সাথে, উচ্চতর কোয়ান্টাম ধাপে উত্তরিত করে। তবে এ কথা সত্য যে জ্ঞান-তেজ আহরণের সাথে সাথে একজন মানুষ উচ্চতর কোয়ান্টাম ধাপের 'ডা-জাইন' পেলেও, মানুষের মাঝে বিশ্ব-বস্তুর আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরের 'ডা-জাইন'-কে নির্জ্ঞান স্তরে বন্দি রেখে, উচ্চতর 'ডা-জাইন' আপেক্ষিক একটা নিম্নতর কোয়ান্টাম মানের 'ডাসমান' স্তরে মানুষ নেমে যায়। ব্যাপারটিকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক: 'ক' ও 'খ' নামক দুই ব্যক্তি একই দিনে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করার পর একই রকম জ্ঞান-তেজ গ্রহণ করে এক সময় কবিতা লিখতে কিংবা ছবি আঁকতে শুরু করল এবং আমরা ধরে নিলাম যে 'ক' ও 'খ'-র ডা-জাইন-কোয়ান্টাম-স্তর একই মানের। এ সময় 'ক' জাগতিক বস্তু-সত্তার আকর্ষণে এবং নিজস্ব আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশায় বিভিন্ন জাগতিক প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডে যোগদান ক'রে তার সৃষ্টিশীল 'ডা-জাইন'কে উহ্য রেখে,

জগৎ-পরিবৃত-সত্তায় বিলীন হয়ে গেল। এমন একটা অবস্থায় দেখা যাবে, 'ক'-র ডা-জাইন-কোয়ান্টাম-স্তর 'খ'-র চেয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে, আর তার ডাস-মান-কোয়ান্টাম-স্তর উপরে উঠে গেছে। এক সময় দেখা যাবে 'ক' আর কবিতা লিখতে কিংবা ছবি আঁকতে পারছে না এবং সে হয়ে গেছে একজন উৎকৃষ্ট দালাল কিংবা বস্তু-পরিবৃত-সত্তায় একজন চরম মূর্খ জৈববস্তু। পতিত-সত্তার এমন অবস্থায় একজন মানুষ কিছু কারুকাজ (কারুশিল্প, কারু-কবিতা ইত্যাদি) হয়তো-বা করতে পারে, কিন্তু কোনো প্রকার চারু-কর্ম (কবিতা রচনা, শিল্প-সৃষ্টি ইত্যাদি) করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পতিত-সত্তায় ডুবে যাওয়া একজন মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভণ্ডামি, বাগাড়ম্বরপূর্ণতা, মিথ্যা অহংবোধ, পরচর্চা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদির প্রাধান্যই লক্ষ করা সম্ভব।

বস্তুর কণাতরঙ্গরূপ ও সাইবারনেটিকস্

বস্তু ও বস্তু উৎসারিত কণা-তরঙ্গ ব্যবস্থা কিভাবে একজন মানুষের চেতনা ও সত্তায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তা বোঝার জন্য কণা-তরঙ্গ-নির্ভর যান্ত্রিক ও জৈবিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের গণিত ও যুক্তি সম্পর্কীয় ধারণা নেওয়া আবশ্যক। যন্ত্র ও জীবন্ত বস্তুর অন্তঃকাঠামোতে অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভিত্তিক যে সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গাণিতিক ও যৌক্তিক নিয়মে ক্রিয়াশীল থাকে, সে ব্যবস্থা ও বিষয় সম্পর্কীয় জ্ঞানকেই আমরা জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণবিজ্ঞান বা সাইবারনেটিকস বলি। জীবন্ত জৈব-বস্তুও যেহেতু একরকম জৈব-যন্ত্র বিশেষ, সেহেতু যে-কোনো যান্ত্রিক যুক্তি ও গণিতকে জৈবসংনিয়ন্ত্রণের বেলায় সমানভাবেই প্রয়োগ করা চলে এবং এমন একটা ধারণার ওপর ভিত্তি করেই যান্ত্রিক গণিতের ভাষা-যুক্তি এবং মানবিক চেতনা, চিন্তন, সজ্ঞা, প্রজ্ঞা, কল্পনা ইত্যাদির মতো বিষয়কে একীভূত একটি তত্ত্বে প্রকাশ করা বর্তমানে প্রায় সম্ভব।

জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণবিজ্ঞান বা সাইবারনেটিকস সম্পর্কীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়। ফ্রান্সের পদার্থবিজ্ঞানী আদ্রোমেয়ি এম্পে জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য রাখলেও, যুক্তরাষ্ট্রের গণিতজ্ঞ নরবার্ট উইনার এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথা ১৯৪৮ সালে প্রকাশ করেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞানের ওপর প্রচুর কাজ হয়েছে এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি উন্নয়ন ও মানবিক চেতনসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণের গণিত ও যুক্তিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞানের যুক্তি ও গণিতনির্ভর আগামী প্রজন্মের সুপার-কম্পিউটার হয়তো-বা ঠিক মানুষের মতোই চিন্তা করতে পারবে এবং যে-কোন বিষয় সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ দিয়ে কম্পিউটার তার অনুভূতি জানাবে মানুষের মতোই, এরকম চিন্তা করা এখন আর অযৌক্তিক নয়।

যন্ত্র ও জীবন্ত বস্তুর বেলায় জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে, তা বোঝার জন্য বস্তুর কণা-তরঙ্গের স্বরূপ ও যুক্তির গণিত সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই বিশ্লেষণ করা যাক যন্ত্রের সংনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে। একটি কম্পিউটার তার যৌক্তিক ও গাণিতিক কাজ সম্পাদন করার জন্য যে সব যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল তা হল:

ইনপুট

ইনপুট যন্ত্রাংশের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে পারি। সরবরাহকৃত তথ্যগুলো কম্পিউটারের পরিচিত পূর্বনির্ধারিত স্পর্শ-তরঙ্গ, শব্দ কিংবা চিত্র-তরঙ্গ হতে হবে এবং এ তথ্যগুলো কোনো স্পর্শকাতর কি-বোর্ড কিংবা চিত্র ও শব্দ গ্রাহক ইনপুট যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পিউটারে দেওয়া হয়। সরবরাহকৃত তথ্য ইনপুট যন্ত্রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে তরঙ্গ-সংবেদনগুলোকে কম্পিউটারের মেমরি এবং সিপিউতে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

মেমরি

কম্পিউটার তার মেমরি বা স্মৃতিতে বিভিন্ন যুক্তির ভাষা, গণিত এবং সরবরাহকৃত ও বিশ্লেষিত তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। মেমরিতে স্মৃতি-তথ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে সংরক্ষিত হয়।

সিপিইউ

কম্পিউটারের সিপিইউ বা মস্তিষ্ক, তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্য ও গাণিতিক যুক্তি সচল করে ইনপুট তরঙ্গ-সংবেদকে তুলে নেয় এবং গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন নীতিতে সংশ্লেষণ করে ফলাফল স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখে।

আউটপুট

কম্পিউটার তার প্রভু বা অপারেটরের নির্দেশ মতো সংরক্ষিত ফলাফল আউটপুট যন্ত্রের মাধ্যমে তার জানা পূর্বনির্ধারিত মানবিক ভাষায় প্রকাশ করে।

একটি কম্পিউটার তার কাজকর্ম মানুষের তৈরি কোনো গাণিতিক বা যৌক্তিক যন্ত্র-ভাষাকে কেন্দ্র করেই সম্পাদন করে থাকে এবং এ কারণে কোনো সমস্যা সমাধান করার পূর্বে কম্পিউটার তার স্মৃতি ও মস্তিষ্কে এমন একটি প্রোগ্রাম বা নির্দেশ (Software) চায় যা মানুষ-সৃষ্ট কিন্তু তার কাছে গ্রাহ্য। নিচে কম্পিউটারের একটি সহজ প্রোগ্রাম উল্লেখ করা হল:

```
১০ Input A.B
২০ LET C = (A+B)* 10
৩০ Print C
```

উপরোক্ত প্রোগ্রামটিকে Run নির্দেশ দিয়ে চালালে, কম্পিউটার প্রথমে লাইন নাম্বার ১০-এর নির্দেশ অনুযায়ী A ও B-র মান চাইবে। ধরা যাক A = ২ এবং B = ৪, আর আমরা কম্পিউটারকে A

এবং B-এর সংখ্যামান কি-বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। এবার লাইন নাম্বার ২০-এ এসে কম্পিউটার A এবং B-এর মান নিয়ে (২+৪)×১০- এই গণিতটিকে সমাধান করবে এবং উত্তর হিসেবে ৬০ সংখ্যাটি স্মৃতির C নামক স্থানে রেখে পরবর্তী লাইনে এসে Print আদেশ পাওয়া মাত্র উত্তরটি টেলিভিশন মনিটরে বা কোনো কম্পিউটার মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।
উপরে উল্লেখিত উদাহরণে একটি কম্পিউটার তার সাইবারনেটিকস্ নিয়ে যে অবস্থায় যেভাবে কাজ করল, একজন মানুষও একটি জৈব-যন্ত্র হিসেবে অনেকটা একইভাবে কাজ করে থাকে, যদিও একজন মানুষের জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারের থেকে আরো অনেক বেশি জটিল। নিচে একজন মানুষের জৈব-যন্ত্র স্বরূপের বর্ণনা দেওয়া হলঃ

মানবিক ইনপুট বা সংবেদ

একজন মানুষ তার নিজস্ব চেতনসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুখ্যত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এবং এ কারণে প্রাকৃতিক ছবি, প্রতিচ্ছবি, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, যৌন-অনুভূতি ও স্পর্শ, বিভিন্ন কণা-তরঙ্গ ব্যবস্থায় মানুষের ইন্দ্রিয় মাধ্যমে গ্রাহ্য হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশ উৎসারিত ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ অভিঘাত মানবদেহের সংবেদনশীল স্নায়ুকোষ বা নিউরোনে বিভিন্ন জৈব-বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায় এবং অর্ন্তমুখী বা সংবেদক নিউরোন ইন্দ্রিয়-উপলব্ধিকে থ্যালামাস বা মধ্য-মস্তিষ্কের মাধ্যমে গুরু-মস্তিষ্কে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের জন্য নিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবেদক-নিউরোন শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট মানের কোয়ান্টায়িত ইন্দ্রিয়-তরঙ্গকে গ্রহণ করতে পারে। চিত্র বা দৃশ্য-তরঙ্গের বেলায় 380 Mu (Millionth of a millimeter) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেগুনি রঙ থেকে ৭৮০ Mu তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লাল রঙের মধ্যবর্তী বর্ণালীই কেবল মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। শব্দের বেলায় ২০ থেকে আরম্ভ করে ২০,০০০ CPS (Cycles Per Second) ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ-তরঙ্গ মানুষ গ্রাহ্য সংবেদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদের বেলায়ও একটা নির্দিষ্ট কণাতরঙ্গ ব্যবস্থাই মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতিতে আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাই, তা কোনো এক নির্দিষ্ট কিন্তু মানুষের জন্য গ্রাহ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সংবেদক-নিউরোনকে ক্রিয়াশীল করে তোলে এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিউরোন কোষ বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরি করে সংবেদসমূহকে মস্তিষ্কের সংবেদ, শক্তি, সমন্বয়, আবেগ ও ক্রিয়াকেন্দ্রসমূহে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের জন্য নিয়ে যায়।

মানবিক মেমরি বা স্মৃতি

সংবেদক নিউরোন কর্তৃক প্রেরিত সংবেদনসমূহ বিভিন্ন বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়ার ডিএনএ, আরএনএ এবং বার্তাবাহী আরএনএ-কে (DNA, RNA, MRNA) উজ্জীবিত করে, মস্তিষ্কে আমিষকোষের বলয় সৃষ্টির মাধ্যমে, বিভিন্ন বিষয় ও সংবেদনসম্পর্কীয় স্মৃতিসমূহকে সংরক্ষণ করে। মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষণ করার মতো কোটি কোটি নিউরোন কোষ রয়েছে, যারা প্রয়োজনমতো স্মৃতির আমিষ-বলয় তৈরি করতে সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষ জন্মমুহূর্তে ক্রোমোজমের অন্তঃস্থ আরএনএ এবং ডিএনএ কোয়ান্টাম-নক্শাবাহিত কিছু সহজাত প্রবৃত্তি, মানবিক আদিম-স্মৃতি-সত্তা

হিসেবে, অধঃমস্তিষ্ক বা মেডুলা অবলোগাটায় ধারণ করে। উল্লিখিত সহজাত প্রবৃত্তিই 'ডা-জাইন' বা তত্রসত্তা হিসেবে জাগতিক চেতনচিত্রে বা বিশ্ব-মধ্যে-সত্তায় একজন মানুষের উপস্থিতিকে তাৎক্ষণিকভাবেই প্রকাশ করে থাকে। জন্মগ্রহণের পর জগৎ-পরিবৃত-সত্তায় একজন মানুষ বিভিন্ন কণাতরঙ্গব্যবস্থার অধীনে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান-তেজ আহরণ করে এবং আহরিত জ্ঞান-তেজ স্মৃতিতে সংশ্লেষণ ও পরবর্তীকালে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবিক ডা-জাইন-কোয়ান্টাম-স্তর উত্তরণ করে থাকে।

মানবিক সিপিইউ বা মস্তিষ্ক

মানুষের লঘু-মস্তিষ্ক (সেরেবেলাম), মধ্য-মস্তিষ্ক (বেসাল গেংলিয়া/ হাইপোথেলামাস) ও গুরু-মস্তিষ্ক (সেরেব্রাম) মানবদেহে গৃহীত সংবেদ ও সংরক্ষিত স্মৃতিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে। ইন্দ্রিয়সংবেদ-নির্ভর চিন্তা, কল্পনা, আবেগ, সজ্ঞা, প্রজ্ঞা, ইচ্ছা, বুদ্ধি ও অনুষঙ্গ রচনা হয় মস্তিষ্কের সেরেব্রাম অংশে এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ক্রিয়া, যেমন হৃৎপিণ্ড পরিচালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া এবং অন্যান্য দৈহিক সঙ্গতি বিধানের কার্যক্রম সেরেবেলাম ও হাইপোথেলামাস নামক মস্তিষ্ক-অংশে সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ওপর মানব-শরীরে অবস্থানকারী বিভিন্ন স্বনালী ও অনালী গ্রন্থির ক্ষরণও কার্যকর। বিশেষভাবে থাইরয়েড, পিনিয়াল, এড্রিনাল ও গোনাড নামক অন্তঃক্ষরা অনালী গ্রন্থিসমসূহের হরমোন-রস মানুষের মস্তিষ্কের পরিচালন ও মনো-দৈহিক কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

মানবিক আউটপুট বা প্রকাশ

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ সংবেদ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংশ্লেষিত ও বিশ্লেষিত হওয়ার পর একজন মানুষ তার মনের বা চেতনার প্রকাশ বিভিন্নমাত্রার চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়মাধ্যমেই প্রকাশ করে। আবেগ, এষণা, কল্পনা, সজ্ঞা, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ধারণা, ব্যঞ্জনা ইত্যাদির মতো চিন্তনক্রিয়া-হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বাণী, কথা ও সৃষ্টির মতো সরল ও জটিল অনুভূতির বিকিরণ হিসেবে প্রকাশ পায়। এসব চিন্তা ও অনুভূতি-ক্রিয়ার পেছনে মানুষের ইচ্ছার ভূমিকাও থাকে প্রত্যক্ষভাবে। মানুষ যেহেতু এক প্রকার জটিল জৈব-যন্ত্র বিশেষ সেহেতু তার সব ধরনের প্রকাশও খুব জটিল হয় এবং এ কারণে মানুষের কর্ম-ক্রিয়ায় কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। বর্তমানের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্শন মানুষের চেতনার কার্যক্রমকে অনিশ্চয়তাসহই বিচার-বিশ্লেষণ করার পর কিছু গাণিতিক মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও মানবিক সমাজ, জীবন ও চরিত্রসম্পর্কীয় অন্যান্য বিজ্ঞান, কোনো একজন একক মানুষের অনিশ্চয়তাবদ্ধ প্রকাশের বিশ্লেষণ, পূর্ব-পরীক্ষিত কোনো এক মানব-গোষ্ঠী-মডেলের চরিত্র-ধ্রুবকের সাথে তুলনা করেই উপস্থাপন করে থাকে।

মানবিক চিন্তন, ইচ্ছা ও অনুভূতির প্রকাশ যতই জটিল হোক না কেন তার পেছনে যে যুক্তির গণিত বা সাইবারনোটিকস্ কাজ করে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো যাক। ধরা যাক একদিন রাতে এক ভদ্রলোক তার ড্রইংরুমে বসে আছেন এবং সে সময় হঠাৎ করে

অন্য একজন তার পেছন থেকে চোখ চেপে ধরল। যে চোখ ধরেছে সে যেহেতু কথা বলছে না, সেহেতু ড্রইংরুমে বসা ভদ্রলোক নিম্নে উল্লেখিত গাণিতিক যুক্তি দিয়ে যে চোখ ধরেছে তার পরিচয় উদ্ধার করবে:

এক : চিন্তার শুরু "স্পর্শ ও গন্ধ চেন?" 'হ্যাঁ' যে চোখ ধরেছে তার নাম বলো।

দুই : স্পর্শ ও গন্ধ চিনি না " যে চোখ ধরেছে তার হাতে কি লোম আছে? "হ্যাঁ। " লোকটি নিশ্চয় পুরুষ মানুষ " মানুষটি বাসার ড্রাইভার হতে পারে না, কারণ তার এমন সাহস নেই " লোকটি কোনো বন্ধু হবে না, কারণ রাত এগারোটায় কোনো বন্ধুর বাসায় আসার কথা নয় " পাশের বাড়ির বন্ধু এখন ঢাকার বাইরে আছে " বড় ও মেজ শ্যালক বিদেশে, অতএব লোকটি অন্য কেউ " ছোটো শ্যালক ঢাকায় এবং সে মাঝে মাঝে অনেক রাতে বোনের বাসায় আসে " ছোট শ্যালকই চোখ ধরেছে " ছোট শ্যালকের নাম বলো।

তিন : যে চোখ ধরেছে তার হাতে লোম নেই " একজন মেয়েলোক চোখ ধরেছে " মেয়েটি কি শাড়ি পরেছে? " হ্যাঁ " মেয়েমানুষটি স্ত্রী নয়, কারণ তার স্পর্শ-গন্ধ পরিচিত " বাসার চাকরানী নয়, কারণ তাদের সাহস হবে না " ভাবী ঢাকায় নেই, অতএব ভাবী নয় " রাত এগারোটায় পাশের বাসায় বন্ধু-পত্নীই এমনভাবে চোখ ধরতে পারে " স্পর্শ ও গন্ধটাও পরিচিত বলে মনে হচ্ছে " চোখ ধরেছে বন্ধুর স্ত্রী " রুমার নাম বলো।

চার : মেয়েটি শাড়ি পরে নাই " কামিজ গায়ে দেয় মিতা, রিতা, রিমি ও বিউটি " মিতা ও রিতা বোনের মেয়ে এবং তারা মামাকে সমীহ করে, ভয় পায় " মিতা রিতা চোখ ধরেনি " রিমি ও বিউটি শ্যালিকা হলেও তারা চিটাগাং থাকে " বিউটি বলেছিল, এ মাসেই মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হবে " টেলিফোনে বিউটি বলেছিল সে দু-একদিনের মাঝেই ঢাকায় আসতে পারে " রাত দশটায় চিটাগাং থেকে একটা ট্রেন ঢাকায় আসে " মেয়েটি অবশ্যই বিউটি " বিউটির নাম বলো।

ওপরের যে মানবিক যুক্তির প্রবাহ দেখানো হল ঠিক একই রকম যুক্তি নিয়েই, গ্রহণ-বর্জন নীতিতে, একটি কম্পিউটারও সমস্যাটি সমাধান করত। মানুষের বেলায় অতিরিক্ত যা থাকছে তা হল ব্যঞ্জনা। পেছনে থেকে চোখ ধরার অন্তরালে এক ধরনের ঠাট্টা-পরিহাস বা একরকম আনন্দবোধ কাজ করছে। চোখ যে ধরেছে সে যদি বন্ধু-পত্নী বা শ্যালিকা হয় তবে বাড়তি কিছু কাজ করবে। শরীরে এড্রানেলিন ও গোনাড হরমোন সাময়িকভাবে হৃদপিণ্ডের গতি বাড়াতে পারে, দিতে পারে কিছু উত্তেজনা। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে বাসায় না থাকলে এবং বিশেষভাবে বন্ধুপত্নীর বেলায়, সমস্যা সমাধান- পরবর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আদি-রসাত্মক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে প্রচুর।

সৃষ্টি ও সাইবারনেটিকস্

একটি কম্পিউটারকে যদি বলা হয় বনলতা সেনকে তিন দিয়ে গুণ করো, তাহলে কম্পিউটার উত্তর দেবে- ‘ভুল, Syntax Error’ অর্থাৎ একজন নারীর চিত্র-তরঙ্গ-রূপকে তিন সংখ্যার বিদ্যুৎতরঙ্গ-রূপ দিয়ে গুণ করা সম্ভব নয়। কম্পিউটারকে যদি বলি বাংলাদেশের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি, তবে সে বলবে– ‘না, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা’। মানুষের বেলায় ব্যাপারটি হবে অন্য রকম। একজন মানুষ বনলতা সেনকে তিন দিয়ে পূরণ করে, ব্যঞ্জনাসহ বনলতার চিত্র-তরঙ্গ-রূপ সুন্দর থেকে চরম সুন্দরে কিংবা চরম সুন্দর থেকে স্বর্গীয় কোনো অবস্থানে উত্তরিত করতে পারে। বাংলাদেশের রাজধানী ওয়াশিংটন– এ বক্তব্যকেও একজন মানুষ গ্রহণ করবে কোনো রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা বা উদ্দেশ্য নিয়ে। আসলে মানবিক সৃষ্টির সাইবারনেটিকস্ একটা আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি করে নান্দনিক ব্যঞ্জনা। প্রচলিত প্রাকৃতিক কিংবা জাগতিক যুক্তির বিষয়ে বা ঘটনায় কোনো নান্দনিক ব্যঞ্জনা থাকে না, থাকে শুধু কিছু কারুকাজের আনন্দ-তরঙ্গ-চিত্র।

জাগতিকভাবে সত্য বিভিন্ন চিত্র ও শব্দ-তরঙ্গ দৈনন্দিন ভাষায় ও কাজে ব্যবহৃত হলেও, শিল্প-সৃষ্টির বেলায় তরঙ্গব্যবস্থার নিত্যনতুন যৌক্তিক বিন্যাস প্রয়োজন এবং এ কাজটি সফলভাবে যিনি করতে পারেন তিনিই স্রষ্টা। উদাহরণ হিসেবে কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করা যাক। মাতিসের চিত্রে নগ্ন নারীর শরীর হতে পারে নীল, আর পিকাসোর চিত্রে মানুষের শরীরের প্লাসটিক্ ফর্ম ভেঙে জ্যামিতিক চিত্রের আদল ধারণ করতে পারে। দ্য ভিন্‌চি, রাফায়েল কিংবা মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ শিল্পকর্মের মাঝেও প্রত্যক্ষভাবে এমন কিছু অতিপ্রাকৃতিক আলো-ছায়া কিংবা রঙ ও রেখার কণা-তরঙ্গ-কারুকাজ থাকে, যা সাধারণত জাগতিক বস্তু-দৃশ্যে বা কমপোজিশনে গ্রাহ্য নয়। প্রচলিত প্রথাভাঙা এই অনিশ্চয়তাবদ্ধ তরঙ্গ-অভিঘাতই শিল্পের ব্যঞ্জনা দেয় আমাদের।

কবিতার বেলায়ও বস্তু ও ঘটনার কণা-তরঙ্গ ব্যবস্থাই প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল। কবিতার ভাষার অন্তরালে থাকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্র। এ সব ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্র কিছু আপেক্ষিক সত্য ও মিথ্যার অনুষঙ্গে ও ব্যঞ্জনায় আমাদের কবিতার উপলব্ধি দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো এক একক ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্র সবার জন্য গ্রাহ্য হবে এমনটা নয়। স্রষ্টা, সমালোচক ও পাঠকের চেতনার ভিন্নতর কোয়ান্টাম স্তর, একই চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উপস্থাপন করতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ‘সিঁদুর’ শব্দটি উচ্চারণে বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে ৭০০ Mu তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি একটা রঙের তরঙ্গ-চিত্র তুলে ধরার সাথে সাথে একজন সধবা নারীর ও তার পরিবেশের তরঙ্গ-চিত্ররূপ তুলে ধরবে এবং অনুষঙ্গ হিসেবে আসবে প্রেম, ভালোবাসা, ঈদিপাস এষণা ইত্যাদির মতো কিছু উপলব্ধি সংবেদ। সিঁদুরের এই একই চিত্র ইউরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শুধুমাত্র একটা রঙের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্র হিসেবেই গ্রাহ্য। বস্তুর জাগতিক মূল্য, প্রাধান্য ও বিস্তার তার নিজস্ব কণা-তরঙ্গ-চিত্রের কোয়ান্টাম-স্তর বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে এবং এর ফলে বস্তুর প্রকাশও মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে হয়। ধুলো, বালি, ঘাস, সুতো, চুল, বাতাস, মানুষ, বাঘ, মাছ, লাশ, গাঙ, দেয়াশলাই, জাহাজ ইত্যাদির মতো বস্তুসমূহের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ কোয়ান্টাম-স্তর সেফটিপিন, লাইটার, লোম, প্যাকেট, চেয়ার, লঞ্চ

ইত্যাদি থেকে অনেক উঁচু স্তরের। যে-কোনো সৃষ্টিতেই বস্তুর নিজস্ব কোয়ান্টামচিত্র তার নিজস্ব ওজন অনুযায়ী মানুষের মনে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায়। অবশ্য একজন স্রষ্টা যে-কোনো নিম্ন কোয়ান্টাম স্তরের বস্তুকেও আপেক্ষিক মিথ্যার কণা-তরঙ্গ যোগ করে উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরে নিয়ে যেতে পারেন। স্রষ্টার সৃষ্ট আপেক্ষিক মিথ্যার জগতে ৪৫০ Mu তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 'সবুজ পাতা', ৩৮০ Mu তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 'বেগুনি পাতা' হয়ে নতুন মাত্রার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন মিথ্, ঐতিহাসিক ঘটনা বা সমসাময়িক প্রধান ঘটনাসমূহের নিজস্ব কোয়ান্টাম ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-স্তর অনেক উঁচু, কারণ এ সব ঘটনা ও বিষয়ের প্রেক্ষাপটে, একটি বিরাট ও বিশাল ক্যানভাসে, আরও অনেক ঘটনা বা বিষয়ের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্র লুকিয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ যে, শুদ্ধ-কবিতা সব সময়ই সত্য ও মিথ্যাজাত ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্রের অদ্বিতীয় বিন্যাস এবং এ কারণে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক মিথ্যার মাত্রাও স্রষ্টা কবি কর্তৃক সঠিকভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত। অযথা মিথ্যার পর মিথ্যা সাজালে কিংবা প্রতীকের ওপর প্রতীক চাপালে, অনেক সময় কবিতার সৃষ্টি না হয়ে 'হিং-টিং-ছট' জাতীয় একটা মন্ত্রের সৃষ্টি হতে পারে।

নিচে আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটা কবিতার কিছু অংশের কোয়ান্টাম নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়া হল। এ বিশ্লেষণগুলো থেকে সৃষ্টি ও সাইবারনেটিকস্-এর কিছু সম্পর্ক উদ্ধার করা যেতে পারে।

ক : জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন কবিতার প্রথম দুই স্তবক:

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে-ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।
বধূ শুয়েছিল পাশে– শিশুটিও ছিল
প্রেম ছিল, আশা ছিল– জ্যোৎস্নায়– তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয় নি ঘুম বহুকাল– লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার
এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!

উক্ত কবিতার প্রথম স্তবকে 'থেনাটস' জাত একটি জাগতিক সত্য ঘটনার চিত্র-তরঙ্গ-রূপ, শব্দ-তরঙ্গ-রূপে (শোনা গেল) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় এবং প্রশ্ন জাগে, পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে-যাওয়া আলোহীন অন্ধকারে (চিত্র-তরঙ্গ-হীন) কেন একজন মানুষের মরার ইচ্ছে হয়। মানুষের সহজাত ইচ্ছায় যেহেতু আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে, সেহেতু এই প্রশ্নই পাঠকের মনে একটা আগাম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে পাঠককে আগামী কবিতায় নিয়ে যায়।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে এসে পাঠকের মনে দ্বৈত-উপলব্ধি কাজ করে। চিত্র-তরঙ্গরূপ জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ সংসারে (ব্যঞ্জনা) যেখানে স্ত্রী, সন্তান, প্রেম, আশা সবই উপস্থিত (চিত্র-

তরঙ্গরূপে গ্রাহ্য সংবেদ), সেখানে একজন মানুষের মরে যাবার ইচ্ছে কেন হয়! (আপাত অস্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ব্যঞ্জনা); 'তবু সে দেখিল কোন ভূত?' আর 'ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?'– এ প্রশ্নবোধক বাক্য দুটি বিভিন্ন প্রশ্নের সূচনা করে (অজানা আগামী দেশ-কাল-মাত্রা-সম্পর্কীয় ব্যঞ্জনা) এবং 'অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল' এ বাক্যের সাথে বিপরীতধর্মী সংঘাত সৃষ্টি করে পাঠকের মনে ব্যঞ্জনা আনে। 'লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার' এবং 'অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল'– এ বাক্যদ্বয় যুক্তিপূর্ণ (সহানুভূতি জাগায়) এবং উপরিউক্ত প্রশ্নবোধক বাক্যদ্বয়ের সাথে বিরোধীসত্তায় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে জীবনানন্দ দাশের এই কবিতায় প্রতিটি শব্দেরই ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ কোয়ান্টাম স্তর খুবই উঁচু এবং এ কারণে কোনো শব্দকেই অগ্রাহ্য করার উপায় থাকে না।

খ: আল মাহমুদের সোনালী কাবিন কবিতাগুচ্ছের চারটি লাইন:

মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণহারী যম,
বসন বিদায় করে নেচে ওঠো মরণের পাশে
নিটোল তোমার মুদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম।

আল মাহমুদের কবিতার উপরোক্ত লাইনগুলোতে শব্দের বিন্যাস ও চিত্র-তরঙ্গরূপ জাগতিক সত্যকে গ্রাহ্য করে না। মিথ্ ও অতিজাগতিক কিছু উপলব্ধির সত্য ও মিথ্যা দিয়ে সাজানো কবিতাটি একটা সত্যের স্বপ্নকে তুলে আনে। মৃত্যুর পিঞ্জর ভাঙ্গা, প্রাণপাখি, জীবনের স্পর্ধা, প্রাণাহারী যমের নত হওয়া, মৃত কুমারের পাশে সতী বেহুলার নৃত্য এবং বাঁচার নিয়ম পাল্টে দেওয়ার মতো শক্তিশালী বেহুলার নাচের মুদ্রার ইন্দ্রিয়-তরঙ্গরূপ বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিত্রে ও অনুষঙ্গে কবিতার ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। উদ্ধৃত-কবিতাংশের শেষ দু' লাইনে নারী বা প্রেমিকার প্রেমের শক্তিরূপ ও ঈদিপাস-এষণাজাত উপলব্ধিও প্রকাশ পায়। এ লাইনগুলোতে এমন কোনো শব্দ পাওয়া যায় না যার কোয়ান্টাম ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ স্তর নিচু মানের।

গ: নির্মলেন্দু গুণের কবিতা হুলিয়ার কিছু অংশ :

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর
চতুর্দিকে চিক্‌চিক করছে রোদ্দুর
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।
কেউ চিনতে পারে নি আমাকে
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম,
একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই আমাকে
জাপটে ধরতে চেয়েছিল,

একজন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে উঠেছিল
আমি সবকেই মানুষের সামিল চেহারার কথা
স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কিছু জাগতিক সত্য ও গ্রাহ্য বিষয়কে খুব সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রকাশ করার জন্য কবিতার প্রয়োজনই হয় না। প্রতিটি শব্দ ও বিষয়ের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গরূপ প্রাকৃতিক বস্তু-তরঙ্গের কোয়ান্টাম অবস্থার খুব কাছাকাছি এবং এর ফলে কবিতার ব্যঞ্জনা আমরা উদ্ধৃত লাইনগুলোতে পাই না। এছাড়া 'যখন', 'একজন', 'সবকেই', 'সমিল'– এই শব্দগুলোর কোয়ান্টাম ইন্দ্রিয় তরঙ্গ-স্তরও নিম্নমানের।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

সৃষ্টি কে করেন? এমন একটা সহজ অথচ জটিল প্রশ্নের উত্তরে আমরা খুব সহজেই বলি–শিল্পী সৃষ্টি করেন। শিল্পী কে? এ প্রশ্ন এলেই একটা বিশেষ্যপদ ব্যবহার করে কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষের চিত্রকেই ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ হিসেবে গ্রাহ্য করে নেই। বৈশ্বিক যে-কোনো প্রশ্নের উত্তরে যেহেতু জাগতিক যুক্তিই প্রাধান্য পায়, সেহেতু অনেক সময় আপাত সত্যের মুখোশ পরা একটা মিথ্যাকেই উপস্থাপন করি আমরা। কে শিল্পী?– এ প্রশ্নের সঠিক ও সত্য উত্তর খুঁজতে হলে সাধারণ-জ্ঞান-চিত্রে ভাসমান বিশ্বকে ডিঙিয়ে মানবিক সত্তার গহীনে উপস্থিত হতে হবে আমাদের। মানবিক চেতনা ও সত্তার কোয়ান্টাম স্তর এবং সত্তাবিজ্ঞানের দর্শন-সূত্রসমূহকে অবলম্বন করে আমরা বলতে পারি যে, জগৎ-পরিবৃত-সত্তায় অবস্থানকালে যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা ও ত্যাগের উপলব্ধিসহ যে মানবিক সত্তা উচ্চতর 'ডা-জাইন' কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থান নিয়ে, প্রচলিত প্রাকৃতিক যুক্তি ও গণিতকে নতুন মাত্রায় ও বিন্যাসে উপস্থিত করার মাধ্যমে, নতুন সৃষ্টি বা নতুন বিশ্ব রচনা করতে পারেন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই শিল্পী এবং তিনিই কবি।

একজন কবি-শিল্পী মৌলিকভাবে জগৎ-পরিবৃত-সত্তায় অবস্থান করলেও তার পতিত-সত্তার কোয়ান্টাম স্তর থাকে অনেক নিচে এবং উচ্চতর 'ডা-জাইন' স্তরসহ এক যন্ত্রণাময় বৈশ্বিক সময়ে অবস্থান করে, সৃষ্টিশীল সময় তৈরির মাধ্যমে নতুন নতুন সৃষ্টির কণাতরঙ্গব্যবস্থাকে উপস্থাপন করেন। একজন প্রকৃত শিল্পী-কবি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণার মাঝে থাকলেও জীবন ও পরিবেশ-সম্পর্কীয় তাঁর জ্ঞান-তেজ আহরণের প্রক্রিয়াকে সবসময়ই সচল রাখেন এবং এর ফলে নতুন জ্ঞান-তেজ সংশ্লেষণের মাধ্যমে একজন স্রষ্টার চেতনার কোয়ান্টাম স্তরও উচ্চতর ধাপে পৌঁছায়।

একজন কবি-শিল্পী যে সবসময় সৃষ্টিশীল থাকবেন এমনটা হয় না। ডা-জাইন-সত্তা এবং পতিত-সত্তার উত্থান-পতনের সাথে সাথে একজন স্রষ্টার সৃষ্টির মানও ওঠানামা করে। অনেক-সময় দেখা যায় একজন স্রষ্টা-কবি-শিল্পী জগৎ-পরিবৃত-সত্তায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছেন এবং এমন অবস্থায় তিনি পতিত-সত্তার অধীনে থেকে মাঝেমধ্যে শিল্প-সৃষ্টি করলেও, বেশিরভাগ সময়ে কিছু কারুকাজই করে থাকেন। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করে বোঝানো যেতে পারে। গত ৫ অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৯০ তারিখে দৈনিক বাংলার সাহিত্যপাতায় কবি আল মাহমুদের যে

সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে, তা ডা-জাইন-সত্তা ও পতিত-সত্তার অবস্থা বর্ণনা করার জন্য, উদাহরণ হিসেবে, খুবই উল্লেখযোগ্য। উক্ত সাক্ষাৎকারে কবিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– 'লেখক হিসেবে আপনি মত বদলেছেন অনেকবার। সাহিত্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের এই যে বিবর্তন, সেটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?' উত্তরে আল মাহমুদ বলেন– 'লেখক হিসেবে যতটা-না আমার মতের বদল হয়েছে তার চেয়ে বেশি বদলে যাচ্ছি মানুষ হিসেবে।' এখানে মানুষ হিসেবে বদলানোর বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য, কারণ মানুষ বদলানোর সাথে সাথেই তার ডা-জাইন-সত্তার কোয়ান্টাম স্তর বদলায়। প্যারাডাইম বা চেতনা-কাঠামোর পরিবর্তনের সময় ডা-জাইন-সত্তার কোয়ান্টাম স্তর উচ্চতর মানে উঠে গিয়ে একজন লেখকের স্বরূপ নতুন মাত্রায় প্রকাশ করলেও, মানুষ বদলানোর ঘটনা নিম্নগামী পতিত-সত্তার চিত্রকেই তুলে ধরে। একই প্রশ্নের উত্তরে আল মাহমুদ বলেন যে, এক সময় মানবজাতির মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কষ্টভোগ ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠা করে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন। এই কষ্টভোগ ও ত্যাগের সময় তাঁর মাঝে যে সৃষ্টির যন্ত্রণা ছিল, সে যন্ত্রণাই তাঁকে উচ্চতর ডা-জাইন কোয়ান্টাম স্তরে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমরা তাঁর কাছ থেকে 'লোক লোকান্তরে', 'কালের কলস' ও 'সোনালী কাবিন'-এর মতো সৃষ্টি পেয়েছিলাম। বর্তমানে (১৯৯০ সালে) শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালক এবং 'কবিতা কেন্দ্রের' সহ-সভাপতি আল মাহমুদের মাঝে আগের মতো যন্ত্রণা-উৎকণ্ঠার উচ্চতর ডা-জাইন-সত্তা হয়তো-বা নেই এবং এর ফলেই জন্ম নিচ্ছে 'বখতিয়ারের ঘোড়া' আর 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস'। কবি শামসুর রাহমানের সৃষ্টির দিকে তাকালেও তাঁর ডা-জাইন কোয়ান্টাম স্তরের উত্থান-পতনের লক্ষণ খুঁজে পাব, যদিও তা ব্যাপক নয়। কবি শহীদ কাদরীর বেলায় ডা-জাইন-সত্তা ও পতিত-সত্তার উত্থান পতনের বিষয়টি অবশ্যই অনেক বেশি স্পষ্ট।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোনো বিশ্বাস ডা-জাইন-সত্তাকে পতিত অবস্থায় নেয় না, এমনকি তা অন্ধবিশ্বাস হলেও নয়। অনেক সময় বিশ্বাসই মানুষকে উচ্চতর ডা-জাইন স্তরে পৌঁছুতে সাহায্য করে। ডা-জাইন-সত্তার পতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে জগৎ-পরিবৃত-সত্তার মিথ্যা-বিষয়ীগততায় একজন মানুষের বিলীন হওয়া। মানুষ বদলালে সৃষ্টি বদলাবে– এ কথা অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যায় না।

কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক কতিপয় সিদ্ধান্ত

কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্বের উপস্থাপনা করতে গিয়ে বস্তুর কণা-তরঙ্গ-রূপ, মানবিক চেতনা ও সত্তার কোয়ান্টাম স্তর, জযন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সৃষ্টির রূপ-স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয় তার ভিত্তিতে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ হতে পারে নিম্নরূপ:

এক :

বস্তু, ভাষা ও ধ্বনিনির্ভর অনিশ্চয়তাবদ্ধ যে মানবিক সৃষ্টি প্রচলিত প্রাকৃতিক কিংবা জাগতিক কাঠামোর বাইরে অবস্থান ক'রে কোনো এক শৃঙ্খলিত কণা-তরঙ্গ-ব্যবস্থায় মানুষের মনে চরম ও

পরম সত্য-সম্পর্কীয় অতিপ্রাকৃতিক সুন্দর কিংবা অসুন্দরের উপলব্ধি দেয়, তাকেই আমরা শিল্প বলব।

দুই :

জগৎ-পরিবৃত-সত্তায় অবস্থানকালে যে মানবিক সত্তা যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে উচ্চতর ডা-জাইন কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থান করেন এবং প্রচলিত প্রাকৃতিক যুক্তি ও গণিতকে নতুন তরঙ্গমাত্রায় ও বিন্যাসে উপস্থাপিত করে নতুন সৃষ্টির অবয়বে, নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে চান, তিনিই স্রষ্টা, কবি ও শিল্পী।

তিন :

জাগতিক যে-কোনো সৃষ্টিই আসলে বস্তুউৎসারিত কণা-তরঙ্গের একরকম প্রচলিত প্রথা-ভাঙা বিন্যাস এবং এ কারণে সৃষ্টির কণা-তরঙ্গ-রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সৃষ্টির সত্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

চার :

সৃষ্টিবিষয়ক নন্দনতাত্ত্বিক উপলব্ধির পেছনে সৃষ্টি-উৎসারিত ইন্দ্রিয়-তরঙ্গের ভূমিকাই প্রধান এবং এ কারণে মানুষের জয়তন্ত্র-সংনিয়ন্ত্রণ ও তদ্‌উৎসারিত উপলব্ধি সংবেদকে শিল্প বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে। সৃষ্টির তরঙ্গ-চিত্রের সাথে মানবিক জৈব-যন্ত্রের যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে তা বিভিন্ন গাণিতিক মডেলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোনো এক নির্দিষ্ট প্যারাডাইমে যে শিল্প সৃষ্টি হয়, তার মৌলিক তরঙ্গ-চিত্র মানুষের স্বনালী ও অনালীগ্রন্থির ক্ষরণ ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে কিভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য পরীক্ষাগারে শিল্প-স্রষ্টা, শিল্প-সমালোচক, শিল্পরসিক এবং বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায়, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে, কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক গাণিতিক মডেল উপস্থাপন করা যায়।

পাঁচ :

মানবিক কোয়ান্টাম স্তর যেহেতু সৃষ্টির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, সেহেতু স্রষ্টা ও সমালোচকের ‘ডা-জাইন’ কোয়ান্টাম স্তর কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন, অন্যথায়, সৃষ্টি বিষয়ক নান্দনিক উপলব্ধি ভুলমাত্রায় বিশ্লেষিত হবার সম্ভাবনাই থাকবে বেশি।

ছয় :

স্রষ্টার সমসাময়িক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে স্রষ্টার কোয়ান্টাম স্তর সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সম্ভব এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির কোয়ান্টাম স্তরভিত্তিক মূল্যায়নই সৃষ্টি বিষয়ক সঠিক তথ্য উপস্থাপন করবে।

সাত :

স্রষ্টা ও সৃষ্টির কোয়ান্টাম স্তর নির্ধারণ করার জন্য স্রষ্টার চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা প্রয়োজন এবং এ কারণে স্রষ্টার লিখিত সৃষ্টি-ভাবনা ও সমালোচক কর্তৃক গৃহীত স্রষ্টার সাক্ষাৎকার ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একজন সৎ-সমালোচককে স্রষ্টার কোয়ান্টাম স্তর নির্ধারণ করার জন্য সৃষ্টি বিষয়ক তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করার সাথে সাথে মনস্তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানও লাভ করতে হবে। স্রষ্টার (?) ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা, অহংবোধ ইত্যাদি সম্পর্কেও যথাযথ বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন। স্রষ্টার কোয়ান্টাম ইতিহাস (প্রথম সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে বর্তমান পর্যন্ত) বিশ্লেষণ করলে স্রষ্টার 'ডা-জাইন' ও 'ডাসমান' স্তর নির্ধারণ করা সম্ভব এবং একজন সমালোচক স্রষ্টার জীবনপ্রণালীর সাথে সম্পৃক্ত সৃষ্টির উত্থান-পতনও নির্ধারণ করতে পারবেন।

অনুচিন্তন

কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে উপস্থিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। লেখকের সীমিত জ্ঞানের জন্য অনেক বিষয়ই হয়তো-বা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব-সম্পর্কীয় মন্তব্য বক্তব্য বর্তমান চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমে গ্রহণযোগ্য হবেই, এমন ধ্রুব ধারণাও লেখকের নেই, তবে নন্দনতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার এ প্রচেষ্টা কিছু আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা সৃষ্টি ও স্রষ্টার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব এমন স্বপ্ন দেখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সমস্যা, সমস্যার সমাধান ও ভাষাদর্শন

পূর্বকথা

আমাদের পরিচিত এই বিশ্বজগতের জন্মমুহূর্ত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কিছু গণিতনির্ভর সমস্যার। যতদিন জীবন আসেনি পৃথিবীর, ততদিন প্রকৃতি নিজেই জগৎসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছে তার নিজস্ব ভাষায়, গণিতযুক্তিকে গ্রাহ্য করে। এ সময় বিভিন্ন মৌলকণা সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন মৌলিক বস্তু, বস্তুপরমাণু যোজনী-গণিতের সাথে গণিত মিলিয়ে, তার নিজস্ব যোগ-বিয়োগের চরিত্র নির্ধারণ করে, মিশে গেলে অন্য কোনো পরমাণুর সঙ্গে যৌগ গড়ার তাগিদে। কিংবা এমনও বলা যায়, এরকম যোজনীনির্ভর যৌগের সৃষ্টি হয় ভারসাম্যহীন একটা সমস্যার সমাধান করার জন্যেই।

প্রাকৃতিক শক্তির কোয়ান্টামগুচ্ছ তার দেশ-কালকেন্দ্রিক বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন পার্থিব সমস্যা, আবার প্রাকৃতিক কারণেই কোনো এক নির্দিষ্ট গণিতকে গ্রাহ্য করে সমাধান হয়েছে সেই সমস্যাটির। আজো এই পৃথিবীতে আমরা যে ভৌত পরিবর্তন লক্ষ করি তার প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে বিভিন্ন পর্যায়ের গাণিতিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া। পাহাড়, নদী, সাগর, মহাসাগর, খাল, বিল এ সবের অবস্থান ও বিবর্তন এবং বৃষ্টি, বজ্র, ভূমিকম্প ইত্যাদির সৃষ্টি ও বিনাশের পেছনে কাজ করছে হরেক রকম গণিতসূত্র। এই গণিতসূত্রকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হচ্ছে বিশ্বজগৎ।

জীবন ও ভাষা

বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক বস্তুর গণিতকে নির্ভর করে পৃথিবীতে হঠাৎ যখন জীবন এল, তখন থেকেই সৃষ্টি হল এক নতুন ধরনের জটিল জৈবগণিতের। আর জীবনের এই গণিতকে অবলম্বন করেই জন্ম নিল জীবন প্রকাশের এক অসাধারণ উপাদান– ভাষা ও ভাষার যুক্তি এবং তা অবস্থান নিল জীবনের অবচেতন চেতনায়। জৈবগণিত-নির্ভর ভাষা ও ভাষার যুক্তি প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবেই বন্দি হল জীবন-কোষে, ক্রোমোজমের অনন্ত কোয়ান্টাম-নকশায়।

জীবনের সাথে যেহেতু জন্ম ও মৃত্যু এবং জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী ক্রিয়া-বিক্রিয়া-কেন্দ্রিক দেশ-কাল অবস্থান করে, সেহেতু বংশ-বৃদ্ধি, খাদ্য-গ্রহণ, পরিবেশ-সমন্বয় ইত্যাদির মতো বিষয় নিয়েও সৃষ্টি হল বিভিন্ন সমস্যার আর এ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে করতেই জীবন বিবর্তিত হয়ে ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হল উন্নততর জৈব-জীবন সংগঠনে। উন্নতর জীবন-সংগঠনে উপস্থিত হবার পর ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণে যে-জীবন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেনি, কিংবা সমাধান করতে পারেনি বৈশ্বিক সমস্যার, সে জীবনের মৃত্যু হয়েছে কোনো এক নির্দিষ্ট দেশ-কাল-কাঠামোতেই। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসোরাস নামের জীবনের কথাই ধরা যাক। প্রকৃতি ও জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং প্রাকৃতিক সমস্যা-সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত জড় ও জৈব ভাষার যৌক্তিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ক্রিটেশিয়াস যুগে ডাইনোসোরাস প্রজন্ম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে এখনো জীবন শুধুমাত্র সমস্যা সমাধান করে বাঁচার জন্যই ভাষা ব্যবহার করে। এখনো একটি পাখি প্রজননের কালে সুর ধরে গান গায়, ময়ূর পেখম তুলে নাচে, আর একটি বানর বাঘ দেখলেই আমলকি গাছে ডাল ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে সাবধান করে দেয় গোত্রের সাথিদের। বানরের অঙ্গভঙ্গি আর শব্দনির্ভর ভাষা প্রাকৃতিক কারণে হরিণও বুঝতে পারে। বানরের ভাষাকে বুঝে নিয়ে হরিণও পালায় আমলকির লোভ সামলে নিয়ে। একটি অন্ধ গাছ আলোর ভাষা বোঝার ফলেই এঁকেবেঁকে উঠে যায় আকাশের দিকে, অগ্রাহ্য করে আশেপাশের অন্ধকারের পরিবেশ। যে জীবন ভাষা বোঝে না কিংবা যার ভাষাকে জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, প্রকৃতি তার জন্য নিয়ে আসে মৃত্যুর অভিশাপ। মৃত লাশ জীবনের সমস্যা সমাধান না করেই তৈরি করে জড়ের গণিত।

ইন্দ্রিয় ও মানুষের ভাষা

হোমোসেপিয়েস্-সেপিয়েনস্ নামের মানব-প্রজন্মও বিভিন্ন দেশ-কালে বহুমাত্রিক যুক্তিকে গ্রাহ্য করে সমস্যার সমাধান করতে করতে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন মাত্রার জাগতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষও ব্যবহার করেছে ইন্দ্রিয়নির্ভর দেহের ভাষা, চোখের ভাষা, হাতের ভাষা, মুখের ভাষা, যৌন ভাষা আর লিখিত ভাষাচিহ্নকে। ভাষা শুধুমাত্র মুখের হয় আর লিখিত হয়– এ ধারণাও এখন আর সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। দার্শনিক হাইডেগারের বক্তব্য উল্লেখ করে গুটেনপ্লান তার বই Mind and Language- এ বলেন:

What is new and interesting in Heidegger is that he regards meaning as being found in ..... all kinds of human activity.

মানুষের ইন্দ্রিয়নির্ভর যে-কোনো কর্মকাণ্ডই যেহেতু অর্থবোধক ভাষা হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে, সেহেতু জাগতিক যে-কোনো সমস্যা ও তার সমাধান মানবিক ইন্দ্রিয়কে গ্রাহ্য করেই আবর্তিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জন্মেও পর মানুষ তার ছয় ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, মুখ, যৌনাঙ্গ ও ত্বক) দিয়েই পরিবেশ-পৃথিবীর কণাতরঙ্গচিত্রকে ভাষাচিত্ররূপে মস্তিষ্ক-নিউরোনে সংরক্ষণ করে থাকে এবং এ ধরনের জৈবিক কর্মকাণ্ডে ক্রোমোজমবাহিত সহজাত প্রবৃত্তির ভূমিকাও থাকে প্রত্যক্ষভাবে। অহংসম্পর্কীয় চিন্তাভাবনা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণে মানুষ একজন মানুষ তার যৌনাঙ্গকেও একটি পৃথক ইন্দ্রিয় হিসেবে প্রাধান্য দেয় এবং এ কারণে ভাষাকেন্দ্রিক সমস্যা ও সমাধানের মানুষের যৌনাঙ্গকে একটি পৃথক ইন্দ্রিয় হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ফ্রয়েড, ইয়ং, পাবলভ, লাকাঁ প্রমুখের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে ইন্দ্রিয় হিসেবে যৌনাঙ্গকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

সমকালীন ভাষাতত্ত্ব

মানুষের ভাষাসম্পর্কিত বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গেলেই সস্যুরের ভাষাদর্শন আলোচনা করতে হয়। সস্যুর মানুষের ভাষার অন্তর্গত উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ তার নিজস্ব অবচেতনে (ক্রোমোজমের কোয়ান্টাম নকশাকেন্দ্রিক) ভাষাসম্পর্কিত যে সহজাত নিয়ম ও যুক্তি ধারণ করে, তাকে সস্যুর ল্যাগ (Langue) হিসেবে চিহ্নত করেছেন। অবচেতনে রক্ষিত ভাষার যুক্তি যখন ভাষাচিহ্ন হিসেবে উচ্চারিত হয় কিংবা লিখিতরূপে প্রকাশ পায় তখনকার অবস্থাকে সস্যুর প্যারোল (Parole) হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভাষার জৈবিক সংগঠন বা Langue আর প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া বা Parole যৌথভাবে ভাষাব্যবস্থাকে মূর্তরূপে মানবসমাজে উপস্থিত করে থাকে, আর এর ফলেই জীবন ও বিশ্বের অবস্থান মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

ধ্রুপদী দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভাষা ছিল সময় ও সভ্যতার সাথে বেড়ে ওঠা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার, যেখানে প্রতিটি শব্দের বিপরীতে কোনো নির্দিষ্ট বৈশ্বিক বস্তু বা বিষয়ের অবস্থান কল্পনা করা হয়। ধ্রুপদী ভাষাদর্শনের আলোকে ভাষাচিহ্নের বিপরীতে বস্তু বা বিষয়ের অবস্থানকে নিম্নোক্ত সমীকরণে প্রকাশ করা যায়:

ভাষা-প্রতীক বা শব্দ = বস্তু বা বিষয়

সস্যুর তাঁর ভাষাতত্ত্বে উপরের সমীকরণটি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন, তিনি মনে করেন, কোনো নির্দিষ্ট ভাষাপ্রতীক প্রত্যক্ষভাবে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে উপস্থাপন করে না। প্রকৃতপক্ষে একটি ভাষাচিহ্ন কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের দ্যোতক হিসেবে উপস্থিত হয় এবং দ্যোতিত হয়ে বস্তু বা বিষয়কে অর্থবোধক করে তোলে। অর্থাৎ একটি ভাষাচিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান অনেকটা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। ভাষাচিহ্ন ও ভাষা-অর্থ-বিষয়ক সস্যুরের সমীকরণটি এভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব:

$$\text{ভাষাচিহ্ন} = \frac{\text{দ্যোতক}}{\text{দ্যোতিত}}$$

সস্যুরের তত্ত্ব অনুসারে ভাষাচিহ্নের দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান নির্ধারণ করা গেলেও কোনো বস্তু বা বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা যায় না এবং এর ফলে মানুষের ব্যবহৃত ভাষা কোনো এক সুনির্দিষ্ট কাঠামোকে কেন্দ্র করে ভাষাচিহ্ন দ্যোতক ও দ্যোতিতের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা সম্পর্ক হিসেবেই অবস্থান করে।

দার্শনিক জাক দেরিদা সস্যুরের ভাষাদর্শন স্বীকার করে নিয়ে তত্ত্বটির বিস্তার ঘটান। দেরিদার ধারণায় কোনো একটি ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন ভাষাচিহ্নের দেশ-কাল-কেন্দ্রিক তুলনামূলক অবস্থান-বিশ্লেষণই মানুষকে জীবন ও জগৎসম্পর্কিত অর্থ প্রদান করে এবং এ অবস্থায় পরিবর্তনশীল দ্যোতকের ক্রিয়া থাকে মুখ্য। অহংকেন্দ্রিক মানবিক উপলব্ধি, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দ্বৈততাকে কেন্দ্র করে তৈরি করে এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ এবং এর ফলে অহং-কে কেন্দ্র করে ভাষাচিহ্নের দ্যোতনা দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বিভিন্ন দ্যোতক সৃষ্টির মাধ্যমে অসীমের দিকেই প্রবহমান থাকে। বিশেষভাবে লিখিত ভাষার বেলায় ভাষার এই মুক্তক্রীড়া (Free play of Language) সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। ভাষার মুক্তক্রীড়ার প্রেক্ষাপটে কাজ করে দেশ ও কালকেন্দ্রিক যতিভেদ বা Differance। দার্শনিক জাক লাকাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষাচিহ্নের অর্থ বিভিন্ন দ্যোতকের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলই উপলব্ধি করা সম্ভব। আর দ্যোতিতের উপস্থিতি থাকে শুধুমাত্র দ্যোতকের কারণ হিসেবে। সস্যুর দোতক ও দ্যোতিত-কে পৃথকভাবে সনাক্ত করলেও, লাকাঁ শুধুমাত্র দ্যোতকের মাঝেই কিছু বিভক্তি-রেখা টানতে চান; যার ফলে, ভাষাচিহ্নের বিপরীতে অবস্থানরত দ্যোতক-বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে মানুষের অবচেতনে বিভিন্ন অর্থ বা দ্যোতনা আনতে পারে।

ভাষার সমস্যা সবসময় অহংকেন্দ্রিক, কারণ প্রতিটি মানব-একক তার দেশ ও কাল গ্রাহ্য করে একই ভাষাচিহ্নের অর্থ বিভিন্ন মাত্রায় গ্রহণ করতে পারে। একই ভাষাচিহ্নের বহুমাত্রিক অর্থ কিভাবে উপস্থিত হয় তা সস্যুর, দেরিদা ও লাকাঁর দর্শন থেকে উদ্ধার করা গেলেও বিষয়টির কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এখনো কোনো ভাষাতত্ত্বে সম্ভবত উল্লেখ করা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচিন্তাকে সমসাময়িক ভাষাতত্ত্বের সাথে যোগ করে এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

সস্যুরের সূত্র অনুসারে ভাষাচিত্রের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো অবস্থান করলেও, ভাষার অর্থ-উদ্ধার-প্রক্রিয়ায় মধ্যবর্তী পর্যায়ে আরও কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়া থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আর এ সম্ভাবনা অবস্থান করে দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যবর্তী স্থানে, মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়-কণাতরঙ্গের স্থাপন/প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ/বিশ্লেষণ ও গ্রহণ/বর্জনের কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। সস্যুরের সূত্র গ্রাহ্য করে তাই ভাষাচিহ্ন, দ্যোতক ও দ্যোতিতকে নিচের সমীকরণে প্রকাশ করা যায়:

দ্যোতক

....

ভাষাচিহ্ন = স্থাপন / প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ / বিশ্লেষণ / গ্রহণ / বর্জন

....

দ্যোতিত

উপরিউক্ত সমীকরণ অনুসারে ভাষাচিহ্ন দ্যোতক হিসেবে মানব-মস্তিষ্ক-নিউরোনে বিভিন্ন দর্শন-যান্ত্রিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায়, যার মাঝে স্থাপন/প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ/বিশ্লেষণ ও গ্রহণ/বর্জন ক্রিয়াই থাকে মুখ্য। দ্যোতকসৃষ্ট এই ইন্দ্রিয়-কণাতরঙ্গ-ভিত্তিক কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক ক্রিয়া যথার্থরূপে মস্তিষ্কে পূর্ব-দ্যোতিত কিংবা পূর্ব-অঙ্কিত বিভিন্ন কণা তরঙ্গ-চিত্ররূপের সাথে স্থাপন প্রতিস্থাপন (Super imposition) সম্ভব হলেই কেবল দ্যোতক দ্যোতিত হয়ে ভাষাচিহ্নের অর্থ প্রদান করে। আমাদের মস্তিষ্কে যখন বৈশ্বিক বিষয় বা বস্তুসম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়-কণাতরঙ্গ-চিত্ররূপ কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক বিন্যাসে অবস্থান করে না, তখন সে বিষয় বস্তু বা ঘটনার ভাষাচিহ্ন শৃঙ্খলও আমাদের জন্যে হয়ে ওঠে অর্থহীন এবং এ-অবস্থায় সৃষ্টি হয় অধিবিদ্যাজাত (Metaphysical) উপলব্ধির। যে-দ্যোতক স্থাপন/প্রতিস্থাপনযোগ্য নয়, তা সমান্তরালভাবে বিস্তার লাভ করে তৈরি করে দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বিভিন্ন মাত্রার দ্যোতকের এবং তা অহংচালিত বিভিন্ন মাত্রার অর্থ নিয়েই উপস্থিত হয় অধিবিদ্যার মুখ্য উপাদান হয়ে। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধি নিঃসন্দেহে মূল্যহীন এবং এ ধরনের মূল্যহীন উপলব্ধিই জন্ম দেয় নিত্যনতুন সমস্যার।

ধ্রুপদী ধারণা অনুযায়ী ভাষা শোনা, ভাষা লেখা, ভাষা পড়া ও ভাষা দেখা এক ও অভিন্ন ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হলেও, বাস্তবে ঘটনাগুলো ঘটে বিভিন্ন মাত্রায়। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভাষাকেন্দ্রিক শোনা, লেখা, পড়া ও দেখার কার্য সম্পাদিত হয় মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে এবং মস্তিষ্কের সমন্বয় কেন্দ্রে এসে ভাষাকেন্দ্রিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া,

স্থাপন/প্রতিস্থাপন/ সংশ্লেষণ/বিশ্লেষণ ও গ্রহণ/বর্জনের মাধ্যমে অর্থ-উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। বিষয়টিকে নিচে দেখানো হয়েছে বিস্তারিতভাবে:

মানবমস্তিষ্কের ক্রিয়াপদ্ধতি

ভাষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন ক্রিয়া (শোনা, পড়া, লেখা ও দেখা) যেহেতু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থানে সম্পাদিত হয়, সেহেতু মস্তিষ্কের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহনের সময় কিংবা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্থানান্তরের সময় কিছু পরিবহনবিচ্যুতি (Transmission Loss) ঘটতে পারে। লেখা, পড়া, দেখা ও শোনা যেহেতু অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম, সেহেতু Transmission Loss বা পরিবহনবিচ্যুতির কারণে একই ভাষা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে উপস্থিত হতে পারে। এমন অবস্থায় দেরিদীয় বিনির্মাণ (Deconstruction) প্রচণ্ডভাবে কাজ করতে পারে, এরকম ভাবা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে বৈশ্বিক বস্তু, বিষয় ও ঘটনাবিষয়ক ইন্দ্রিয়নির্ভর কণাতরঙ্গ-চিত্ররূপ অবস্থান করলেও, প্রতিটি মানুষের জন্য তা একই মাত্রার কোয়ান্টাম-বিন্যাসে থাকবে এ রকম হয় না এবং এর ফলে একই বস্তু, ঘটনা বা বিষয়ের ভাষাচিহ্ন-সৃষ্ট দ্যোতিত-অর্থ দেশ-কাল গ্রাহ্য করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পায়। দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন বিষয়টি উপলব্ধি করে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Tractatus Logico-Philosophicus-এ বলছেন: "The World is my world: this manifest in the fact that the limits of Language (of that language which alone I understand) mean the limits of my world..... The world and life are one..... I am my world".

একজন মানুষের মস্তিষ্ক-নিউরোনে কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কিত কণাতরঙ্গচিত্ররূপ অঙ্কিত বা লিপিবদ্ধ না থাকলে সে ঐ বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে কোনো অর্থবোধক বা যৌক্তিক বর্ণনা বা বিবরণ দিতে পারে না। এমন অবস্থায় সে যদি তার অহংসত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু বলতে চায়, তবে তা নিঃসন্দেহে কিছু অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধিকে উপস্থাপন করবে এবং তা কোনো

অবস্থাতেই বাস্তবতাকে স্পর্শ করবে না। এরকম বাস্তবতাবর্জিত বক্তব্য, বিবরণ বা উপস্থাপনার জন্যেই আমরা সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখি। বিষয়টি কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক কোনো এক ব্যক্তিকে (যার জন্ম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর হয়েছে) 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হল, কিন্তু তাকে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল না। এমন অবস্থায় দেখা যাবে যে ঐ ব্যক্তি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' শব্দযুগলের অর্থ কোনো অর্থবোধক ও নির্দিষ্ট উপলব্ধি নিয়ে উদ্ধার করতে পারছে না, বরং তার নিজস্ব অহং-কে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়টিকে বর্তমান কালে গ্রহণযোগ্য কোনো এক বিশেষ মাত্রায় বিশ্লেষণ করতে চাইছে। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটি' বাক্যটিও প্রকৃত প্রেক্ষাপট উন্মোচন ছাড়া সম্পূর্ণভাবে অর্থবোধক নয়। আমাদের দেশে যেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই 'ঘাতক' ও দালাল' অবস্থান করেন, সেহেতু বাক্যটিকে অর্থবোধক করতে হলে একাত্তরের দেশ ও কালকে উপস্থাপন করতে হবে সবার আগে। তাছাড়া 'নির্মূল' শব্দটির ব্যঞ্জনাও মানবিক কারণে অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 'নির্মূল' শব্দটির দ্যোতিত অর্থ 'হত্যা' ও 'ধ্বংসে'র সাথে সম্পর্কযুক্ত। একাত্তরের সব ঘটনা জানার পরই বর্তমান প্রজন্মের সবাই ঘাতক ও দালাল প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতে পারে, এ যুক্তি হয়তো-বা গ্রহণযোগ্য। এ যুক্তির বিপরীত থেকে যারা শুধুমাত্র 'ভাষার খেলা'য় মত্ত থাকবেন, তাঁরা ভাষাকেন্দ্রিক সমস্যা সৃষ্টি করেই এগিয়ে যাবেন সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশ-কালের বর্তমানে জয়/জিন্দাবাদ, বাঙালি/বাংলাদেশী, প্রগতিশীল/প্রতিক্রিয়াশীল, ভারতবিরোধী/ ভারতপন্থী ইত্যাদির মতো অনেক ভাষাকেন্দ্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে (জল/পানি, স্নান/গোসল, নমস্কার/সালাম ইত্যাদি আগেই ছিল) এবং এসবের যৌক্তিক বিশ্লেষণ না করতে পারলে সমস্যা বাড়তেই থাকবে, এটাই বাস্তব। কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে, আংশিক জেনে, কাউকে বিস্তারিত না জানিয়ে কিছু বলতে গেলেই যেহেতু সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেহেতু সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু না-বলাই ভালো। বিষয়টি দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন এবং তিনি বলেছেন: 'What we can not speak about we must consign to silence'.

সামাজিক জীব হিসেবে আমরা জীবন যাপন করি এক নরম তুলতুলে ভাষার বিশ্বে, যেখানে প্রতিটি সমস্যা ও তার সমাধান ভাষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ভাষার এই মুক্তক্রীড়া থেকে যদি আমরা কিছুটা হলেও বাঁচতে চাই তবে যে-কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনার যৌক্তিক/গাণিতিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার শরণাপন্ন হতে হবে আমাদের। কোনো বিষয় বা ঘটনার অর্থপূর্ব বিবরণ কিভাবে আমাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তা বোঝানোর জন্য আলেক্সান্ডার জিনিস-এর উপন্যাস Hermes and the Golden Thinking Machine থেকে তুলে ধরা যাক:

> 'Where do we start?"
> He said, resigned, "With representation".
> "Representation?" She looked disappionted.

He started solemnly, “Representation is a set of con-ventions to make description with”.

She appeared puzzled.

He continued, “To solve any problem, whether with our mind or with a machine, we need descriptions. They capture information on the basis of which you can act appropriately. To provide an answer to a question, to reason how to carry out a task, you need to have a good description of where you are, where you aim, what lies between the two, how many ways you have to go over the gap. Good descriptions make better solutions.”(p 42)

কতিপয় সিদ্ধান্ত

সমস্যা, সমস্যার সমাধান ও ভাষাদর্শন বিষয়ক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি:

০১. বিশ্বজগতের জন্মমুহূর্ত থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন গণিতনির্ভর সমস্যার এবং প্রকৃতি তার নিজস্ব গাণিতিক ভাষায় সমাধান করছে সমস্যাসমূহের ।

০২. জীবনের আবির্ভাব সৃষ্টি করেছে নতুন এক জটিল জৈবগণিত এবং গণিতনির্ভর জীবনকে প্রকাশ করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ভাষা ও ভাষার যুক্তি, প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে ।

০৩. জৈবগণিতনির্ভর ভাষা ও ভাষার যুক্তি জীবন-উন্মেষের সময় থেকেই বন্দি হয়েছে জীবন-কোষে, ক্রোমোজমের অন্তস্থ কোয়ান্টাম নক্‌শায় ।

০৪. জাগতিক বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যার সমাধান আবর্তিত হয় জীবনের ভাষাকে কেন্দ্র করেই ।

০৫. প্রকৃতি ও জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং প্রাকৃতিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে জীবন সব সময় ভাষাকে ব্যবহার করে এবং এ জন্য ভাষাকে প্রজন্ম-উত্তরণের সহায়ক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ।

০৬. ভাষা ও ভাষার যুক্তি মানবিক ইন্দ্রিয়কে নির্ভর করে বিকশিত হয় এবং মানবিক ইন্দ্রিয়নির্ভর যে-কোনো কর্মকাণ্ড ভাষাব্যবস্থারই অন্তর্গত বিষয় ।

০৭. অহং-এর অস্তিত্ব স্থাপন ও প্রকাশের জন্য যৌনাঙ্গের ভূমিকা মুখ্য এবং এজন্য ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় হিসেবে যৌনাঙ্গকে চিহ্নিত করা যায় ।

০৮. ভাষা ও ভাষার যুক্তি প্রকাশে যৌনইন্দ্রিয়ের ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে ।

০৯. সস্যুর বর্ণিত Langue ক্রোমোজমের কোয়ান্টাম-নক্‌শায় অবস্থান করে এবং Parole হল Langue-প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া।

১০. দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যবর্তী পর্যায়ে মানবমস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়-কণাতরঙ্গের স্থাপন/প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ/বিশ্লেষণ ও গ্রহণ/বর্জন ক্রিয়া থাকে ক্রিয়াশীল এবং এ জন্যে সস্যুরের ভাষাচিহ্ন সমীকরণ নতুনভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব:

দ্যোতক

....

ভাষা-চিহ্ন = স্থাপন/ প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ/ বিশ্লেষণ,গ্রহণ/ বর্জন

....

দ্যোতিত

১১. স্থাপন/প্রতিস্থাপন, সংশ্লেষণ/বিশ্লেষণ ও গ্রহণ/বর্জন ক্রিয়ার জন্যই মানবমস্তিষ্ক ভাষা-চিহ্নের অর্থ উদ্ধার করতে পারে ।

১২. প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে অঙ্কিত/রক্ষিত ভাষার ইন্দ্রিয়-কণাতরঙ্গচিত্ররূপ একই কোয়ান্টাম নক্‌শার হয় না এবং এর ফলে একই ভাষাচিহ্ন বা ভাষাচিহ্ন-শৃঙ্খল অহং-এর দেশ-কালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাত্রায় দ্যোতিত হয় ।

১৩. ভাষাকেন্দ্রিক দেখা, শোনা, পড়া ও লেখা মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বিক্রিয়া ঘটায় এবং মস্তিষ্কের সমন্বয়কেন্দ্রে এসে অর্থ উদ্ধার করে। মস্তিষ্কের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে ভাষার কণাতরঙ্গ-চিত্ররূপ পরিবহনের সময় কিংবা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্থানান্তরের সময় ভাষাচিহ্নসৃষ্ট অর্থের পরিবহন বিচ্যুতি (Transmission Loss) ঘটে।

১৪. জাক দেরিদার ভাষাদর্শনে উল্লেখিত Differance এবং Free play of Language-এর কারণ হল অহং-এর মস্তিষ্কে অঙ্কিত/রক্ষিত দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বিভিন্ন মাত্রার ভাষা-কণা-তরঙ্গ-চিত্ররূপ এবং পরিবহন বিচ্যুতি (Transmission Loss)।

১৫. মানবমস্তিষ্কে কোনো ভাষাচিহ্ন স্থাপন/প্রতিস্থাপনযোগ্য না হলে তা থেকে সৃষ্ট হয় অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধির ।

১৬. কেবলমাত্র যৌক্তিক/গাণিতিক বর্ণনাই ভাষাসৃষ্ট সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও করতে পারে।

১৭. বহুমাত্রিক ভাষাচিহ্নের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও পরিবহন-বিচ্যুতির জন্য অধিবিদ্যার হাত থেকে এ প্রজন্মের মানুষ সম্পূর্ণভাবে কখনো মুক্তি পাবে না।

১৮. হোমেসেপিয়েনস্-সেপিয়েনস্-এর অগ্রগামী প্রজন্ম যান্ত্রিক/গাণিতিক ভাষায় যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং তখন অধিবিদ্যাজাত সমস্যাও হ্রাস পাবে।

সৃষ্টির স্বরূপ ও আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ

যে মানবিক সৃষ্টি প্রচলিত প্রাকৃতিক কাঠামোর বাইরে অবস্থান নিয়ে, কোনো এক একক ও শৃঙ্খলিত কণা-তরঙ্গ-ব্যবস্থায় মানুষের মনে চরম ও পরম সত্যসম্পর্কীয় অতি প্রাকৃতিক সুন্দর কিংবা অসুন্দরের উপলব্ধি দেয়, তাকেই আমরা শুদ্ধশিল্প হিসেবে গ্রাহ্য করব। প্রচলিত প্রাকৃতিক সংগঠনে আলো ও শব্দের নিহিত কণাতরঙ্গরূপ এক অনন্ত ও অসীম গাণিতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন চিত্র ও সঙ্গীতের সমার্থক উপলব্ধি-সংবেদ তৈরি করে; কিন্তু শুধামাত্র প্রকৃতিজাত হওয়ার কারণেই তা শিল্পের মর্যাদা পায় না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে, কোনো এক গোধূলিলগ্নের দৃশ্যছবি কিংবা পূর্ণিমা রাতের চাঁদ ও চাঁদের আলো, কোনো এক একক ও নির্দিষ্ট সময়ে একজন মানুষের মনে সৃষ্টি বা শিল্পের অনুরূপ উপলব্ধি-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করলেও, প্রচলিত প্রাকৃতিক কাঠামোর অন্তর্গত বিষয় হওয়ার কারণে তাকে প্রকৃত সৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার এই একই দৃশ্যছবি কোনো মানবিক উপলব্ধির রঙ, সুরে বা কথায় সত্যের চেয়েও পরম সত্য হিসেবে অতি-প্রাকৃতিক সৃষ্টির রূপ নিয়ে, নন্দনতাত্ত্বিক কারণেই, কোনো-এক একক দেশ-কাল-মাত্রায় শুদ্ধশিল্প হিসেবে গ্রাহ্য হয়।

সৃষ্টির সত্যরূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, আর এ কারণেই প্রাগৈতিহাসিক চেতনাকাল থেকে শুরু করে বর্তমানের বিজ্ঞান-দর্শনসমৃদ্ধ সময়বলয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন স্রষ্টা ও শিল্পী তাঁর সৃষ্টিসম্পর্কীয় নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেহেতু জীবন ও জগৎ সংগঠনের চরম ও পরম সত্যকে প্রকাশ করা, সেহেতু সৃষ্টির রূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে একজন স্রষ্টা বা শিল্পী সবসময় তাঁর ব্যক্তিগত সময়কে গ্রাহ্য করে সমকালীন চেতনা-কাঠামোর বা প্যারাডাইমের অন্তর্গত সত্যকেই সৃষ্টির সত্য হিসেবে চিহ্নিত

করেন। সৃষ্টির রূপ, স্বরূপ ও দর্শন প্রকাশে স্রষ্টার দেশ-কাল-বোধই সামগ্রিকভাবে প্রাধান্য পায়– এ সত্যকে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

সৃষ্টির রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ করতে হলে জাগতিক দেশ ও কালসম্পর্কীয় কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যে জগৎকে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করি তাকে 'সাধারণ-জ্ঞান-চিত্রের' পৃথিবী হিসেবেই গ্রাহ্য করা যায় এবং 'সাধারণ-জ্ঞান-চিত্রের' পৃথিবীতে অবস্থানরত বস্তুসত্যকে বিশ্লেষণ করে পরমসত্যকে উপস্থাপন করাই হয়ে ওঠে একজন স্রষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণ-জ্ঞান-চিত্রে গ্রন্থিত পৃথিবীর অন্তর্গত উপাদান অসীম, কিন্তু উপলব্ধিতে খণ্ডিত এবং জাগতিক জ্যামিতির বিভিন্ন স্থানে তার ঘটন ও প্রকাশও ভিন্নতর। একজন মানুষ তার পরিচিত সাধারণ-জ্ঞান-চিত্রের পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করে কেবলমাত্র কিছু সত্য-মিথ্যাজাত প্রশ্নবোধক উপলব্ধিরই সম্মুখীন হয়, আর জাগতিক সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব অন্তত ও অসীম মহাবিশ্বের সামনাসামনি এসে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানজাত জ্যামিতিক বিশ্বও মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কারণ অন্তত বিশ্বজগৎ এবং সাধারণ-জ্ঞান-চিত্রে গ্রন্থিত পৃথিবীর মানচিত্রের বিপরীতে যে-কোনো ধ্রুব গাণিতিক বিশ্লেষণ, হঠাৎ হলেও, বিমূর্তরূপেই প্রকাশ পায়। সাধারণ মানবিক-জ্ঞান-চিত্রের অঙ্কিত পৃথিবীর মুখোমুখি আইনস্টেনীয় আপেক্ষিক বিশ্বজগতের ছবি কিংবা কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবদ্ধ বস্তুধারণা অনেক সময়ই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না এবং এ কারণে একটা বিমূর্ত রূপকথার সময় আমাদের ব্যক্তিগত ও সৃষ্টিশীল সময়কে গ্রাস করে নিয়ে, চরম ও পরম সত্তায়, একটি নতুন মিথ্যাজাত-সত্যের কিংবা নতুন ঘটনার জন্ম দেয়।

ব্যক্তিগত ও সৃষ্টিশীল সময়ে সংঘটিত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গেলে সময়কেও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমাদের জগৎ ও জীবনের প্রবাহ বর্তমানে এসে পৌঁছেছে এক অনন্ত সময়কে গ্রাস করে এবং এ সময়ের প্রান্ত সম্পর্কেও আমাদের ধ্রুব কিছু জানা নেই। অনন্ত সময় সম্পর্কে আমরা এতটাই অচেতন যে, সময়মাত্রা সংযোগ করে কোনো বিষয় চিন্তা করতে গেলেই এক বিমূর্ত দেশেই আমরা আমাদের উপস্থিত করি। সময়মাত্রা সংযোজিত বিমূর্তের দেশ প্রচণ্ডভাবে আঁকাবাঁকা এবং জাগতিক সত্য দিয়ে তাকে গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, আর এজন্য নিজস্ব জগৎ বা চেতনা-কাঠামো গঠনের তাগিদে, প্রতিদিন প্রতিক্ষণে আমরা জাগতিক ঘড়ির সময়কে কেন্দ্র করেই ব্যক্তিগত সময়কে গ্রাহ্য করে নিই। এ ব্যক্তিগত সময়ের কেন্দ্রসত্তায় উপস্থিত থাকে বিভিন্ন মাত্রার অণুসময়, যাকে জীবনের অস্তিত্ব আর কিছু মূর্ত-বিমূর্ত উপলব্ধির স্বপ্ন দিয়েই তৈরি করা হয় এবং এর ফলে, কোনো একক একক চেতনা-কাঠামোতে আমাদের অবস্থান ও অণুসময়কে কেন্দ্র করে এক প্রচণ্ড দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় এক সৃষ্টিশীল সময়। সৃষ্টিশীল সময়ে গ্রাহ্য দেশ-কালসম্পর্কীয় যে-কোনো ধরনের সত্যের আবিষ্কারই একটি ঘটনা, আর দেশ-কাল-সৃষ্ট এ ঘটনাকেই প্রচলিত প্রাকৃতিক সংগঠন-বহির্ভূত সৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দুই.

জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় চরম ও পরম সত্যকে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দছবি কিংবা রঙ ও ভাষা আমাদের আয়ত্তে থাকলেও, তা কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সত্য প্রকাশের কোনো সম্পূর্ণ

মাধ্যম আমাদের কাছে না থাকায়, চরম ও পরম সত্য উপলব্ধি-সংবেদ প্রকাশের জন্য সব-সময়ই আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিই। কোনো সৃষ্টিশীল সময়ে একজন স্রষ্টা তাঁর জীবন ও জগৎকে প্রকাশের জন্য যে মিথ্যার আশ্রয় নেন তাকে আমরা 'আপেক্ষিক-মিথ্যা' হিসেবে গণ্য করব। কারণ যে-কোনো জাগতিক সত্যই আসলে মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্য এবং আপেক্ষিকভাবে আমাদের চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমে অবস্থান করে।

সৃষ্টির কেন্দ্রসত্তায় যে আপেক্ষিক মিথ্যার অস্তিত্ব থাকে, এ বিষয়টি অনেক কবি-শিল্পী উপলব্ধি করেছেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর শিল্পদর্শন নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন– "The air is full of an infinite number of radiating straight lines which cross and weave together without ever coinciding; it is these which represent the true form of every objects essence." দ্য ভিঞ্চির উপলব্ধিজাত যে-অসীম সরলরেখা সমস্থানিক না হয়েও বাতাসে বা শূন্যে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করছে বা জটলা বাঁধছে, তাকে জাগতিক সত্যের চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। কোনো দৃশ্যছবির অন্তর্গত এই রেখার কারুকাজকে বোঝার জন্য জাগতিক সত্য চোখের বাইরে অবস্থানকারী একটি অতিপ্রাকৃতিক আপেক্ষিক মিথ্যার চোখ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রেডনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, '....placing the logic of the visible at the service of the invisible' –এ সত্যই হচ্ছে চিত্রকলার মূলসত্তা। পোসিন চিত্রকলার অতিপ্রাকৃতিকতাকে স্বীকার করেন এভাবে 'Painting is nothing but an image of incorporeal things despite the fact that it exhibits bodies'– অর্থাৎ একটা ছবিতে শিল্পী বস্তুর শরীরকে উপস্থিত করেন না বরং অবস্তু-অবয়বই হচ্ছে ছবির মূলসত্তা। বিখ্যাত শিল্প গইয়ার মতে– 'Colour does not exist in nature any more than line... only advancing and receding planes exist.'। গইয়ার উপলব্ধিতে রঙের অবস্থান গৌণ হলেও ভ্যান গখের অনুভূতি অন্য রকম। তিনি বলেন– 'Colour in itself expresses something; never mind the object'। এখানে দেখা যাচ্ছে রঙ ও রেখা সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রায় বিভিন্ন শিল্পীকে আন্দোলিত করে সৃষ্টিশীল করে তুলছে, একটা আপেক্ষিক মিথ্যার বলয়ে, যাকে জাগতিক সত্য দিয়ে গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। রঙ ও রেখা সম্পর্কে পিকাসোর বক্তব্য উল্লেখ করা যাক। তাঁর উপলব্ধিতে– 'The white I thought of, the green I thought of, are in the picture, but not in the place foreseen nor in the expected quantity'। তিনি আরও বলেন– 'I get an indigestion of greenness. I must empty this sensation in a picture' পিকাসোর শিল্পদর্শন বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সত্যকেই খুঁজে পাব যে স্রষ্টার সত্য ও জাগতিক সত্য কোনো অবস্থাতেই সমার্থক নয়। এ বক্তব্য আরও জোরালো হয় যখন মাতিস বলেন– 'Exactitude is not truth' কিংবা ডাফির উপলব্ধি বলে– 'Nature is only an hypothesis'।

কবিতা শিল্পের বেলায়ও 'আপেক্ষিক মিথ্যা'র ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। স্রষ্টা-কবি সম্পর্কে ইয়েট্স-এর মন্তব্য খুবই সরাসরি এবং তিনি বলেন- '...poets are good liars...'। কবিতার সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য- 'We make out of quarrel with others, rhetoric, but of the

quarrel with ourselves poetry... we sing amid uncertainty; and smitten even in the presence of the most high beauty by the knowledge of our solitude, our rhythm shudders. I think, too, that no fine poet, no matter how disordered his life, has ever, even in his mere life, had pleasure for his end' কিংবা 'The winds that awakened the stars/Are blowing through my blood'। ইয়েট্‌স-এর উদ্ধৃতি থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে একজন কবিস্রষ্টা চরম ও পরম সত্যকে প্রকাশের তাগিদে নিজেই নিজের বিরুদ্ধ-পক্ষ হয়ে ওঠেন এবং এক যন্ত্রণাদায়ক দ্বান্দ্বিক সৃষ্টিশীল মুহূর্তে আপেক্ষিক মিথ্যা দিয়ে কবিতার সত্যকে উপস্থাপন করেন। 'যে বাতাস তারাদের ঘুম থেকে জাগাল, সে বাতাসই আমার রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে'– এমন মিথ্যাজাত চরম সত্য কেবল একজন স্রষ্টার সৃষ্টিশীল সময়ে গ্রাহ্য হয় এবং কোনো প্রচলিত শুদ্ধ জাগতিক ভাষা বা রঙ দিয়ে এমন উপলব্ধিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কবিতার যুক্তিহীন সত্য সম্পর্কে বোদলেয়র বলেন– 'Great poetry is essentially stupid; it believes, and that's what makes its glory and force. Do not ever confuse the phantoms of reasons with the phantoms of imaginations; the former are equations, the latter are beings and memories'।

জাগতিক সত্য বা যুক্তি কবিতার জগতে গ্রাহ্য নয়। কবিতার জগৎ কবির নিজস্ব অণুসময়ে সংঘটিত ও সংযোজিত ঘটনার ছবি-প্রতিচ্ছবি, যদিও জাগতিক সত্যের মূর্ত চিত্রও সফলভাবে কবিতায় আসতে পারে। 'কিছু কবিতা ও কিছু কবিতা নয়' এমন শরীর নিয়েও একটি কবিতা দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কবিতাহীন কবিতার শরীর প্রচলিত প্রাকৃতিক কাঠামোতে থেকে কেবল একটা পদ্যের জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গে কোলরিজ ও এলিয়টের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। কোলরিজ বলেন– A poem of any length neither can be, nor ought to be, all poetry.', আর এলিয়টের ভাষায় '...poetry... excellent words in excellent arrangement and excellent metre. That is what is called the technique of verse... a poem in some sense, has its own life; the feeling, or emotions, or vision, resulting from the poem is something different from the feeling, or emotion or vision in the mind of poet'। একজন স্রষ্টাকবি তাঁর সৃষ্টিশীল সময়ের উপলব্ধি-সংবেদকে অচেতনভাবেই প্রচলিত প্রাকৃতিক কাঠামোর বাইরে রাখেন এবং এ কারণে তার সৃষ্টিশীল সময়ের ঐশ্বর্য তাঁর ব্যক্তিগত সময়কে অতিক্রম করে যায়। এ সময়ে আপেক্ষিক মিথ্যা কিংবা আপেক্ষিক সত্য-মিথ্যার মিশ্র উপাদান, চরম ও পরম সত্যের উপলব্ধিকে উজ্জীবিত করে একজন কবিকে সৃষ্টির পথ দেখায়। এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে পল ভ্যালেরি বলেছেন– I did not want to say but wanted to make... it was the intention of making which wanted that I said...'। শুদ্ধ সৃষ্টির অতিপ্রাকৃতিকতা সম্পর্কে বেন জনসনের উক্তিও উল্লেখযোগ্য। কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন– "Speaketh somewhat above a mortal mouth'. Mortal Mouth-কে গ্রাহ্য করেই আগামীর জন্য সত্যের চেয়েও সত্য কিছু দেওয়াই কবিতা বা শুদ্ধ শিল্পের কাজ, এ বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে। শিল্পকলার অন্যান্য শাখা, যেমন– নৃত্যকলা, নাটক, সুরসৃষ্টি, সঙ্গীত, কথাসাহিত্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের বেলায়ও প্রচলিত প্রাকৃতিক কাঠামো-ভাঙার চেষ্টাই করেন একজন স্রষ্টা বা শিল্পী। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, প্রচলিত

প্রাকৃতিক কাঠামো-ভাঙা সৃষ্টি অমানবিক নয় বরং মানুষের প্রজন্ম উত্তরণের সহায়ক শক্তি হিসেবেই নিত্য-প্রবহমান থেকে আগামীর সময়কে ক্রমাগত নিয়ে আসছে বর্তমানে। সৃষ্টির ভাঙচুর ছাড়া গাণিতিক বিশ্ব কোনো অর্থবোধ উপলব্ধি আমাদের দেয় না এবং এ কারণেই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দর্শনকে সামনে রেখেই আরনল্ডের ভাষায় আমাদের বলতে হবে– Without poetry our science will appear incomplete। বিজ্ঞান আমাদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে খণ্ডিত সমাধান দিতে পারলেও, শুদ্ধ শিল্পই আমাদের দেবে অনন্ত ও অসীম সত্তায় চরম ও পরম সত্যের ঠিকানা ও অখণ্ড আনন্দের উপলব্ধি।

কবিতা ও প্যারাডাইম

ইদানিং নতুন ও পুরাতন কবিতা বা বৃহৎ অর্থে নতুন ও পুরাতন সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় অথচ অনিশ্চয়তাবদ্ধ আলোচনা শুরু হয়েছে। নতুন-পুরাতন কবিতা বা সৃষ্টিবিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ কোনো একটি একক চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমে ধারণ করা যে-কোনো শব্দ-ছবির শিল্পস্বরূপ ক্রমাগত চর্বিত হয়ে তার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য হারাতে পারে, আবার কোনো-এক একক প্যারাডাইম বা চেতনা-কাঠামোকে ভেঙে, নতুন সৃষ্টির জন্ম কখন কিভাবে কোনো অবয়বে উপস্থিত হবে তা-ও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। বিবর্তনশীল মানবিক চেতনা-কাঠামো, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক বিপ্লবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোনো এক নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাকেই কেবল সনাক্ত করতে পারে, কিন্তু শিল্প প্রকাশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার অবয়ব বা শরীর সম্পর্কে কোনো গাণিতিক ধ্রুব সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নতুন চেতনা-কাঠামোর যে-কোনো প্রান্তে অবস্থানকালে যে-কোনো স্রষ্টাই তার অন্তর্জগতে সংযোজিত বিভিন্ন দৃশ্য, ছবি, উপলব্ধি ও সংবেদ সম্পর্কীয় চেতনা-ফসল শিল্পরূপে প্রকাশের তাগিদে নিজেকে এক অসহ্য-যন্ত্রণাদায়ক সময়বলয়ে নিক্ষেপ করে, এমনকি শিল্পচেতনা প্রকাশের জন্য নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার অচেতন স্বপ্ন দেখে। প্যারাডাইমের অন্তর্গত কোনো এক সময়ে নতুন চেতনাস্পর্শের অযান্ত্রিক বিকিরণে উজ্জীবিত হয়ে একজন স্রষ্টা নতুন চেতনা-কাঠামোর অন্তর্গত বিষয় সংযোজন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনিশ্চয়তাবদ্ধ নতুন শিল্পসত্তা নিয়ে উপস্থিত হন। বর্তমানে আমাদের পরিচিত প্যারাডাইমে, নতুন-পুরাতন কবিতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে তা-ও এক নতুন চেতনাস্পর্শেরই বিশুদ্ধ বিকিরণ এবং আমরা অনিশ্চয়তাবদ্ধ সৃষ্টির দর্শন মেনে নিয়েও বলতে পারি, নতুন কবিতা সৃষ্টির চেতনা-কাঠামো আমাদের গ্রাহ্য নিকট-আগামীতেই অবস্থান করছে।

দুই.

নতুন কবিতা সৃষ্টির ইতিহাস সময়-আপেক্ষিক চেতনা-কাঠামোর বিকিরণ-ফসল, যদিও নতুন কবিতার কেন্দ্রসত্তায় পুরাতন প্যারাডাইমের ফসিল-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া অবাস্তব নয়। নতুন সৃষ্টির স্বরূপ কী, তা সঠিকভাবে চেতনায় গ্রন্থিত করতে হলে সময়-আপেক্ষিক চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমকে বিশ্লেষণ করতে হবে, আর যে-কোনো নতুন সৃষ্টিই যেহেতু ধ্বংসের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝে ক্রিয়াশীল অনিশ্চয়তাবদ্ধ শক্তিস্বরূপের গাণিতিক ব্যাখ্যাও নতুন সৃষ্টিসম্পর্কীয় আলোচনায় আনা প্রয়োজন।

সময়-আপেক্ষিক আমাদের বিশ্বে যে-কোনো শব্দছবি আপেক্ষিকভাবে আমাদের চেতনা-জগৎকে আন্দোলিত করে। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের পরিচিত সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু সূর্যের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে। কিন্তু এত সময় প্রবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও সূর্যকে আমরা ‘পুরাতন সূর্য’ বলে অভিহিত করি না। আবার ভোরের সূর্যকে ‘নতুন সূর্য’ হিসেবে গ্রহণ করলেও গোধূলিলগ্নে অস্তগামী সূর্যকে ‘পুরাতন সূর্য’ হিসেবেই চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হই। একই সূর্যসম্পর্কীয় এই নতুন/পুরাতন বাইনারি উপলব্ধির জন্ম হয় দুটি ভিন্ন প্যারাডাইম বা দেশ-কাল-কাঠামোর আপেক্ষিক চেতনাবোধ থেকে। পাঁচশত কোটি বছরের পুরাতন সূর্য সৌরজাগতিক সংগঠনের মধ্যে একটি ধ্রুবক হিসেবে, গাণিতিক কারণেই পুরাতন হয় না, আর যে কোনো গাণিতিক ধ্রুবকই ধ্বংসপূর্ব দেশ-কালে বা চেতনা-কাঠামোতে অসীম সত্য হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু একটি চব্বিশ ঘণ্টার দিনে সূর্যের দেশ-কাল অবস্থান বা প্যারাডাইম প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল, আর এ কারণেই ভোরের সূর্য নতুন সৃষ্টির ব্যঞ্জনা দিতে পারলে বিকেলের সূর্য পুরাতন কিংবা মৃত্যুর মতো প্রান্তিক অন্ধকারের উপলব্ধিকেই উপস্থিত করে। কবিতা বা যে-কোনো মানবিক সৃষ্টিতে গাণিতিক ধ্রুবকের মতো সত্য অবস্থান করতে পারে না এবং এ কারণেই যে-কোনো সৃষ্টিই প্যারাডাইম পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরাতনের আদল ধারণ করতে পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, সৃষ্টির অন্তঃমূলে ধারণ করা কোনো প্যারাডাইম-অতিক্রান্ত বিষয় যুগোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক অন্তর্গত বিষয় ও প্রসঙ্গ অতীতের প্যারাডাইম অতিক্রম করে এখনও আমাদের কবিতার উপলব্ধি দেয়, যদিও চর্যাপদের শরীর বর্তমানের দেশ-কাল-মাত্রায় পুরাতন হিসেবেই বিবেচিত।

কবিতা বা সৃষ্টির বেলায় জাগতিক শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া মৌলিকভাবেই ক্রিয়াশীল থাকে। আমরা প্রতিদিন যে সব তরঙ্গায়িত শব্দছবিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে আমাদের চেতনায় গ্রন্থিত করি, তা আসলেই শক্তির একপ্রকার রূপান্তরমাত্র। আলোর কোয়ান্টা ও শব্দের তরঙ্গব্যবস্থা কোনো-এক একক প্যারাডাইমে আমাদের জৈবদেহে বিভিন্ন বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে বস্তু ও বস্তুউৎসারিত উপলব্ধিকে কিছু মূর্ত কিংবা বিমূর্ত চিত্রে সংযোজিত করে। আমাদের চেতনায় গ্রন্থিত বিভিন্ন মূর্ত-বিমূর্ত শব্দছবি বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দছবির জন্ম দিতে পারে এবং এ ধরনের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াবিক্রিয়া কোনো এক একক মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দর্শন ইত্যাদির মতো একান্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের

কোয়ান্টাম স্তরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্যারাডাইম বা চেতনা-কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে একজন মানুষের জৈবদেহে সংযোজিত জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় বিদ্যুৎ-রাসায়নিক শক্তিবলয় সম্পূর্ণরূপে ভেঙেচুরে নতুন ধারণার জন্ম দেয়। দু-একটি উদাহরণ দিলে প্রসঙ্গটি আরও স্পষ্ট হবে। আমাদের অতি পরিচিত চাঁদ সম্পর্কে আমাদের বস্তুধারণা তিন দশক আগেও যা ছিল এখন আর তা নেই। ঐশ্বরিক চাঁদ কিংবা চাঁদের বুড়ি ও চরকার মূর্ত-বিমূর্ত চিত্র এখন ভেঙেচুরে চন্দ্রবিজয়ী আর্মস্ট্রং ও এলড্রিনের পদচিহ্নের ছবি হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। বামনের হাত দিয়ে চাঁদ ছোঁয়া আমাদের বর্তমান প্যারাডাইমে বাস্তবেই সম্ভব। যে শব্দ শুনে আমরা কুকুর ও বিড়ালকে অমাবশ্যার রাতেও চিনতে পারতাম, এখন কি আর তা সত্যি সম্ভব? এখন তো এমনও হতে পারে যে, শব্দের উৎসমূলে কুকুর কিংবা বিড়াল নামক কোনো জৈববস্তুই নেই, আছে শুধু একটা অজৈব যান্ত্রিক টেপরেকর্ডার। আগামীতে জিন ক্লোনিং-এর মাধ্যমে এমন কোনো নতুন জীবের সৃষ্টিও তো হতে পারে যেটা শেয়ালের মতো ডাকবে, আর তখন শ্মশানঘাটের স্পষ্ট বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো কবি কিংবা কথাসাহিত্যিক শেয়ালের ডাকের প্রতীক ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না।

আসলে আমরা আমাদের পরিচিত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এতটাই বিভ্রান্ত যে, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বিপ্লবের মুখোমুখি হলেই আমরা আমাদের চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম বদলাতে চাই। আর যেহেতু সময় সত্যের সন্ধানে নিত্যপ্রবাহমান, সেহেতু প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য নতুন। জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় নতুন উপলব্ধি সংবেদের জন্ম হবেই আর এ কারণেই বারবার আমরা পাব নতুন কবিতা বা সৃষ্টিকে।

তিন

বাংলাভাষায় কবিতা লেখার ইতিহাস অতি প্রাচীন। নতুন কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে খুব বেশিদূর না পিছিয়ে রবীন্দ্রযুগ থেকেই শুরু করা যাক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্যারাডাইম মূলত প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শন ও ভারতীয় জীবনদর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বসাহিত্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের প্রভাবে তাঁর কবিতায় নতুনের আমেজ আসে এবং তিনি বাংলাভাষায় প্রথম নতুন কবিতা বা আধুনিক কবিতা লিখতে প্রয়াসী হন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় নতুন কবিতা বা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন– 'এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যায় আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'। রবীন্দ্রনাথ কবিতার যে বাঁকের কথা উল্লেখ করেছেন তা ছিল মূলত চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম পরিবর্তনের ঘটনা, যদিও তিনি সময়কে উহ্য রেখে কেবলমাত্র মর্জিকেই বাঁক নেওয়ার মুখ্য উপাদান হিসেবে সনাক্ত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রবলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আধুনিক নতুন কবিতা লিখতে শুরু করেন বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিবৃন্দ। উল্লেখিত কবিদের কবিতার ভাষা, বিষয় ও দর্শন ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং তা ছিল ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন তিরিশ-দশকীয়

বাংলাভাষার কবিদের চেতনা-কাঠামোকে ভেঙেচুরে নতুন বা আধুনিক কবিতা লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল, এ সত্যকে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন- 'লরেন্সী উন্মাদনার অবসানে পাউন্ড আর এলিয়ট একই সঙ্গে বাংলাদেশে পৌঁছুল। উনিশ-শো তিরিশের বছরগুলো ভরে এ দুজনেরই বই কোলকাতার হাতে হাতে ঘুরেছে, নাম মুখে মুখে রটেছে, বাংলার তরুণ অনতিতরুণ কবিদের কানে তখন নূতনের মন্ত্র এ দুজনই জপাচ্ছেন।' বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতিতে 'নূতনের মন্ত্র' এই শব্দযুগল খুবই উল্লেখযোগ্য; কারণ ইউরোপীয় সাহিত্যের নতুন মন্ত্রই কিছুটা হলেও তাঁদের চেতনা-কাঠামো ভেঙে নতুন কবিতার পথ দেখিয়েছিল। বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তও তাঁদের লেখায় ইউরোপীয় সাহিত্যদর্শনের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এটাও ঠিক যে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন-ই বাংলা কবিতার বাঁক নির্ধারণ করেনি। রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কবিতা লেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা ও সময়-সচেতন চেতনা-কাঠামোর বিবর্তনও তিরিশের কবিদের দিয়ে নতুন কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে।

তিরিশ দশক ও তার পরবর্তী সময়ে যে আধুনিক বা নতুন কবিতা লেখা হয়েছিল তার মূলে ছিল জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় কিছু নতুন উপলব্ধিচেতনার বিকিরণ। দীপ্তি ত্রিপাঠি এ সময়ে চেতনা-কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কবিতার লক্ষণ হিসেবে নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত, জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্য, আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব, বিশ্বসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, বিভিন্ন নতুন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব, মার্ক্সবাদ, মননধর্মিতা, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে সংশয় ও অনিশ্চয়তা, দেহজ কামনা-বাসনার প্রাধান্য, ধর্ম ও নীতিধর্মে অবিশ্বাস ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্য বিরোধিতাকে সনাক্ত করেছেন। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে বিশ শতকীয় ইউরোপীয় ভাব-চেতনা, প্রভাব, অবক্ষয়, বিকার, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল নতুন চেতনা-কাঠামো গঠনের মূল ভিত্তি ও আধুনিক কবিতার মূল প্রেরণা। ড. বাসন্তি কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন– 'নতুন জ্ঞানের সাহায্যে জগৎ, জীবন ও মানুষকে সমগ্রভাবে দেখার নামই হল আধুনিকতা।' এখানে 'নতুন জ্ঞানই' হল নতুন চেতনা-কাঠামো বা নতুন প্যারাডাইম সৃষ্টির মূল উৎস। তিরিশ-পরবর্তী দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে, বাংলা কবিতার খুব একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসেনি, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কবি আমাদের নতুন কবিতার স্বাদ দিতে পেরেছেন।

এর কারণ হয়তো-বা এই যে, তিরিশ থেকে আশির মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমে আমূল পরিবর্তন আনার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি কিংবা বর্তমানের বিশ্বদর্শন বা বিশ্ব জীবনদর্শন সম্পর্কে আমরা কিছুটা হলেও অচেতন রয়েছি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত নব্বই দশকে এসে আমরা কিন্তু বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি যে, আমাদের চেতনা-কাঠামোকে নতুন মাত্রায় বিন্যস্ত করার মতো ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে, আর আমাদের অচেতনতাই নতুন সৃষ্টির পথে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমকে পুনর্গঠনের জন্য যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে তা হতে পারে নিম্নরূপঃ

১. কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আলোকে বিজ্ঞান ও জীবনদর্শনের পুনর্বিন্যাস ।

২. বায়োজেনেটিকস্ ও বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার আলোকে দৈবের জীবন, জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন ।

৩. কণাতরঙ্গব্যবস্থায় বস্তুর বস্তুহীনতা ও ক্রমপ্রসারমান ঠিকানাহীন মহাবিশ্বে অনিকেত দৃশ্যমান জগতের অবস্থান ।

৪. কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার, রোবটিক্স ও সাইবারনেটিক্সসম্পর্কীয় তাত্ত্বিক ও যান্ত্রিক উপলব্ধি ।

৫. সমাজতান্ত্রিক পূর্বইউরোপের গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ও মার্ক্সবাদের পুনর্মূল্যায়ন ।
৬. চেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়াবিক্রিয়া ও জৈবরাসায়নিক তত্ত্ব ।

৭. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সাথে নতুন ভাষা-প্রকরণের সৃষ্টি ।

৮. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়ে মিশ্র-সংস্কৃতি ও ভাষার উদ্ভব ।

৯. প্রতিটি জৈব-একক মানুষের চেতনার কোয়ান্টাম স্তর ভিন্ন ভিন্ন ধাপে অবস্থান করার কারণে স্রষ্টা ও সাধারণ মানুষের মাঝে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং এ পরিস্থিতিতে নতুন কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্বের বিকাশ ।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বর্তমানের প্রচলিত প্যারাডাইম বা চেতনা-কাঠামোকে নতুনভাবে সাজিয়ে যে-কোনো স্রষ্টার মনে সৃষ্টিবিষয়ক নতুন উপলব্ধি-সংবেদ এনে দিতে পারে । বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে আমরা নতুন সৃষ্টি আর নতুন কবিতার নান্দনিক রসে তৃপ্ত হব, এ আশা করা অবশ্যই স্বপ্ন নয় ।

কবিতা ও গণিত

আদিতে শব্দময় একক ছিল। প্রচণ্ড শব্দে একক ভেঙে সৃষ্টি হল মহাবিশ্বের। ধর্মতত্ত্ব বলে, এই স্রষ্টা-এককের নামই হল ঈশ্বর। তিনি বলেছিলেন– 'হও', আর তাঁর এই শব্দ-আদেশেই জন্ম হয়েছিল বিশ্বজগতের। বিজ্ঞানও প্রায় একই কথা বলে। সৃষ্টির শুরু ছিল কোনো এক এককত্ব কিংবা সিংগুলারিটির শব্দময়-আলোকিত মহাবিস্ফোরণ। সৃষ্টিশীল ঐ মুহূর্তের নাম ছিল 'বিগ-ব্যাং'। আদিতম এই ঘটনার মূর্ত-বিমূর্ত চিত্রকে ঘড়ির হিসাবে আনা সম্ভব, কিছু অঙ্ক কষে, কারণ গণিতেরও শুরু ছিল তখনই। স্রষ্টা-এককের শব্দমূল ও আলোকে-উৎসের গণিতসূত্র সৃষ্টির পর হারিয়ে যায়নি, সৃষ্টির সাথে প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছেছে বর্তমানে। জড় ও জৈব প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দনে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় এবং প্রতিটি সত্তায় এখনো খুঁজে পাওয়া যায় শব্দ ও চিত্রের কণাতরঙ্গরূপ এবং সংখ্যার ধারাপাত। পরমাণু ভাঙলে এখনো শব্দ হয়, নাম তার আণবিক বিস্ফোরণ। গণিত গদ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখা হয় $E=MC^2$। জীবন ভাঙ্গলে, চিৎকার হয়, ক্রন্দন হয়, জন্ম নেয় অসংখ্য নতুন গণিত। কোষ ভেঙে, অণু ভেঙে তৈরি হয় নিত্যনতুন জ্যামিতির। জড় ও জৈবসত্তায় চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায় কণা আর তরঙ্গের কারুকাজ, চক্র-বলয়ের অন্তস্থ বিভিন্ন বিন্দুতে তৈরি হয় অসংখ্য চিত্র আর শব্দময় সময় কিংবা ঘটনা। দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বিন্দু, রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি নিয়ে তৈরি হয় জ্যামিতি-ত্রিকোণোমিতি, দেশ ও কালের ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভেক্টর-টেনসর এবং এমন আরো কতশত কণাতরঙ্গের গণিত। সৃষ্ট সব ঘটনার ঠিকানা জানা যায় না এই সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে। যে সব ঘটনা হিসাবের মধ্যে থাকে না, যে কণাতরঙ্গের গণিত এখনো জানা নেই প্রকৃতির, সেই কণাতরঙ্গের গণিত খুঁজে পাওয়া গেলেই তার নাম হয় বিজ্ঞান, আর যে গণিত কিছু যুক্তি চাপিয়ে আলো-আঁধারের সত্যকে তুলে ধরে, তাকে বলি ছায়া-গণিত, মেটাফিজিক্স, কখনো কবিতা। অন্তত যুক্তি তো তাই বলে। বিষয়টিকে আরও একটু বিশ্লেষণে বোঝা যাক।

প্রথমেই বলা হয়েছে, এই বিশ্বে শব্দ ছিল, চিত্র ছিল এবং এখনো আছে। অজৈব ও জৈবের যৌগ হয়ে জীবন যখন পৃথিবীতে এল, তখন সে-ও হয়ে উঠল শব্দময়, চিত্রময়, ঠিক তার পরিচিত প্রকৃতির মতো, বিশ্বের মতো। বাতাসের শব্দচিত্র, মেঘের শব্দচিত্র, জলের শব্দচিত্র, পতিত পাথরের শব্দচিত্র, ঝরা পাতার শব্দচিত্র ইত্যাদির মতো আরও অনেক শব্দচিত্রের উৎস খুঁজল জীবন কিংবা মানুষ এবং তারা বুঝতে চাইল ঐ সব শব্দ ও চিত্রময় সময় ও ঘটনার অর্থকে। আলো ও শব্দের কণাতরঙ্গ বিশ্লেষণে প্রতিটি ঘটনা ও সময়ের ছবি-প্রতিচ্ছবিকে গেঁথে রাখল তারা স্মৃতির আমিষকোষে, অন্ধকার মস্তিষ্কের আলোকিত জৈব-বিদ্যুৎ বলয়ে। এক সময়, প্রকৃতির অংশ হয়ে প্রকৃতির মতো কথা বলতে চাইল মানুষ, আর কথা বলার জন্য তারা ব্যবহার করল কণাতরঙ্গের গণিতকে, যা ইতিমধ্যেই বন্দি হয়ে আছে তাদের মস্তিষ্কের আমিষ-বিদ্যুৎবলয়ে শব্দময় মহাবিস্ফোরণ ঘটানোর নেশায়, প্রায় ঈশ্বরের মতো। আদি শব্দের প্রতিনিধি হল মানুষ।

প্রথম যে মানুষটি দৃশ্যের কণাতরঙ্গ রূপকে শব্দ-তরঙ্গে সাজিয়ে প্রকাশ করতে চাইল, সেই হল প্রথম কবি। প্রাকৃতিক শব্দের সাথে তার নিজস্ব সত্তার শব্দকে যোগ করে এক নতুন শব্দশৃঙ্খল তৈরি করল সে, আর চমৎকৃত হয়ে তার গোত্রের মানুষও গ্রহণ করল 'প্রথম কবি'র তৈরি এই ছন্দময় প্রকাশ। তারা নতুন শব্দ-তরঙ্গ দিয়েই বুঝতে পারল এবং বোঝাল তাদের পরিবেশ পৃথিবীকে। তাদের সম্মোহিত করল শব্দের কারুকাজ, সৃষ্টি হল মন্ত্রের, আর তখনই হয়তো-বা তারা আগুন জ্বালিয়ে গাইল:

অ্যা, অ্যা, অম্ অ, অর্, রা
কিম্ উম্, রু, অর্, থথ্, যা

কিংবা উচ্চারণ করল সত্তা-প্রকাশের প্রচণ্ড তাগিদে আশ্চর্য কোনো শব্দ-তরঙ্গ বিন্যাস:

হিং টিং ছট অং বং ফুঃ
ছল বল মাম্ ধুক বুক বুঃ

আপাতদৃষ্টিতে প্রাগুক্ত ধ্বনি বা শব্দগুচ্ছের কোনো অর্থ হয়তো-বা নেই। কিন্তু একেবারেই নেই, এ কথা কি বলা যায়? প্রতিটি ধ্বনি তার নিজস্ব তরঙ্গ-কম্পাঙ্ক (Wave length) নিয়ে, বিভিন্ন জৈব-বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে, উদ্দীপ্ত করতে পারে মানবিক মস্তিষ্কের জৈব-আমিষবলয়। তরঙ্গ-ছন্দের অভিঘাতে প্রবাহিত হতে পারে বিভিন্ হরমোন-এনজাইম, আর এ কারণে আনন্দ কিংবা বেদনার অনুভূতিতে নিজস্ব অস্তিত্বকে উদ্ধার করতে পারে একজন মানুষ। আসলে শব্দের ছন্দময় তরঙ্গ-কারুকাজে কোনো এক মূর্ত-বিমূর্ত সম্পর্ক নিয়েই উপস্থিত থাকে ব্যক্তিমানুষের বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং শব্দ-গ্রন্থিত এই বাস্তবতার মূলে অবস্থান করে কণাতরঙ্গের চিত্ররূপ গণিত।

এবার কণাতরঙ্গ-সৃষ্ট চিত্ররূপ গণিতের বিবর্তন নিয়ে ভাবা যাক। যে নতুন শব্দ-শৃঙ্খল একজন প্রথম-মানুষ কিংবা প্রথম-কবি সৃষ্টি করেছিলেন, তা ক্রমাগত চর্চিত হয়ে হারিয়ে ফেলে তার আবেদন। বিশ্ব-সত্তায় থেকে প্রাকৃতিক হয়ে যায় সেই সব শব্দ-শৃঙ্খল। কিন্তু, সত্তা প্রকাশের প্রয়োজনে, সত্য প্রকাশের তাগিদে, আবারও নতুন কবি আসে। আবারও সৃষ্টি হয় অদ্বিতীয় স্পন্দন, নতুন শব্দ-শৃঙ্খলে সৃষ্টি হয় নিত্যনতুন কণাতরঙ্গের বিন্যাস। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নতুন মাত্রায় সত্যের স্বরূপ প্রকাশের তাগিদ একজন মানুষ খুঁজে পায় তার যুগ-চৈতন্যে, চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমগ্রাহ্য জ্ঞানের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ বিন্যাসের মাঝে। কোনো কোনো শব্দ-শৃঙ্খল বা কবিতা সময়কে অতিক্রম করে যেতে পারে বটে, কিন্ত তবু এ কথা বলা যায়, সম্ভাবনাময় সময়সহ শব্দময় পৃথিবী এগোয় আগামীর দিকেই, জীবনকে সাথে নিয়ে।

এখনো কবিতা আছে, আদি শব্দের প্রতিনিধি হয়ে জীবন-গণিতে। যুক্তির চোখ দিয়ে তাকালেই কবিতায় গণিতকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এ গণিত কখনও হয় 'দুই যোগ দুই সমান চার'-

এর মতো সহজ, আবার কখনো হতে পারে 'দুই যোগ দুই, পাঁচ'-এর মতো অযৌক্তিক যুক্তি (দুই-এর গণিত এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত)। কবিতার এই বিপরীতমুখী চরিত্রের কারণ কী? কারণ খোঁজার জন্য কবিতার 'দুই যোগ দুই, চার' আর 'দুই যোগ দুই, পাঁচ' কিভাবে হয় তাই দেখা যাক এবার।

২+২= ৪ কিংবা কবিতার সহজ গণিত

কবিতায় ছন্দ আছে। শব্দের ছন্দ, ধ্বনির ছন্দ। বিভিন্ন শব্দ-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক অভিঘাতে এইসব ছন্দ মানুষের মনকে বাজায়। এ যেন অনেকটা অর্গানে 'সরগম' সুর তোলা। কবিতার এই ছন্দকে বিশ্লেষণ করা যায় শুধুমাত্র 'দুই যোগ দুই, চার'– এরকম সহজ সাধারণ গণিত সমীকরণ দিয়ে। প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দবিজ্ঞান পড়লেই জানা যায় ছন্দের যোগফল, বিয়োগফল এবং অন্যান্য গণিত। ছন্দ মূলত তিন রকমের: দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত। এই তিন প্রকার ছন্দের মাঝে যে গণিত আছে, তা স্পষ্ট হয়ে চোখে ভাসে, যখন ছন্দমাত্রা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়। যেমন– ধরা যাক 'নিরুদ্দেশ' শব্দটির কথাই:

দলবৃত্ত রীতিতে	নি. রুদ্ দেশ্ = ১+১+১	মোট ৩ মাত্রা
কলাবৃত্ত রীতিতে	নি. রু-দ্ দে-শ্ = ১+২+২	মোট ৫ মাত্রা
মিশ্রবৃত্ত রীতিতে	নি. রুদ্ দে-শ্ = ১+১+২	মোট ৪ মাত্রা

এই মাত্রার গণিত আরও স্পষ্ট হয় যখন ছন্দের বিশ্লেষণ করা হয় বিস্তারিতভাবে। চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির গণিত কেমন, উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাক :

দলবৃত্ত, দ্বিপদী (পয়ার ৪+৪+ । ৪+২ মাত্রা
আজ বিকেলে কোকিল ডাকে শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলাম যেন তিনশো বছর আগে
কলাবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার) ৪+৪ । ৪+২ মাত্রা
পূর্ণিমা রাত্রের জ্যোৎস্না-ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।
মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী ৪+৪ । ৪+২ মাত্রা
সুন্দরের কোন মন্ত্রে মেঘে মায়া ঢালে
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া সোনার খেয়ালে।

উপরের পয়ার ছন্দ মহাপয়ার হলেই ছন্দের নতুন গণিত হয়, যাকে শব্দতরঙ্গ-কম্পাঙ্কের নতুন বিন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব। মহাপয়ারে ছন্দমাত্রা ৪+৪ । ৪+৪+২ কিংবা পূর্ণ

দ্বিপদীতে ৪+৪ । ৪+৪ হিসেবে প্রকাশ করা যায় । মাত্রাবদ্ধ ছন্দের গাণিতিক রূপ বিভিন্ন বিন্যাসে উপস্থিত থাকে কবিতায়, যার কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হল–

পঞ্চমাত্রক পর্বে কলাবৃত্ত দ্বিপদী	৫+৫ ।	৫+২ মাত্রা
	৫+৫ ।	৫+৫ মাত্রা
	৫+৫+২ ।	৫+৫+৩ মাত্রা
ষন্মাত্রক পর্বে দলবৃত্ত দ্বিপদী	৬+৬ ।	৬+৩ মাত্রা
	৬+৬ ।	৬+৬ মাত্রা
ষন্মাত্রক পর্বে মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী	৬+৬ ।	৬+২ মাত্রা
	৬+৬ ।	৬+৩ মাত্রা
	৬+৬ ।	৬+৫ মাত্রা
ষন্মাত্রক পর্বে কলাবৃত্ত দ্বিপদী	৬+৬ ।	৬+২ মাত্রা
	৬+৬ ।	৬+৩ মাত্রা
	৬+৬ ।	৬+৫ মাত্রা
	৬+৬ ।	৬+৬+২ মাত্রা
	৬+৬+২ ।	৬+৬+২ মাত্রা
সপ্তমাত্রক পর্বে দলবৃত্ত দ্বিপদী	৭+৭ ।	৭+২ মাত্রা
	৭+৭ ।	৭+৫ মাত্রা
	৭+৭ ।	৭+৭ মাত্রা

কবিতার ছন্দ-বিন্যাস কিংবা ছন্দের গণিত নিয়ে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু সে প্রয়োজন ছন্দ-বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য গ্রাহ্য হলেও কবিতা ও গণিতের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হয়তো-বা প্রয়োজন নেই । তবে, এ কথা বলা আবশ্যক যে, কবিতার প্রথাবদ্ধ ছন্দ কিংবা ছন্দের গণিতকে ভাঙচুর করেন অনেক কবি-স্রষ্টা, তাঁদের সৃষ্টির তাগিদেই । এমন অবস্থায় ২+২=৪-এর সহজ গণিত ভেঙে হতে পারে ৩+১=৪ কিংবা ২+১+১=৪-এর মতো ভাঙা-ছন্দের, কিংবা এমনও হতে পারে, ২+১+TAN৪৫=৪-এর মতো গদ্য-ঘেঁষা । এখানে উল্লেখ্য যে, কবিতার শরীর নিয়েও বিভিন্ন জ্যামিতির সৃষ্টি হয় । দাদাবাদ এবং পরাবাস্তববাদের প্রবক্তা কবি-স্রষ্টারা অনেক সময় কবিতার শরীরে জ্যামিতিক অবয়ব এনেছিলেন । অ্যাপোলিনিয়ার, কামিংস প্রমুখ কবিবৃন্দের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় বর্ণমালা ও শব্দ দিয়ে সাজানো চিত্রময়তা, যাকে

Calligramme বা Literary Cubism নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তী সময়ে কংক্রিট পোয়েট্রির ইশতেহার, লেখা হয় 'Concrete poetry begins by being aware of graphic space as structural agent... Hence The importance of ideogram concept...'। এখানে উল্লেখ্য যে, Calligramme, Literary Cubism কিংবা Concrete poetry ছাড়াও কেবলমাত্র কবিতার শরীর ও বিস্তার নিয়েও বিভিন্ন রকম জ্যামিতির সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘ কবিতা, ছোট কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতা, লিমেরিক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয় কবিতার বহুমাত্রিক জ্যামিতিক উপস্থাপনা।

২+২=৫ কিংবা কবিতার জটিল গণিত

কবিতার জটিল গণিত নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে ২+২=৪-এর সহজ গণিতের দিকে আবারো মুখ ফেরানো যাক। আমরা এবার প্রশ্ন রাখতে পারি– এ কথা কি আসলেও সত্য যে সব সময় ২+২=৪-ই হয়? হয় কি হয় না, বোঝার জন্য কবি অনন্য রায়ের 'আলোর অপেরা' কাব্যগ্রন্থ থেকে দুটো বাক্য তুলে ধরা যাক, যেখানে একজন ছাত্র এবং বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কথা বলছেন–

ছাত্র : কিন্তু প্রৌঢ় পণ্ডিত! তুমি তো অন্তত এইটুকু স্বীকার কর যে: দুইয়ের সঙ্গে দুইয়ের যোগফল মোট চার?

আইনস্টাইন : হ্যাঁ, যদি অবিশ্যি তারা গতিশীল অবস্থায় না থাকে।

প্রাগুক্ত

কথোপকথনে আইনস্টাইন-উল্লেখিত 'গতি' শব্দটি অবশ্যই বিশ্লেষণের দাবি রাখে, কারণ এই গতিশীলতাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন প্যারাডাইমে একই গণিতের রূপ হয় বিভিন্ন মাত্রার। জৈব-জীবনবস্তু হিসেবে একজন মানুষও যেহেতু কিছু গণিতযুক্তি নিয়েই বিশ্বে অবস্থান করে, সেহেতু কবিতার ২+২=৫-কে বোঝার জন্য জ্ঞান, চিন্তা, বুদ্ধি, সজ্ঞা, প্রজ্ঞা ইত্যাদির মতো মানবিক উপাদানগুলোর দেশ-কাল- কেন্দ্রিক অবস্থান ও গতিকে বিশ্লেষণ করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। আমরা জানি যে, একজন মানুষ জন্মের পর তার ছয়-ইন্দ্রিয়-মাধ্যমেই বিশ্ব থেকে বিভিন্ন কণাতরঙ্গের গণিতচিত্র তুলে নিয়ে ধরে রাখে তার মস্তিষ্কের স্নায়ু-নিউরোনে, ঠিক যেমনটি অডিও ক্যাসেটে বন্দি থাকে শব্দের তরঙ্গরূপ কিংবা ভিডিও ক্যাসেটে বন্দি থাকে দৃশ্যের কণাতরঙ্গবিন্যাস। মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কণাতরঙ্গ চিত্রের সাথে তুলনার মাধ্যমেই একজন মানুষ তারজীবন ও বিশ্ববিষয়ক বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার অর্থ উদ্ধার করতে পারে। তবে, এ কথা বলা আবশ্যক যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ সংশ্লেষণ ক্ষমতা একই মাত্রায় অবস্থান করে না এবং এ কারণে প্রতিটি মানুষের চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম বিভিন্ন স্তরে অবস্থান নিয়ে 'বিশ্ব-অর্থ'কেও দ্যোতিত করে বিভিন্ন মাত্রায়। এ জন্য এ কথা বলা যায়, সর্বজনীন বিশ্ব বলে কিছু নেই। প্রতিটি একক মানুষের বিশ্ব তার নিজস্ব

বিশ্ব হিসেবেই গ্রাহ্য।

বিশ্বের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আপেক্ষিকতা ব্যক্তি-ভাষার অর্থকেও বিভিন্ন মাত্রায় দ্যোতিত করতে পারে, ঠিক যেমন আইনস্টেনীয় বিশ্বে সময় ও গতি শুদ্ধ গণিতের রূপ ও স্বরূপকে করে বিভিন্ন মাত্রায় দ্যোতিত। ব্যক্তি-আপেক্ষিক এই বিশ্বে যে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উপস্থিত, সে ভাষাও সর্বজনীন নয় এবং ফলে কোনো এক একক দেশ-কালে ভাষামাধ্যমে ব্যক্তির সত্য কিংবা মিথ্যাকে প্রকাশ করা সম্ভব হলেও, সমগ্রের সত্য-মিথ্যাকে প্রকাশ করা যায় না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই আপেক্ষিক ভাষার জগতে ২+২=৪-এর মতো গণিত প্রায় ক্ষেত্রেই অচল এবং উপস্থিত করতে পারে শুধুমাত্র কিছু অধিবিদ্যাজাত বাচাল বক্তব্য কিংবা উপসংহার।

জাগতিক যুক্তির ভাষা দিয়ে যেহেতু সমগ্রের সত্য-মিথ্যাকে সঠিক মাত্রায় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, সেহেতু প্রকৃত সত্য কিংবা মিথ্যাকে বিশ্ব-বাস্তবতায় উন্মোচন করার জন্য একজন কবি-স্রষ্টা জাগতিক ব্যক্তি-আপেক্ষিকতাতে গ্রাহ্য করেই সৃষ্টি করেন ভাষার নতুন যুক্তি কিংবা গণিত, তৈরি করেন এক 'আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ', যাকে রূপকার্থে ২+২=৫-এর গণিত সমীকরণের সাথে তুলনা করা যায়। আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ নির্মাণের সময় এক নতুন ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ বিন্যাসে সৃষ্টি হয় নিত্যনতুন ভাষা আর এ নতুন যুক্তি-কাঠামোতে প্রিয়ার স্তন হয়ে যায় দুই চাঁদ, বসন্তের হাওয়া না বইলেও ফোটে ফুল, রজনীগন্ধার বনে ঝড়, ঘণ্টাধ্বনির রঙ হয়ে ওঠে ভায়োলেট।

মানবিক চেতনা-কাঠামোগ্রাহ্য কবিতার এই জটিল গণিতের কিছু উদাহরণ বিশ্লেষণসহ দেওয়া যাক। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় বলেন–

> অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এই পৃথিবীতে আজ
> যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
> যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই প্রীতি নেই–করুণার আলোড়ন নেই
> পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
> (অদ্ভুত আঁধার এক)

বিশ্লেষণ:

জাগতিক যুক্তির ভাষায় পৃথিবীতে আঁধার নামে প্রতিদিন, নিয়ম-মাফিক, সূর্য ডোবার পর এবং এই অন্ধকারের কণাতরঙ্গরূপ মানবিক চেতনায় গ্রাহ্য গাণিতিক-সত্য হিসেবে। জাগতিক ভাষার যুক্তি এ-ও বলে, কোনো অন্ধ ব্যক্তি আলোতেও কিছু দেখতে পায় না, আর অসভ্য প্রেম-প্রীতিহীন মানুষ বিশ্ব ও সভ্যতার বিপক্ষে। জীবনানন্দের কবিতায় কিন্তু জাগতিক যুক্তির ২+২=৪-এর গণিত গ্রাহ্য হয়নি। এখানে 'আঁধার' হয়েছে 'অদ্ভুত', যে অন্ধ সেই এই আঁধারে দেখতে পায় সবচেয়ে বেশি, আর পৃথিবী অচল হয়ে যায় প্রেম-প্রীতি-করুণাহীন মানুষের সুপরামর্শ ছাড়া। এ যুক্তি তো ২+২=৫-এর মতো এক আপেক্ষিক মিথ্যার প্রকাশ। এ-আপেক্ষিক মিথ্যা সত্য হয়ে ওঠে তখনই, যখন আমরা ব্যঞ্জনাসহ বুঝতে পারি, জাগতিক নিয়মভাঙা এক 'চরম দুঃসময়'কেই প্রকাশ করতে

চেয়েছেন কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়। চরম দুঃসময়ের সত্যকে উন্মোচন করার জন্য ২+২=৫-এর গণিত ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না কবির, আর এজন্য তিনি এক ‘প্রথম নতুন’ কণাতরঙ্গ বিন্যাসেই উপস্থাপন করেছেন তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি।

এবার বিশ্লেষণ করা যাক বিষ্ণু দে-র ক্রেসিডা শিরোনামে লেখা কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। তিনি লিখেছেন–

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোক ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।
(ক্রেসিডা)

বিশ্লেষণঃ

একটি মেয়ের প্রেমে একটি মানুষের অন্তর তোলপাড় হয়, একজন প্রেমিক দিশাহারা হতে পারে, এ সত্য আমাদের মস্তিষ্ক-নিউরোন গণিতে লিপিবদ্ধ আছে জাগতিক যুক্তিকে গ্রাহ্য করেই। ‘আকাশ বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল’ এবং ‘দ্যুলোক ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী’–এ ধরনের পঙ্‌ক্তিকেও জাগতিক ২+২=৪-এর যুক্তিকে গ্রাহ্য করা যায়, কারণ এ ধরনের অযৌক্তিক যুক্তি বারবার ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কিন্তু ‘কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে’ এ-পঙ্‌ক্তিটি প্রাগুক্ত দুই পঙ্‌ক্তির সাথে কোনো রকম সম্পর্ক স্থাপন না-করে হঠাৎ করেই উপস্থিত, যাকে আমরা বলতে পারি উল্লম্ফন এবং এ কারণেই কবিতাটিতে অবস্থান করছে এক ধরনের আপেক্ষিক মিথ্যা কিংবা ২+২=৫-এর গণিত-যুক্তি। যে পাঠক ট্রয়লাস, ক্রেসিডা ও হেলেনের ত্রিমুখী প্রণয় সম্পর্কে জানেন, তিনি হয়তো-বা হেলেনের প্রেমকে ‘রজনীগন্ধার বনে ঝড়’ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন (আপেক্ষিক মিথ্যা থেকে সত্য খুঁজে নেওয়ার তাগিদে) কারণ ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রেমে ঝড় হিসেবে উপস্থিত ছিল হেলেন নামের মেয়েটি। অবশ্য, এ কথা সত্য যে, কবিতাটি থেকে সত্যের সুন্দর তুলে আনার জন্য ট্রয়লাস, ক্রেসিডা ও হেলেন বিষয়ক ইন্দ্রিয়তরঙ্গ-চিত্র কিংবা গণিত উপস্থিত থাকতে হবে পাঠকের মস্তিষ্ক-নিউরোনে।

শামসুর রাহমানের কবিতা ‘ইকারুসের আকাশ’-এর কয়েক পঙ্‌ক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন–

.... তাই কামোদ্দীপ্তা যুবতীর মতো
অপ্রতিরোধ্য আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে অনেক
উঁচুতে মেঘের স্তরে স্তরে
রৌদ্রের সমুদ্রে নিয়ে গেলো। দ্বিধাহীন আমি উড়ে
গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোন রক্ষাকবচহীন
প্রার্থনার মতো।

(ইকারুসের আকাশ)

বিশ্লেষণ:

কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ‘কামোদ্দীপ্তা যুবতীর মতো অপ্রতিরোধ্য উচ্চাভিলাষ’ জাগতিক যুক্তির ভাষাকে গ্রাহ্য করলেও ‘মেঘের স্তরে রৌদ্রের সমুদ্রে পৌঁছা’ এবং ‘সূর্যের ঠোঁটে রক্ষাকবচহীন প্রার্থনার মতো উড়ে যাওয়া’ জাগতিক যুক্তির ইন্দ্রিয়তরঙ্গের তুলনায় অর্থবোধক হয় না। এ কবিতার রূপ ও স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য ‘ইকারুস’ সম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়তরঙ্গ ধারণ করাও প্রয়োজন।

কবিতা ও গণিতের সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে যে আলোচনা করা হল, তা হয়তো-বা সব পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কবিতার মতো সৃষ্টির জগৎকে গণিত-গদ্য দিয়ে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই মতামত দিতে পারেন বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচক। তবে, গণিতকেন্দ্রিক আমাদের এই জীবনকে গ্রাহ্য করলে এবং ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে গণিত-যুক্তি ক্রিয়া-বিক্রিয়া মেনে নিলে, আমাদের হয়তো-বা এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, গণিত দিয়ে কবিতা ও কবিতার নন্দনতত্ত্বকে কিছুটা হলেও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অন্তত, বর্তমানের প্যারাডাইমগ্রাহ্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের দর্শন এ যুক্তির স্বপক্ষে দাঁড়াবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গ: কবিতা, কবি ও পাঠক

কবিতা কাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তরে কোনো ধ্রুব সূত্রকে এখনো আমরা খুঁজে পাইনি। বিভিন্ন কবি-স্রষ্টা, কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং এ সব ভিন্নমতের পেছনে কাজ করেছে তাঁদের নিজস্ব দেশ-কাল অবস্থান ও সৃষ্টির দর্শন। কোনো একজন কবির দেশ-কাল অবস্থান ও দর্শন প্রতিনিয়তই বিবর্তনশীল, আর এ কারণে কবিতার ও স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁরা যে বক্তব্য প্রকাশ করেন তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হলেও, সময় নিরপেক্ষ থেকে সর্বকালের জন্য সর্বজনীন হয় না। বর্তমান বিজ্ঞান-দর্শনের যুগে কবিতাশিল্পকে ব্যবচ্ছেদ করে আমরা দেশ-কাল-মাত্রা অতিক্রম করা একটি সংজ্ঞা উপস্থিত করতে পারি, যদিও এ সংজ্ঞা হবে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রতিপাদনযোগ্য, কিন্তু সম্ভাব্য সত্যের কাছাকাছি। তবে কবিতার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করার আগে কবিতা, কবি ও পাঠকের রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

দুই

সৃষ্টির রূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা খুব সহজেই এ কথা বলতে পারি যে, মানবিক মৌলিক-সত্তা সব সময়ই এক অনিশ্চয়তাবদ্ধ ঠিকানাহীন বৈশ্বিক বস্তুবলয়ে কোয়ান্টায়িত অবস্থায় অবস্থান নিয়ে তার নিজস্ব অহং-কে নির্দিষ্ট সত্যমাত্রায় প্রকাশ করতে চায় এবং এর ফলেই বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর তৈরির মাধ্যমে একজন মানুষ নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি করে। এই নতুন নতুন জগৎ বা দেশ-কাল সৃষ্টিকেই আমরা দর্শন ও বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করি এবং বিজ্ঞান-দর্শন বা জ্ঞানতেজই আমাদের চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমকে বিবর্তিত করে অহং ও জগৎসম্পর্কীয় নতুন চিত্র-ছবিকে উপস্থিত করে। পরিবর্তনশীল মানবিক অহং-দর্শন প্রতিমূহূর্তেই একজন স্রষ্টার প্রশান্ত মনে আনতে পারে যন্ত্রণার ধস, আর এ ভাঙনের মুখেই একজন স্রষ্টা-কবি বা শিল্পী কিছু অতিজাগতিক উপলব্ধি দিয়ে নতুন সৃষ্টির বিকাশে, নতুন সময় তৈরি করে নেন। সৃষ্টির অবস্থান যেহেতু এক নতুন দেশ-কাল-মাত্রার বিশ্বে, সেহেতু জাগতিক সত্য ও গাণিতিক যুক্তি অনেক সময় সৃষ্টির স্বরূপকে অর্থবোধক করে তুলতে পারে না। আর এ কারণেই সৃষ্টির রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করার জন্য জাগতিক সত্যের চোখ ও মনের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী একটি তৃতীয় বিশ্বাসের চোখ ধারণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বোদলেয়ারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন– 'ভালো কবিতার সত্তসার অপরিহার্যভাবেই অর্থহীন। কারণ একটি কবিতা কিছু বিশ্বাসকে ধারণ করে এবং এ বিশ্বাসের মাঝেই নিহিত থাকে কবিতার ঐশ্বর্য ও শক্তি। যুক্তির অলীক শর্ত দিয়ে কখনো কবিতার অন্তর্গত কল্পনার মনোজগৎকে বিচার করা সঙ্গত নয়, কারণ যুক্তি কেবলমাত্র জাগতিক ধ্রুব গণিতকে বিশ্বাস করে, আর কল্পনার জগৎ মানুষের স্মৃতিতে গ্রন্থিত উপলব্ধি-সংবেদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।' বোদলেয়ারের উপলব্ধিতে প্রকাশিত 'অর্থহীন কবিতা-সত্তা' আসলে পরম সত্যকে প্রকাশ করার জন্য একজন কবির 'আপেক্ষিক-মিথ্যার জগতে' বিলীন হবার চিত্রকেই তুলে ধরে। কবিতার কিছু লাইন বিশ্লেষণ করলে এ ধারণাকে আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতায় 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/ মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'– এ দুটি বাক্যকে জাগতিক ভাষার যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের মস্তিষ্কে গ্রন্থিত বস্তু-অনুষঙ্গ, চিত্ররূপ ও শব্দরূপ কোনো অবস্থাতেই হঠাৎ করে রমণীর চুলকে 'কবেকার অন্ধকার' আর 'বিদিশার নিশা'-র সাথে তুলনা করতে পারে না, কিংবা একটা নারীর মুখে 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' ও খুঁজে পায় না। কিন্তু এটাও সত্য যে, কবির এই 'আপেক্ষিক মিথ্যাবচন' জাগতিক সত্যকে ছাড়িয়ে একটা 'আরো সত্যের' কিংবা 'চরম সত্যের' বলয়ে আমাদের উপস্থিত করে দিয়ে, একটা নতুন দেশ-কাল বা জগতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মাধ্যমে, বনলতা সেনের ছবিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। ক্লাসিক চৈতন্যবাহিত 'কবেকার অন্ধকার', 'বিদিশার নিশা' আর 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' বনলতা সেন-সম্পর্কীয় আমাদের উপলব্ধিকে এক স্বপ্নময় সজীব তৃপ্তির ভুবনে নিয়ে যায়, আর সৃষ্টির এ রকম ঘটনাই হয়ে ওঠে কবিতার বিষয়।

আল মাহমুদ যখন তাঁর কবিতায় বলেন– 'গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল কবুল।'– তখন বাক্যটি আপাতঃসত্যের যুক্তিতে মিথ্যাভাষণ হয়ে পড়ে, কারণ কোনো কন্যাই গাঙের ঢেউয়ের মতো শব্দ করে বিবাহ কবুল করে না। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, আপেক্ষিক-

মিথ্যার এই প্রকাশের জন্যই বাক্যটিতে আমরা কবিতার আমেজ খুঁজে পাই। উদ্ধৃত কবিতার লাইনটিকে যদি কিছুটা বদলিয়ে বলা হয়– 'কোরান-হাদীস মতো বল কন্যা কবুল, কবুল'– তবে নিঃসন্দেহে বাক্যটিতে একটা জাগতিক যুক্তিকে খুঁজে পাব, কিন্তু তখন আর কবিতাটিতে কবিতা থাকবে না। কবিতায় উপস্থিত মিথ্যার জগৎকে উপলব্ধি করেই হয়তো-বা ইয়েটস বলেছেন– 'আমরা যখন অপরের সাথে ঝগড়া করি তখন সে ঝগড়া থেকে কিছু কৃত্রিম বাগাড়ম্বরপূর্ণ শব্দ উদ্ধার করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যখন নিজেই নিজের মনের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হই ঠিক তখনই সৃষ্টি হয় একটা কবিতার।' তিনি আরো বলেন– 'কবিরা খুব ভালো মিথ্যা কথা বলতে পারেন।'

কোনো স্রষ্টা-কবি বা শিল্পীর সৃষ্টির জগতে মিথ্যা থাকলেও তার প্রকাশ হয় অনিশ্চয়তা নিয়ে। কখন কিভাবে একটা ভালো কবিতার জন্ম হবে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি কিছু সত্য-গণিত, যুক্তি ও মিথ্যাবচনকে অবলম্বন করে কবিতা লিখতে বসেন, তবে তা হতে পারে কিছু শব্দের ঢিপি কিংবা পাহাড় অথবা কারুকাজে ভরপুর একটা অর্থহীন কিংবা অর্থপূর্ণ পদ। এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও এলিয়টের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন– 'কবিতা হল শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্লাবন, যার সৃষ্টি হচ্ছে এক প্রশান্ত আবেগের অনুস্বরণ থেকে'; আর এলিয়টের ভাষায়– 'সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও উৎকৃষ্ট শব্দাবলি একত্র করে, কোনো এক পরমোৎকৃষ্ট ছন্দে ও বিন্যাসে একটা ভালো পদ্য রচনা করা যায়, কিন্তু একটি কবিতার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে পদ্যকে অতিক্রম করে যাওয়া প্রাণবন্ত বাড়তি আরও কিছু থাকে। কবিতায় গ্রন্থিত আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের যা বলতে চায়, তা কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।'

তিন

পদ্যরচনা ও কবিতার সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করতে গেলে আবশ্যিকভাবেই কবিকেও বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের পরিচিত সাহিত্য-শিল্প জগতে আমরা দু'রকম কবিকে শনাক্ত করতে পারি। যে কবি কিছু অনিশ্চয়তাহীন ধ্রুব জাগতিক যুক্তি অথবা মিথ্যা সাজিয়ে কিংবা অগ্রজ স্রষ্টা-কবির অহংদর্শন ও প্রকাশভঙ্গিকে কেন্দ্র করে, শুধুমাত্র একজন Craftsman হিসেবেই কবিতা রচনা করেন, তাদের আমরা কারুকবি হিসেবে চিহ্নিত করব। কারুকবিরা সাধারণত একজন কারুশিল্পীর মতো শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তার পূর্বনির্ধারিত বক্তব্যকে কবিতা-ব্যাকরণ-ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই প্রকাশ করেন। বেশিরভাগ সময়ে কারুকবিরা তাদের কবিতা অচেতন-গ্রন্থিত ঐতিহ্য অবলম্বনে রচনা করলেও, মাঝে-মধ্যেই তা সচেতনভাবেও করে থাকেন। কারুকবিরা তাঁর কবিতায় কাঠামো, শরীর, ছন্দ ও বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং এ কারণে তাঁদের কবিতা অনিশ্চয়তাহীন কবিতা-ব্যাকরণের সংগঠন হিসেবেই গণ্য হয়। তবে মাঝে-মধ্যে কারুকবিতার মাঝেও ঐতিহ্যবাহিত কবিতাসত্তার উপস্থিতি থাকতে পারে এবং তার ফলে হঠাৎ হলেও কারুকবিতায় কবিতার আমেজ পাওয়া অসম্ভব নয়।

যে কবির অন্তরে একজন স্রষ্টা-শিল্পীর উপস্থিতি থাকে, তাকে আমরা চারুকবি কিংবা কবি হিসেবে চিহ্নিত করব। একজন স্রষ্টা-কবি সবসময়ই অনিশ্চয়তা নিয়ে কবিতা সৃষ্টি করেন এবং

কবিতায় ঐতিহ্য ও ব্যাকরণ তাঁর জানা থাকলেও, প্রকাশের সময় একটি কবিতা শুধুমাত্র কবিতা হিসেবেই প্রকাশ পায়। কোনো স্রষ্টা-কবি তাঁর কবিতার বিষয়, শরীর ও সংগঠনকে রচনার আগে নির্ধারণ করতে পারেন না, কারণ তার অহংযন্ত্রণা নতুন উপলব্ধি নিয়ে কখন কিভাবে নতুন সময় ও জগৎ সৃষ্টি করবে, তা থাকে তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। কেবলমাত্র সৃষ্টির পরেই মনের প্রশান্ত ভাব একজন কবিকে তার কবিতার সাথে প্রথম পাঠক-হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্রষ্টাকবিতা উপলব্ধি সম্পর্কে পল ভ্যালরি'র বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন– 'আমি কিছু বলতে চাই না, শুধুমাত্র কিছু সৃষ্টি করতে চাই, আর আমার সৃষ্টি করার বাসনাই আমি যা বলতে চাই তা কবিতায় নিয়ে আসে।'

একজন স্রষ্টা-কবির কবিতার সবটুকু অংশই কবিতা হবে এটা ভাবাও ঠিক নয়। এমনও হতে পারে যে অনেকগুলো কবিতার মাঝে শুধুমাত্র একটি কবিতাই বিশুদ্ধ সৃষ্টি হয়ে যুগোত্তীর্ণ হয়ে রইল, কিংবা একটি দীর্ঘ কবিতার শরীরে শুধুমাত্র কিছু লাইনই কবিতার ব্যঞ্জনা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকল কাল-মাত্রাকে অতিক্রম করে। কোলরিজ এ বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে– 'একটা কবিতার সবটুকুই কবিতা হবে এমনটা হয় না, কিংবা হতেই হবে এমন ভাবাও ঠিক নয়।'

চার

কবি ও কবিতার মাঝে পাঠকের স্থান। মৌলিক জীবনবস্তু হিসেবে প্রতিটি মানুষই যেহেতু ভিন্ন মাত্রায় ও সংগঠনে অবস্থান করে, সেহেতু কবি-স্রষ্টার সাথে একজন পাঠকের চেতনার কোয়ান্টাম স্তরও ভিন্ন মাত্রায় ও সংগঠনে থাকাই স্বাভাবিক। দৈনন্দিন জীবনে একজন সাধারণ পাঠক, তার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধারণা-চিত্র গড়ে তোলে, তা হল জাগতিক বস্তুপ্রকৃতির সর্বনিম্ন কোয়ান্টাম ধাপের কাছাকাছি স্তর এবং এর ফলে উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থানকারী কোনো কবিসৃষ্ট নতুন দেশ-কাল-মাত্রা ও জগৎ সম্পর্কে তার কোনো গ্রাহ্য উপলব্ধি থাকে না, ফলে কবিতা বা নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তোলে। বিবর্তনের মাধ্যমে জাগতিক জৈব ও অজৈব বস্তুমাত্রা ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে এবং এজন্য সৃষ্টির প্রকাশও চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম পরিবর্তনের সাথে সাথে জটিল থেকে জটিলতর সংগঠনের দিকেই প্রবাহমান। একজন স্রষ্টা-কবি তাঁর অহং-দর্শনকে কেন্দ্র করে তাঁর নিজের জন্যই কবিতা লেখেন এবং সৃষ্টি করাটাই হয়ে ওঠে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য (Primary Wish)। একজন পাঠক তাঁর কবিতা পড়ুক ও বুঝুক– এ রকম ভাবনা একজন কবির মনে গৌণ-ইচ্ছা (Secondary Wish) হিসেবেই অবস্থান করে, ফলে পাঠকের চাহিদার দিকে কোনো সৃষ্টিশীল কবি সচেতনভাবে খেয়াল রাখতে পারেন না। সৃষ্টি কোনো সময়ই সর্বজনীন হয় না, আর এ কারণে সৃষ্টিকে বোঝার জন্য জ্ঞানতেজ গ্রহণের মাধ্যমে একজন পাঠককে তার চেতনার কোয়ান্টাম স্তর উন্নত করে কবি-স্রষ্টার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। কবি-স্রষ্টার কাজ হল বিভিন্ন প্রবন্ধ ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি-চিন্তাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কবি ও পাঠক দুজনেই কবিতার সাথে তুলনামূলকভাবে ভিন্ন প্যারাডাইম বা চেতনা-কাঠামোতে অবস্থান করেন এবং এর ফলে কোনো কবিতাই আসলে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এমনও হতে পারে যে, একজন কবি নিজেই জাগতিক যুক্তির প্যারাডাইমে থেকে

তাঁর নিজের সৃষ্ট, সৃষ্টিশীল সময়ের কবিতাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। পাঠকের বেলায় এই প্যারাডাইম-সমস্যা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এর ফলে একই কবিতা সময়ের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা একজন তরুণ কিংবা তরুণীর কাছে জাগতিক প্রেমের কবিতা হিসেবে বিবেচিত, সেই একই কবিতা মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে অনিশ্চিত আগামী-চিন্তায় ঈশ্বরসম্পর্কীয় অতিপ্রাকৃতিক অনুভূতি দিতে পারে। আসলে কবি, কবিতা ও পাঠকের মাঝে বিদ্যমান সমস্ত সম্পর্কই আপেক্ষিক এবং এ কারণে পাঠকের উচিত নিজেকে তৈরি করে নিয়ে তার নির্দিষ্ট অহংদর্শনকে কেন্দ্র করেই একটি কবিতা থেকে কবিতাকে উদ্ধার করা।

পাঁচ

কবি ও কবিতার রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রেক্ষিতে আমরা সৃষ্টির অনিশ্চয়তা, সৃষ্টির জন্য আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং কবি, কবিতা ও পাঠকের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পেরেছি। কবিতা প্রকাশের জন্য একজন কবিকে (কারুকবি নয়) একটি অনিশ্চয়তাবদ্ধ আপাত অযৌক্তিক সময় ও জগৎ সৃষ্টি করতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। জগৎ ও জীবনের অংশ হয়েও একজন কবি যখন তাঁর পরিবেশ, জগৎ ও অহংদর্শনকে জাগতিক যুক্তির ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মিথ্যাই হয়ে ওঠে সৃষ্টির উপাদান, এ সত্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতার সংজ্ঞা হতে পারে এ রকম– 'ভাষানির্ভর অনিশ্চয়তাবদ্ধ যে মানবিক সৃষ্টি প্রচলিত প্রাকৃতিক কিংবা জাগতিক কাঠামোর বাইরে অবস্থান করে কোনো এক শৃঙ্খলিত কণাতরঙ্গ-ব্যবস্থায় মানুষের মনে চরম ও পরম সত্যসম্পর্কীয় অতিপ্রাকৃতিক সুন্দর কিংবা অসুন্দরের উপলব্ধি দেয়, তাকেই আমরা কবিতা বলব।'

কবিতার উল্লিখিত সংজ্ঞাটি বর্তমান চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমে গ্রহণযোগ্য হবেই, এমন ধ্রুব ধারণা লেখকের নেই। তবে কবিতার সংজ্ঞা দেবার এই প্রচেষ্টা কবিতাসম্পর্কীয় কিছু আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি করতে পারে, কিছুটা অনিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়েই এ কথা বলা যায়।

কবিতা ও যুক্তির ভাষা

কবিতা/কবিতা নয়, এই যুগ্ম-বৈপরীত্যকে কেন্দ্র করে পাঠক ও সমালোচকেরা অনেক সময় চরম বিভ্রান্তিতে ভোগেন। এ কথা সত্য যে, মন কবিতার স্বাদ পেলেও, অনেক ক্ষেত্রেই জাগতিক যুক্তির

ভাষা দিয়ে কবিতার সত্য-মিথ্যাকে প্রকাশ করা যায় না। আবার, এমনও হয়, একটি অকবিতা বা নির্মিত কবিতাকে প্রচলিত জাগতিক যুক্তির ভাষা আর বৈশ্বিক যুক্তির পরিবেশ, অন্তরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, জোর করেই কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। কিন্তু, কেন এমন হয়? প্রশ্নটি করা যতটা সহজ, উত্তর দেওয়া ততটা নয়, কারণ ছন্দ-মাত্রার কিছু সরল গণিত থাকলেও, কবিতার নন্দনতত্ত্বের কোনো গণিত নেই। দুই যোগ দুই চার, তিন দু-গুণে ছয়, এ রকম কোনো নামতা নেই কবিতার সত্য-মিথ্যাকে নির্ধারণ করার জন্য এবং এ জন্য, কবিতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশ্নের প্রান্তকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। সঙ্গত কারণেই মন বলে জগৎ, জীবন, বস্তু, সময় ইত্যাদির মতো বিষয়কে যদি গণিত দিয়ে নির্ধারণ করা যায়, তবে কবিতাকে গণিত দিয়ে বোঝা যাবে না কেন? জীবনের কেন্দ্রমূলে যে জৈব-রাসায়নিক গণিত কাজ করে, সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধি গ্রহণে-বর্জনে সে গণিতের কি কোনো ভূমিকাই নেই? উত্তর পাওয়া যায়, অন্তত বর্তমানের প্যারাডাইম-গ্রাহ্য জ্ঞানদর্শন বলে-কবিতারও গণিত আছে, সম্ভাবনা তাই।

দুই

কবিতার গণিত যদি থেকেই থাকে তবে তা মানবিক পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের (কিংবা ইন্দ্রিয় ছয়-এর) গণিত হবার সম্ভাবনাই বেশি, আর এ সম্ভাবনাকে যাচাই করতে হলে মানুষের ভাষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে প্রথমেই। আমরা জানি, জন্মের পর একজন মানুষ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎ, জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন যৌক্তিক ধারণা তুলে নিয়ে ধরে রাখে স্মৃতির নিউরোন কোষে। নিউরোন কোষ মানে মস্তিষ্কের অসংখ্য কিন্তু নির্ধারিত আমিষ কোষ, যেখানে বিভিন্ন মাপের ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ কিছু জটিল জৈব-বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায়, কোনো এক নির্দিষ্ট গাণিতিক বিন্যাসে সংরক্ষণ করে জীবন ও বিশ্বের মাঝে বিদ্যমান অসংখ্য যুক্তির সম্পর্ককে। এ যুক্তি গণিতের এবং এর ফলেই প্রতিষ্ঠা পায় মানুষের অস্তিত্ব। নিউরোনে গ্রন্থিত যুক্তির গণিতই আমাদের বলে দেয় 'আলো কই'? 'কালো কেন?' 'ওটা গাছ', 'ভালোবাসা', 'তুমি কই?' ইত্যাদির মতো প্রকাশিত ভাষার অর্থ। সস্যুরের ভাষাতত্ত্বে আলোচিত ভাষাচিহ্নের বিপরীতে যে দ্যোতক/দ্যোতনার অবস্থান দেখানো হয়, তা আসলে মস্তিষ্কের নিউরোনে গ্রন্থিত গণিতের বিপরীতে সমতুল্য ভৌত-বিশ্বের অন্য এক গণিতকে চিহ্নিত করার বিষয়, আর এ গণিত-নির্ধারণ ক্রিয়ায় কাজ করে এক ধরনের গ্রহণ-বর্জন নীতি। এ যেন অনেকটা ২+২=৪, ৩ী২=৬-এর মতো সূত্রবদ্ধ গণিতেরই বিম্বিত প্রতিরূপ। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। 'মানুষ' শব্দের বিপরীতে নিউরোনে গ্রন্থিত থাকে, দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও স্বাদ-এর কণা-তরঙ্গ-সৃষ্ট কোনো একটি নির্দিষ্ট জৈব-গণিত-চিত্র, ঠিক যেমনটি বন্দি থাকে একটি অডিও ক্যাসেটে শব্দের তরঙ্গ-চিত্র কিংবা ভিডিও ক্যাসেটে আলোর কণা-তরঙ্গের বিদ্যুৎবলয়। আমরা যখন 'মানুষ' শব্দটি শুনি কিংবা একজন মানুষকে দেখি, তখন সে শব্দ বা দৃশ্যের মৌলিক কণা-তরঙ্গ-বিন্যাস গাছ, পাহাড়, গরু, বানর কিংবা অন্য কোনো বৈশ্বিক বস্তুর কণা-তরঙ্গ-গণিত-চিত্রের মতো হয় না এবং এ কারণে, মস্তিষ্কের নিউরোন-কোষ 'মানুষ' শব্দ বা দৃশ্যের বিপরীতে ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত মানুষ নামের জৈব-গণিত-চিত্রের সাথে তুলনার পর 'মানুষ'কে মানুষ হিসেবেই গ্রাহ্য করে। আসলে ছবির সাথে ছবির তুলনায়, শব্দের সাথে শব্দের তুলনায় কিংবা অন্য যে-কানো

ইন্দ্রিয়-অনুভূতির সাথে একই মাত্রার ইন্দ্রিয়-অনুভূতি তুল্য হবার পরই জীবন ও বিশ্ব অর্থবোধক সত্তা নিয়ে উন্মোচিত হয় আমাদের কাছে এবং এজন্য, এ কথা বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি কণা-তরঙ্গের গণিত হিসেবেই জীবন-বিশ্বে উপস্থিত, আর গণিত ভৌত-বিশ্বের প্রতিফলিত/বিম্বিত রূপ হিসেবেই অর্থবোধক।

এখানে বলা আবশ্যক, আলোর তরঙ্গ কোয়ান্টা, শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধের কণা-তরঙ্গ অভিঘাত বিভিন্ন বৈশ্বিক বস্তু ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক-গণিত সৃষ্টি করে এবং তা আমাদের মস্তিষ্ক-নিউরোনে সংরক্ষিত হয় বলেই বিশ্ব-বস্তু ও ঘটনাসমূহের সাথে নিজেদের তুলনা করার পর আমরা আমাদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি, আর বিশ্বও অস্তিত্বশীল হয়ে ধরা দেয় আমাদের সত্তায় চেতন-চিত্র বা ফেনমেনন হিসেবে, কোনো এক নির্দিষ্ট গাণিতিক প্রক্রিয়ায়। জীবন ও বিশ্বের প্রবহমান গণিতকে গ্রাহ্য করলে, এ কথা বলা সম্ভব যে, মানবিক সত্তার উপাদান ভাষাও হল এ ধরনের যুক্তির গণিত, যা উচ্চারিত ধ্বনির কোনো এক নির্দিষ্ট শব্দ-তরঙ্গ-বিন্যাসে কিংবা লিখিত চিত্ররূপের কোয়ান্টাম-তরঙ্গ-মাত্রাসহ গাণিতিক গ্রহণ-বর্জন নীতিকে গ্রাহ্য করেই জীবন ও বিশ্বকে মানুষের সত্তা, সমাজ ও পরিবেশে, অর্থবোধক করে তোলে। ভাষাভিত্তিক এই যুক্তির গণিত অনেকটা ২+২=৪-এর মতোই। 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন' এমন একটা অসম্পূর্ণ বাক্য লিখলে মানুষের মস্তিষ্কে অঙ্কিত নিউরোন-গণিত শূন্যস্থানটি পূরণ করবে যুক্তি দিয়েই। যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানে সে শূন্যস্থানে লিখবে 'কবি', যে জানে না সে লিখতে পারে 'মানুষ', কারণ রবীন্দ্রনাথ মানুষেরই নাম হয়। কিন্তু, আফ্রিকার একজন মূর্খ আদিবাসীকে যদি একই শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হয় তবে সে থাকবে উত্তরহীন, কারণ তার নিউরোন-গণিতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কীয় কোনো চিত্র বা ইন্দ্রিয়-প্রতিরূপ সংরক্ষিত হয়নি। অতএব বলা যায়, '২+২=৪', এ প্রশ্নের উত্তর আসবে যে প্রক্রিয়ায়, 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন', এই ভাষা-সূত্রের শূন্যস্থানও পূরণ হয় প্রায় একই রকম যৌক্তিক ক্রিয়ার মাধ্যমে।

তিন

ভাষার যুক্তি আছে, গণিত আছে, এ কথা মেনে নিলেও, ভাষা সবসময় সত্য প্রকাশ করতে পারে না। ভাষার এ সমস্যার মূল্যে অবস্থান করে জৈব-গণিতেরই বিভিন্ন মাত্রার ক্রিয়া-বিক্রিয়া। বিষয়টিকে কিছু উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাক। ধরা যাক সাহারা মরুভূমিতে বসবাস করছে এমন একজন লোক আছে এবং তার কাছে 'বৃক্ষ' বলতে বোঝায় কিছু ক্যাকটাস কিংবা বড়জোর কিছু খেজুরগাছ। সে লোকটির কাছে গিয়ে যদি 'সুন্দরবনের' বর্ণনা দেওয়া হয় তবে তার মস্তিষ্কের গণিত গ্রহণ-বর্জন নীতিকে মেনে নিলেও, ক্যাকটাস আর খেজুরগাছকেন্দ্রিক গণিত-চিত্রকে যোগ-ভাগ করে চিন্তার প্রান্ত-ছবি খুঁজতে চাইবে লোকটি, সুন্দরবনের সৌন্দর্য কিছুতেই গ্রহণ করবে না সে। আর তাই, শুধুমাত্র ভাষামাধ্যমে তাকে সুন্দরবনের আসল রূপ ও স্বরূপ কিছুতেই বোঝানো যাবে না। দার্শনিক হিবটগেনস্টাইন তাই বলেন– 'যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে চিন্তা করা যায় না তাকে ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব নয়।' হিবটগেনস্টাইন-এর বক্তব্যে উল্লেখিত 'চিন্তা' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জীবন ও বিশ্বের যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের পর মানবিক চেতনায় যদি গাণিতিক

যুক্তির তুলনামূলক আদান-প্রদান কিংবা গ্রহণ-বর্জন নীতি ক্রিয়াশীল থাকে, কেবলমাত্র তখনই ‘চিন্তা’ সত্তার উপাদান হিসেবে সত্যমূল্যসহ উপস্থিত হতে পারে। অতএব, এ কথা বলা যায় যে, চিন্তাহীন মানবিক অবস্থান আসলে হল ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গণিতহীন স্তব্ধ মস্তিষ্ক-নিউরোন।

এবার, চিন্তার সাথে ভাষা-প্রকাশের কী সম্পর্ক রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। যদিও প্রতিটি মানুষই চিন্তা করে এবং ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, তবু চিন্তা ও ভাষা-প্রকাশের যৌক্তিক সম্পর্ক প্রতিটি মানুষের বেলায় একই মাত্রায় কাজ করে না। ‘কেন করে না?’– এমন প্রশ্ন এলে মানবিক সত্তার উপাদান ‘জ্ঞান’কে আলোচনায় আনতে হয়। জীবন ও বিশ্বসম্পর্কীয় যে অনুভূতি-ধারণা আমরা আমাদের মস্তিষ্ক-নিউরোনে জৈব-গণিত-চিত্র হিসেবে ধারণ করি, তা অবস্থান করে প্রতিটি মানব-এককের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়, যাকে আমরা জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। জগৎ ও পরিবেশ থেকে প্রতিটি মানুষ সমমাত্রায় ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ গ্রহণ করে না, নিউরোনে সংরক্ষণ করে না একই সংখ্যক জৈব-গণিত-চিত্র এবং এর ফলে প্রতিটি মানুষের চেতনার স্তর ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে অবস্থান নেয় আগামীর সম্ভাবনাকে গ্রাহ্য করে, যাকে বিজ্ঞানের-দর্শন চিন্তায় ‘চেতনার কোয়ান্টাম স্তর’ নামে চিহ্নিত করা সম্ভব। শক্তির বিভিন্ন কোয়ান্টাম স্তরে পানি যেমন বাষ্পীয় (জলীয় বাষ্প), তরল (জল) ও কঠিন (বরফ) অবস্থায় অবস্থান করতে পারে, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-লব্ধ জ্ঞানশক্তির বিভিন্ন স্তরসহ মানুষের চেতনার কোয়ান্টাম স্তরও অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। বিষয়টি গ্রাহ্য করে এ কথা বলা সম্ভব যে, এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানব-এককই মৌলিক জীবন-বস্তু হিসেবে যাপন করে থাকে তার নিজস্ব একক জীবন।

ভিন্ন ভিন্ন কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থান করার কারণে প্রতিটি মানুষ যে-কোনো একক দেশ-কাল-মাত্রায় একই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভিন্ন মাত্রার চিন্তা-ভাবনা করে থাকে এবং ফলে জাগতিক যুক্তি নিয়ে প্রকাশিত ভাষাও দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন মাত্রার দ্যোতনা নিয়েই উপস্থিত হয় আমাদের কাছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক। ধরা যাক কোনো একদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণের সময় জনাব ‘ক’, মিস্টার ‘খ’ আর শ্রী ‘গ’ একই সাথে মাঠে উপস্থিত হলেন। তার কথা বললেন একে অপরের সাথে। তাদের কথোপকথনের সাথে ‘ভাষা-অর্থ’ প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল দেখা যাক–

কথোপকথন :

ক: কেমন আছেন মি. খ?

খ: নাহ্, ভালো নেই, আপনি?

ক: আছি ভালোই। তা, মি. গ, আপনার খবর বলুন।

গ: চলছে কোনোভাবে। আপনার খবর বলুন।

ক:	এইতো, মোটামুটি, চলে যাচ্ছে।
খ:	খুব ভালো কথা।

গ:	মি. ক, আপনিতো ভালোই থাকেন। আমাদের যত প্রবলেম।

ক:	আপনাদের দেখে কিন্তু বেশ ফ্রেশ লাগছে।

খ:	চলুন হাঁটা যাক।

গ:	চলুন, চলুন।

ভাষা-অর্থ-প্রতিক্রিয়া

মি. 'খ' ভালো নেই শুনে জনাব 'ক' ভাবলেন মি. 'খ'-এর শরীর খারাপ (কারণ জনাব 'ক' নিজেও আজকাল আমাশয় রোগে ভুগছেন)। শ্রী 'গ' ভাবলেন, মি. 'খ'-এর উত্তর অর্থনীতির সাথে জড়িত, কারণ গত সপ্তাহে তার দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। জনাব 'ক', শ্রী 'গ'-এর উত্তরে ভাবলেন– 'তুমিতো ভালো থাকবেই, ছেলে-মেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই তোমার, আমার হয়েছে যত্তোসব জ্বালা।' কথার উত্তর দিতে গিয়ে জনাব 'ক' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে মনে রাগ করেই বললেন– 'আছি ভালোই, এইতো মোটামুটি।' মি. 'খ' আর শ্রী 'গ' ভাবলেন, জনাব 'ক' সবসময় খুবই ভালো থাকেন, কিন্তু সহজে কোনো কিছু প্রকাশ করতে চান না..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত উদাহরণ মতে দেখা গেল, শুধুমাত্র 'ভালো থাকা আর না-থাকাকে' কেন্দ্র করে তিনটি মানুষের মনে বিভিন্ন মাত্রার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে ভাষাভিত্তিক যে-কানো শব্দ বা ভাষাচিহ্নেই এমন বহুমাত্রিক দ্যোতনার সম্ভাবনা থেকেই যায়। যেমন ধরা যাক 'ভালোবাসা' শব্দটির কথাই। একটি শিশুর বেলায় 'ভালোবাসা' শব্দটি পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা সমপর্যায়ের সম্পর্কযুক্ত গণিত-চিত্রকেই উপস্থিত করবে, একজন যুবক কিংবা যুবতীর বেলায় 'ভালোবাসা' শব্দটি মূল দ্যোতনার সাথে যৌন-বিষয়ক অনুষঙ্গ টেনে আনবে, আর একজন বৃদ্ধের বেলায় একই 'ভালোবাসা' অন্য রকম অর্থের যোগান দিতে পারে আমাদের। 'ঈদিপাস' শব্দটির বিপরীতে আমরা যে দ্যোতনা আশা করি, তা কেবলমাত্র 'ঈদিপাস' মিথসম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-চিত্র মস্তিষ্ক নিউরোনে উপস্থিত থাকলেও পাওয়া সম্ভব। যাদের নিউরোনে 'ঈদিপাস' মিথের জৈব-গণিত-চিত্র নেই, তাদের কাছে 'ঈদিপাস' একটি ধ্বনি-তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভাষা-চিহ্নের দ্যোতিত অর্থ দেশ-কাল-মাত্রাভেদে বিভিন্ন অর্থের যোগান দিতে পারে এবং এ অর্থও আবার বিভিন্ন মানব-একককে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায়। ভাষার এই

অহংকেন্দ্রিকতাকে ভাষাদার্শনিক জাক দেরিদা Logocentrism বা স্বনকেন্দ্রিকতা বলে উল্লেখ করেছেন এবং ভাষার এই দেশ-কাল-কেন্দ্রিক অসীম দ্যোতনাকে বলেছেন Free play of Language বা ভাষা-দ্যোতনার মুক্তক্রীড়া। যেহেতু অহংকেন্দ্রিক বিভিন্ন মাত্রার ভাষা-দ্যোতনা এবং দেশ-কাল-কেন্দ্রিক ভাষাচিহ্নের মুক্তক্রীড়ার ফলে বৈশ্বিক বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়, সেহেতু প্রতিটি মানব-এককের বিশ্ব একান্তভাবে তার নিজস্ব বিশ্ব হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন তাই বলেন– 'I am my world... The world is my world... The world is independent of my will... Life is world'.

চার

জ্ঞান, চিন্তা ও ভাষাবিষয়ক আলোচনার পর আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ নিতে পারি:

১.
জগৎ ও পরিবেশ থেকে ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-তেজ নিয়েই প্রতিটি মানুষ গড়ে তোলে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান-তেজের ভাণ্ডার, যা কিছু নির্দিষ্ট জৈব-গণিত নিয়েই অবস্থান করে মানুষের মস্তিষ্ক-নিউরোনে।

২.
মানুষের জ্ঞান-তেজের দেশ-কাল-কেন্দ্রিক অবস্থানকে চেতনার কোয়ান্টাম স্তর বা ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৩.
মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা নির্ভর করে চেতনার কোয়ান্টাম ধাপের ওপর।

৪.
ভৌত-বিশ্বের গণিতের সাথে নিজস্ব জৈব-গণিতকে তুলনা করেই একজন মানুষ প্রতিষ্ঠিত করে তার অস্তিত্বকে এবং এ ধরনের তুলনার মাধ্যমে খুঁজে পায় তার সত্তাকেও।

৫.
অস্তিত্ব প্রকাশের উপাদান হিসেবে মানবিক চিন্তা প্রকাশিত হয় জাগতিক যুক্তির ভাষায়।

৬.
ভাষাও একরকম যুক্তির গণিত।

৭.
ভাষাভিত্তিক জাগতিক যুক্তির গণিত, প্রতিটি মানব-এককের জন্য মৌলিক ও পৃথক, যার ফলে ভাষার দ্যোতনা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দ্যোতিত হতে পারে।

৮.
জাগতিক ভাষার দেশ-কাল ও অহংকেন্দ্রিক প্রবহমান অর্থ থাকার কারণে ভাষামাধ্যমে ব্যক্তিগত সত্যকে প্রকাশ করা গেলেও, সমগ্রের সত্যকে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

৯.

সর্বজনীন বিশ্ব বা জগৎ বলে কিছু নেই। ভাষা এবং ভাষা-দ্যোতনার কারণে প্রতিটি মানব-একক ভিন্ন ভিন্ন বা জগৎ নিয়ে দেশ-কালে অবস্থান করে।

পাঁচ

জাগতিক যুক্তির ভাষা দিয়ে একজন কবি-স্রষ্টা তার নিজস্ব গণিত-সত্যকে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু সমগ্রের সত্যকে কিংবা জগৎ-সত্যকে প্রকাশ করা হয়ে ওঠে তার জন্য প্রায় অসম্ভব এবং এ কারণে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ সবসময় অতৃপ্তিতে ভোগে। যে জীবন গণিতের, সে জীবনকে গণিত-সত্যে প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই, এ রকম উপলব্ধি অনুভূতি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না একজন চিন্তাশীল মানবসত্তার কাছে। অপ্রকাশযোগ্য চিন্তা ও অনুভূতির অতৃপ্তি প্রায় যন্ত্রণার পর্যায়ে উপস্থিত হয় যখন কোনো মানব-সত্তা অবস্থান করে চেতনার উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরে। এমন অবস্থায় জগৎ-সত্য বা সমগ্রের সত্য প্রকাশের জন্যই একজন সৃষ্টিশীল মানুষ এক 'প্রথম-নতুন' ভাষা-বিন্যাসে বলে ওঠে কিছু কথা, আর আমরা সে প্রকাশকেই বলি কবিতা। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার তাই কবিতাকে ভাষা প্রকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি বলেন– 'কবিতা হল মানবিক সত্তার এমন এক সত্য-বাণী, যা প্রথমবারের মতো এই বিশ্বে উন্মোচিত হল।' এখানে বলা আবশ্যক যে কবিতার ভাষা কখনোই জাগতিক যুক্তির ভাষার মতো নিম্ন-কোয়ান্টাম স্তরের বাচাল ভাষা কিংবা সহজ গণিত নয়। এক উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থান করে যে সত্তা 'প্রথম-নতুন' ভাষায় কিংবা 'প্রথম-নতুন' যুক্তির গণিত দিয়ে কবিতা লিখল, সে কবিতাকে অবশ্যই হতে হবে অনন্য এবং অদ্বিতীয়। আমরা একেই বলব সৃষ্টি।

কবিতার এই 'প্রথম-নতুন' যুক্তির ভাষা বা যুক্তির-গণিত সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে কোনো বিশেষ উপাদান কাজ করে এবং কিভাবে করে, এবার তা দেখা যাক। একটি শুদ্ধ কবিতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে জাগতিক বাচাল ভাষার যুক্তিতে গ্রাহ্য নয় এমন শব্দ-শৃঙ্খলই উপস্থিত হয়েছে কবিতাটির শরীরে। 'আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি' এমন একটা গ্রাহ্য জাগতিক যুক্তির প্রকাশ হয়তো-বা কবিতায় হয়ে উঠেছে 'আমি তোমাকে মৃত্যুর মতো ভালোবাসি।' আসলে জাগতিক ভাষায় উপস্থিত 'বেশি', 'অত্যন্ত', 'খুব', 'খুবই' বা এই ধরনের পিচ্ছিল শব্দ যখন 'ভালোবাসার' সমগ্র-সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না, ঠিক তখনই 'মৃত্যুর' মতো অতিজাগতিক একটি শব্দের গণিত তরঙ্গ দিয়েই বোঝানো হয় ভালোবাসার তীব্রতাকে। আর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'রূপনারাণের (কোন্ রূপনারাণ? কেন রূপনারাণ? কোথায় রূপনারাণ?) তীরে জেগে ওঠে দেখেন– এ জগৎ স্বপ্ন নয়, জীবনানন্দের বনলতা সেনের চোখ হয়ে যায় পাখির নীড়ের মতো, শামসুর রাহমানের বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তির, আল মাহমুদের কন্যা গাঙের ঢেউ-এর মতো বলে কবুল কবুল।

যুক্তির ভাষা বা যুক্তির গণিতের এ রকম 'প্রথম-নতুন' প্রকাশকে ভাষাতত্ত্ববিদ রোমান ইয়াকবসন Aphasia বা ভাষা-বিচ্যুতি নামে আখ্যায়িত করেছেন। ভাষা-বিচ্যুতির সময় যুক্তির শব্দপ্রবাহে অযৌক্তিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং এই অযৌক্তিক (আপাতদৃষ্টিতে) শব্দই নতুন কণা-তরঙ্গ বিন্যাসে নতুন যুক্তি নিয়ে মানুষের কাছে ব্যঞ্জনাসহ অর্থময় হয়ে ওঠে। লেখকের মতে, এ

ধরনের নতুন যুক্তিকে ‘ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-বিচ্যুতি’ কিংবা ‘আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ’ নির্মাণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এখানে ‘আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ’ হল এমন এক সত্যের জগৎ, যা জাগতিক বাচাল ভাষার বাস্তবতায় আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা বলে মনে হয়। একটি ছোট্ট গণিত দিয়েই উদাহরণ দেওয়া যাক। ২-১=১-কে আমরা লিখতে পারি ২-১=TAN 45। যে ত্রিকোনোমিতি জানে, তার কাছে TAN৪৫ আর সংখ্যা ১, একই মাত্রার দ্যোতনা দেবে। কিন্তু যার কাছে বিষয়টি নতুন, সে TAN৪৫-কে গ্রহণ করবে রূপক/প্রতীক হিসেবে এবং কিছু ব্যঞ্জনাসহই সমীকরণটি থেকে উদ্ধার করবে প্রকৃত সত্যকে। কিন্তু যদি লেখা হয় ২-১= ঈশ্বর, তবে হা হবে ‘আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ’ নির্মাণ, যেখানে সংখ্যা এক ও ঈশ্বর সমার্থক। প্রাগুক্ত সমীকরণটি গ্রাহ্য করে যদি লেখা হয় ‘আমার মাঝ থেকে আমি বাদ দিলে থাকেন ঈশ্বর’, তবে আপেক্ষিক মিথ্যা থেকে সত্যকে উদ্ধার করতে হবে কিছু ব্যঞ্জনাসহ, নতুন গণিত বিশ্লেষণে, সেখানে ‘আমার’ মাঝে উপস্থিত থাকে ‘আমি’ ও ‘ঈশ্বর’ (১+১=২) এবং ‘আমার (২)’ মাঝ থেকে ‘আমিকে (১)’ বিয়োগ করলে সংখ্যা ১ কিংবা ঈশ্বরই হন ধ্রুব।

উপরিউক্ত উদাহরণ গ্রাহ্য করে শুদ্ধ কবিতার বিশ্লেষণে গেলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘রূপনারাণ’, জীবনানন্দের ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ’, শামসুর রাহমানের ‘ব্রোঞ্জের মূর্তির স্বপ্ন’, আল মাহমুদের ‘গাঙের ঢেউ-এর শব্দে কন্যার কবুল করা’ কিংবা অন্য যে কোনো কবির ‘প্রথম-নতুন’ যুক্তির গণিত খুঁজে পাব এবং তার অর্থ উদ্ধার করতে পারব। তবে, যেহেতু প্রতিটি মানুষের বিশ্বই তার একান্ত আপন বিশ্ব এবং সৃষ্টির পর একটি কবিতা যেহেতু কবির থাকে না, সেহেতু কবিতার ‘প্রথম-নতুন’ যুক্তির ব্যঞ্জনা/দ্যোতনা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে পারে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যক্তি-বিশ্বের এই প্রভাবে, কবিতা কিংবা যে-কোনো শুদ্ধ শিল্পের নন্দনতত্ত্ব থেকে অধিবিদ্যা বা metaphisics-কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া যাবে না, কারণ মানবিক চেতনায় অধিবিদ্যাও এক ধরনের যুক্তির গণিত নিয়েই গ্রাহ্য। আর এ কথাও তো সত্য যে শুদ্ধ গণিতেও কিছু মেটাফিজিক্যাল উপাদান আছে, অন্ততপক্ষে আছে ‘পাই’-এর মতো খ্যাপাটে কিংবা মাত্রাহীন সংখ্যা, আছে ফারমা’র শেষ উপপাদ্যের মতো ধাঁধা। গণিতের গুরু কার্ট গোডেলের বক্তব্যও অস্বীকার করি কিভাবে? তিনি তো বলেছেন, গণিতেও এমন কিছু আছে যার সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করা অসম্ভব।

মনের জানালা / বিশ্বচিত্রঃ সৃষ্টি/ নির্মাণ

মনের জানালা/ বিশ্বচিত্র

প্রতিটি মানুষের একটি নিজস্ব মনের জানালা আছে। এই জানালা দিয়ে সে নিজকে দেখে, প্রকৃতি দেখে, পরিবেশ দেখে, আকাশ, পাতাল, পৃথিবী আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখে। এই জানালা, যাকে আমরা চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম বলতে পারি, তার বিস্তার আর অবস্থান সম্পর্কে খুব সহজেই আমরা কোনো নির্দিষ্ট সত্যকে তুলে ধরতে পারি না। জাগতিক বাচাল ভাষায় যুক্তি দিয়ে যখনি আমরা একজন মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করতে যাই, ঠিক তখনি আমাদের ব্যক্তিগত অহং নিজস্ব সত্তার আবরণ মাখিয়ে দেয় যে-কোনো প্যারাডাইমিক বিশ্লেষণে, আর তার ফলে সমগ্রের মাঝেই বারবার ঘুরে ফিরে আসে অহং-এর উপস্থিতি। একজন নিঃসঙ্গ মানুষ তাই শুধুমাত্র তার নিজস্ব জানালা নিয়েই বিবর্তিত হতে থাকে দেশ-কাল-মাত্রার এই পৃথিবীতে।

একজন ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত জানালার ছবি সমগ্রের সম্পদ নয়– এই সত্য-মূলসহ-ই আমাদের প্যারাডাইমে অবস্থান করছে। তবু, এ কথাও সত্য যে, আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষা ও চিন্তায় জানালা খুলে বারবার দেখতে চেয়েছি ব্যক্তি ও সমগ্রের বিশ্ব-কে। দেকার্তের কাজিটো বা 'আমি', আমার নিজস্ব জানালা নিয়েই হয়ে উঠছে অস্তিত্বশীল। 'আমি'-র জানালা খুলে বিচিত্র চিত্র দেখার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির, আর লাকাঁ উন্মোচন করতে চেয়েছেন মানবিক চৈতন্যের অস্তিত্ববাদী সমস্যা ও চরিত্রকে। মানবিক চেতনা-কাঠামো যে বিশ্বচিত্র ধারণ করে তার মূলে অবস্থান করছে ভাষা, আর তাই মার্টিন হাইডেগারকে বলতে হয়েছে– Language is the house of being. Man dwells in this house। মনের জানালা দিয়ে অহং ও সমগ্রের বিশ্বচিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যখন ভাষাই হয়ে উঠল মুখ্য, তখন এডওয়ার্ড সপির ও ফ্যার্দিনান্দ সস্যুরের বৈপ্লবিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের উপহার দিল এক নতুন চিন্তা-কাঠামো, আমাদের মনের জানালার বিস্তার বাড়ানোর এক নতুন অস্ত্র। পরবর্তীকালে জাক দেরিদা ভাষার তুলতুলে, নরম পিচ্ছিল চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করেন বিনির্মাণবাদ, যেখানে ভাষাকেন্দ্রিক বিশ্বচিত্র কিংবা চেতনা-কাঠামো দেশ ও কালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়ে সৃষ্টি করতে পারে অসীম অর্থ কিংবা দ্যোতনা। দেরিদা কথিত– 'যতিভেদ' বা 'Differance' ভাষার Spatial বা স্থানিক এবং temporal বা কালকেন্দ্রিক অবস্থানকে গ্রাহ্য করে। এর ফলে দ্যোতকের অর্থ, অস্তিত্বকে উহ্য রেখে ও পুনস্থাপনের মাধ্যমে, বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়ে তৈরি করে নিত্যনতুন অর্থের কিংবা দ্যোতনার জগৎ। ভাষার এই কেন্দ্রবিচ্যুতি ঘটে অহং-উপস্থিতির কারণে এবং এর ফলে লিখিত ভাষার কোনো স্বনকেন্দ্রিক বা Logocentric অস্তিত্ব নেই। মানুষের ব্যক্তিগত মনের জানালা দিয়ে দেখা বিশ্বচিত্র তাই প্রতিদিন ভাষার সাথে নেচে নেচে গড়ে তুলেছে নতুন নতুন চেতনাজগৎ। একজন 'আমি' যখন নিজেই দ্যোতক/দ্যোতনাকেন্দ্রিক বিবর্তনের

নাগরদোলায় দুলছে তখন কোনো একক 'তুমি'র ভাষাকেন্দ্রিক বিশ্বচিত্রকে সে কোনো এক Logocentric চিন্তায় তুলে আনতে পারবে, ব্যাখ্যা করবে, এ রকম ভাবা যুক্তিসঙ্গত নয়।

যে মনের জানালার কথা বলা হল তার মেটাফিজিক্যাল অবস্থান হল প্রচলিত ভাষায় গ্রাহ্য 'মন' নামক এক অদৃশ্য জগৎ কিংবা বিন্দুতে। যদি বাস্তব গাণিতিক সত্যকে গ্রাহ্য করি, মেটাফিজিক্স বাদ দিতে চাই, তবে এই জানালার ঠিকানা হবে মানব-মস্তিষ্কের অসংখ্য নিউরোনে। এই নিউরোন-জালেই আটকে থাকে একজন মানুষের আমি এবং সমগ্রসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এখানেই বিবর্তন ঘটে ভাষাকেন্দ্রিক অহং ও সমগ্রের সার্বিক অস্তিত্বের। দেশ-কাল-কেন্দ্রিক মনের জানালার প্রথম কপাট খুলে যায় জন্মের সাথে সাথে এক অসহায় বাক্যহীন অক্ষম অবস্থায়। ফ্রয়েডের চিন্তাবাহিত জাক লাকাঁর বক্তব্য অনুসারে একটি মানবশিশুর জন্ম-উত্তর এই সৌরজ সময়কে বলা হয় 'আয়না পর্ব'। এই পর্বে একটি 'আমি' শুধুমাত্র 'আমি'কেই দেখতে পায় প্রতিবিম্বের মতো, আর এই অহং–প্রতিবিম্বের নাম হল 'ইমাগো'। এই ইমাগো–ই প্রথম তৈরি করে primary narcissism বা আত্মপ্রেম এবং পরবর্তীতে অস্তিত্বের সাথে যুক্ত করে নেয় আক্রমণ ও মরণ প্রবৃত্তিকে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই মরণ প্রবৃত্তির সাথে যুক্ত থাকে Pleasure Principle বা সুখনীতি, যার উপাদান হল সব ধরনের কাম এবং জরায়ুতে ফিরে যাওয়ার অসম্ভব কিন্তু বাস্তব স্বপ্ন। জন্মের পর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে একটি মানুষ তার জানালার প্রসার বাড়াতে থাকে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতীকী-শৃঙ্খলা বজায় রেখে, একটি নির্দিষ্ট ভাষাকাঠামোর সচল সূত্রসমূহকে আত্মস্থ করে। ভাষাকেন্দ্রিক প্রতীকী–শৃঙ্খলার জগতে একটি মানুষ নিজকে কখনোই মুক্ত ভাবে না, কারণ বিভিন্ন নিয়ম, ট্যাবো ইত্যাদি অহংকে যুক্ত করে রাখে সমগ্রের সাথে। এখানেই সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বের, আশা/নিরাশার যুগ্ম বৈপরীত্যের। মার্টিন হাইডেগার এ অবস্থাকেই হয়তো-বা বর্ণনা করেছেন Das-man বা পতিত সত্তার উপস্থিতি হিসেবে, যেখানে মানুষের Das-sein বা মৌলসত্তা ভীষণভাবে পরাজিত। ভাষাকেন্দ্রিক প্রতীকী-শৃঙ্খলার জগতের অধিবাসী একজন মানুষ রাশি রাশি প্রতীক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েও তার প্যারাডাইম বা চেতনা-কাঠামোকে প্রতিদিন নতুন করে সাজিয়ে নিচ্ছে। ধর্ম, রূপকথা, মহাকাব্য, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদির মতো প্রতীক বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে মনের জানালায়, তবু মানুষ সত্যকে খুঁজছে অহং-মুক্তির সাধনায়। যে মানুষ প্রতীকী-শৃঙ্খলার এই বিশ্বকে গ্রহণ করতে পারেনি সে আজ হয়তো-বা রোগী কিংবা আত্মহত্যায় ফিরে গেছে শান্তির কবরে।

সৃষ্টি/নির্মাণ

সৃষ্টি প্রচলিত প্রথাবদ্ধ প্রতীকী-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। একজন মানুষ, যে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্দিত্ব স্বীকার করে বেঁচে আছে সে নিঃসন্দেহে স্রষ্টা নয়। সে একটি নিরামিষ পতিত-সত্তা। কোনো পতিত-সত্তার বিদ্রোহ হবে অমানবিক পারভারশন। সে ভেনাস কিংবা ম্যাডোনার ছবি না দেখে তুলে নেবে ধর্ষণের মোহ। তার ভাষা হবে বাচাল নষ্ট সময়ের ধ্বনি। রঙধনুতে সে কেবল দেখতে পারবে অস্ত্রের সংঘাত। স্রষ্টা হওয়া খুব-একটা সহজ কিছু নয়।

সৃষ্টির রূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করতে গেলে ভাষাকেন্দ্রিক প্রতীকী-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ মানুষের মনের জানালার কপাট খুলে দেখতে হবে প্রথমেই। এই সে মানুষ, যে 'আয়না পর্বে'-র সময় থেকেই বন্দি হয়েছে কিছু নিয়মের শৃঙ্খলে। কিন্তু সে মুক্তি চায়, অনিশ্চয়তাবদ্ধ ঠিকানাহীন বৈশ্বিক বস্তুবলয়ে অবস্থান করে সে চায় তার নিজস্ব অহং-কে নির্দিষ্ট সত্যমাত্রায় প্রকাশ করতে। যে নতুন রঙে নতুন ভাষায় সত্য বলতে পারে, সে-ই হয় স্রষ্টা। সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টাকে তৈরি করতে হয় আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ। জাগতিক বাচাল ভাষা, রঙ কিংবা ফর্ম দিয়ে অহং-সত্যকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আপেক্ষিক মিথ্যা দিয়েই চরম সত্যকে উপস্থাপন করা সম্ভব।

সৃষ্টির সাথে নির্মাণের সম্পর্ক সহজাত। সৃষ্টি করতে হলে ব্যাকরণ জানতে হয়। এই ব্যাকরণই নির্মাণ, কিংবা বলা যেতে পারে নির্মাণ-পর্বের কোনো এক ধাপে সৃষ্টির অবস্থান। ঐতিহ্য ও ব্যাকরণ জানা থাকলে নির্মাণ করা যায়, কিছু ইচ্ছে করলেই নির্মাণকে সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। একজন স্রষ্টা নির্মাণের কৌশল অবলম্বনে সৃষ্টি করতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে নতুন নির্মাণ কৌশল আবিষ্কার করাও অসম্ভব নয়।

বিষয়: আমি ও যৌগ-আমি

'আমি' শব্দটি সম্ভবত মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। জন্মের পর থেকেই 'আমি' কিংবা 'অহং'কে কেন্দ্র করেই একজন মানুষ তার নিজস্ব বিশ্বকে সৃষ্টি করে অর্থবোধক করে তোলে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের অস্তিত্ব ও সত্তাকে। জন্মের প্রথম লগ্নে আমি কিংবা অহং-এর প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকে কিছু নিম্নমানের জৈবিক কর্মকাণ্ডে, যেখানে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-বিক্রিয়া, ক্ষুধা, ভালোবাসা আর সুখ-দুঃখই প্রাধান্য পায় অহং-চিন্তায় ও অনুভূতিতে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে একজন 'আমি' পার্থিব বস্তু ও বিষয়কে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে গড়ে তুলতে চায় নিত্য-নতুন 'বিশ্ব-অর্থ', যাকে নিত্য-নতুন 'অহং-বিশ্ব-রচনা' হিসেবেই উপস্থাপন করা সম্ভব। আমাদের পরিচিত সর্বজনীন 'ভৌত বিশ্ব' আর অহং-সৃষ্ট 'অহং-বিশ্ব' একই মাত্রায় কিংবা একই অর্থে দোতিত, এ কথা ভাবা ঠিক নয়। কারণ জীবন-বস্তু হিসেবে একজন মৌলিক ব্যক্তিমানুষের চেতনাকাঠামো বা প্যারাডাইম, ভৌতবিশ্বের 'উপস্থিত-অস্তিত্ব'-র মধ্য থেকে কিছু 'তৈরি-অস্তিত্ব'-কে উদ্ধার করে রচনা করে তার নিজস্ব পৃথিবী, যা শুধুমাত্র একজন মৌলিক মানুষের 'আমি'-সত্তাকে চরম ও পরম মূল্য দেওয়ার জন্যই সৃষ্ট।

জন্মলগ্ন থেকেই একজন মৌলিক 'আমি'-র ব্যক্তিগত নিজস্ব সময়, সৌরজ সময়কে প্রেক্ষাপটে রেখে ক্রমাগতভাবে বিবর্তিত হতে থাকে, আর বির্তনের কেন্দ্রমূলে অবস্থান করে অহং-সত্তার দেশ ও সময়কেন্দ্রিক রূপ ও স্বরূপ। দেশ-কাল-কেন্দ্রিক এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি 'আমি-সত্তা'র বিকাশ হয় তার পরিবেশে অবস্থানরত বিভিন্ন 'অহং-বিশ্ব'কে গ্রাস করে। ব্যাপারটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। যে-মুহূর্তে একজন মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয়, ঠিক সে-মুহূর্তে তার 'আমি-সত্তা' একটি মৌলিক একক হিসেবে উপস্থিত থাকলেও, মা, বাবা, ভাই, বোন ও 'পরিবেশ-পৃথিবী'র আমিত্বকে গ্রাস করে নিয়ে একজন 'মৌলিক-আমি' 'যৌগ-আমি' হিসেবে পরিচিত হতে চায়। যে-কোনো একজন 'মৌলিক আমি'র অন্তরে 'যৌগ-আমি' হবার প্রচণ্ড বাসনা থাকলেও, সব সময় যে সে তা হতে পারে, তা কিন্তু নয়। 'মৌলিক-আমি'র চেতনার কোয়ান্টাম স্তর বা শক্তিরূপ অন্য কোনো আমি-সত্তাকে প্রকৃতভাবে গ্রাস করতে পারলেই কেবল 'যৌগ-আমি'র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জন্মের পর মা'র 'আমি' সন্তানের 'মৌলিক আমি'-কে গ্রাস করতে পারে এবং এক্ষেত্রে একজন মা 'যৌগ-আমি' হলেও, তার সন্তান 'মৌলিক আমি' হিসেবেই অবস্থান করবে। ব্যাপারটিকে উল্টোভাবেও উপস্থাপন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সন্তানের 'আমি', মা'র 'আমি'-কে গ্রাস করে যৌগ হবে আর মা'র অবস্থান থাকবে মৌলিক স্তরে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে একজন 'মৌলিক-আমি' কিংবা 'যৌগ-আমি' পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের 'আমি'কে গ্রহণ কিংবা বর্জন করে 'আমিসত্তা'র যৌগ সংখ্যা বাড়ায় কিংবা কোনো এক স্থির বিন্দুতেই রেখে দেয়। বিষয়টিকে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক 'ক' নামক একজনের 'আমি', 'খ' নামক অন্য একজনের 'আমি'-কে গ্রাস করে 'যৌগ-আমি' হিসেবে অবস্থান করছে এবং কোনো এক সময় সে প্লাতোর দর্শনচিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্লাতোর আমিসত্তাকেও তার যৌগ-সত্তায় গ্রহণ করল। এমন অবস্থায় 'ক' নামক যৌগ-সত্তার নতুন রূপ দাঁড়াবে–

$$\text{ক} = \text{ক} + \text{খ} + \text{প্লাতো}$$

প্রাগুক্ত সমীকরণ গ্রাহ্য করে যে-কোনো আমি সত্তাই তার জ্ঞান ও সত্তার কোয়ান্টাম স্তর বা শক্তিরূপ কোনো এক উন্নত যৌগ-সত্তায় উপস্থিত করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হোমোসেপিয়েনস্-সেপিয়েনস্ নামের মানব-প্রজন্ম-ভিত্তিক সভ্যতার বিকাশের মূলেও রয়েছে বিভিন্ন 'যৌগ-আমি'র বিকিরিত জ্ঞানতেজ। মানুষের ইতিহাস প্রায় তিরিশ লক্ষ সৌরবৎসরের পুরনো হলেও, সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু পাঁচহাজার বৎসরের বেশি নয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে এ সময়ের বিস্তার নেমে আসবে চার কি পাঁচশত বছরের কাছাকাছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তিরিশ লক্ষ বছরের পুরনো মানবপ্রজন্মের ইতিহাসে সভ্যতার চরম বিকাশ গত পাঁচশত বছরে হয়েছিল কেন? কিভাবে এটা সম্ভব হল? প্রশ্নগুলোর বাস্তব উত্তর হিসেবে 'আমি' ও 'যৌগ-আমি'র ক্রিয়াবিক্রিয়াকেই উপস্থাপন করা সম্ভব। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বিগত তিরিশ লক্ষ বছরে যতো 'যৌগ-আমি' সত্তার সৃষ্টি

হয়েছিল তার বেশিরভাগই অবস্থান করেছে গত পাঁচশত বৎসরের ইতিহাসে। পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ পর্যন্ত 'যৌগ-আমি'-র বিস্তার ঘটেছিল তৎকালীন বিশ্বের প্রতিকূল পরিবেশে, একটি ক্ষুদ্র গণ্ডিকে কেন্দ্র করে, যার প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র গাণিতিক হারেই নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে, গত পাঁচশত বছরের বিশ্ব-চিত্রে 'যৌগ-আমি' সৃষ্টির পরিবেশ ছিল অনুকূল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রকাশনা ও মুদ্রণশিল্পের বিকাশ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগারের উন্নয়ন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলে গত পাঁচশত বছরে 'যৌগ-আমি'র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে।

মানবসভ্যতার বিকাশে 'যৌগ-আমি'র ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হলেও, 'যৌগ-আমি' সত্তার দুটো ভিন্ন চরিত্রকে শনাক্ত করা সম্ভব। 'যৌগ-আমি' সত্তার মাঝে 'উন্নত-যৌগ-আমি' ও 'পতিত-যৌগ-আমি' নামে দুটো ভিন্ন সত্তা, দেশ-কাল-কেন্দ্রিক চেতনাকাঠামো বা প্যারাডাইম নিয়ে অবস্থান করে। পতিত ও উন্নত 'যৌগ-আমি' সত্তার চরিত্রগুণ নির্ভর করে যৌগস্থাপন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ওপর। একজন 'পতিত-আমিসত্তা' তার চারপাশে অবস্থানকারী নিম্ন-কোয়ান্টাম স্তরের সাধারণ মানুষ, চাটুকার, ভণ্ড, প্রতারক ইত্যাদির শ্রেণীর 'আমিসত্তা'কে গ্রাস করার মাধ্যমে 'যৌগ-আমি' হয় এবং নিজ' অহংসত্তাকে চরম ও পরম পর্যায়ে উন্নত করে তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান দেয় যুক্তিহীন অহংকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডকে। অন্যদিকে একজন 'উন্নত যৌগ-আমিসত্তা' উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরে অবস্থানকারী দার্শনিক, চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিত্বের 'আমি'-কে গ্রহণ করে 'যৌগ-আমি' হয়ে ওঠে, যা অহং-বহির্ভূত যৌক্তিক ও সর্বজনীন চিন্তার মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্ব-ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রাগুক্ত দু'ধরনের যৌগ-আমি সত্তাকে আমরা শনাক্ত করতে পারব। হিটলার, মুসোলিনি, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব 'পতিত-যৌগ-আমি' সত্তার প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। আর সক্রেটিস, রবীন্দ্রনাথ, রাসেল, গান্ধী, চার্চিল প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত হতে পারেন 'উন্নত-যৌগ-আমিসত্তা' হিসেবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীদের চরিত্রগুণ বিশ্লেষণ করলে 'পতিত-যৌগ-আমি' সত্তার উপাদানসমূহকেই খুঁজে পাওয়া যায় বিশেষভাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হয়ে সাধারণ মানুষের অহংসত্তাকে গ্রাস করে 'যৌগ-আমি' হিসেবে অবস্থান করলেও এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক সময় যুক্তিহীন ও অহংকেন্দ্রিক ছিল। যার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে যুক্তিগ্রাহ্য যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেননি। পরবর্তী পর্যায়ে জিয়াউর রহমান ও হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মাঝেও 'পতিত-আমিসত্তার' প্রাধান্যই লক্ষ করা গেছে এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডে যুক্তিহীন অহংকেন্দ্রিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্রিয়া-বিক্রিয়াই প্রাধান্য পেয়েছিল। বর্তমানে আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পি-র নেতৃত্বের মাঝেও যুক্তিহীন পতিত-অহংকেন্দ্রিকতার উপস্থিতি প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল, যার ফলে আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো 'যুক্তির-অপমৃত্যু' প্রত্যক্ষণ করছি। বাংলাদেশের প্রগতিশীল বামশক্তি, বিবৃতি ও বক্তৃতায় 'উন্নত-যৌগ-আমি' সত্তার উপস্থিতি প্রমাণ করতে চাইলেও, তা কতটা সঠিক ও আন্তরিক তা ভাববার বিষয়। গত বিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনৈতিক

দলগুলোর বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করা যায়, যা ‘পতিত-যৌগ-আমি’ সত্তার চরিত্রকেই উন্মোচিত করেছে বারবার।

বাংলাদেশে প্রকৃত ‘উন্নত-যৌগ-আমি’-র উপস্থিতি কম কেন– এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থাই একজন ‘আমি’কে মিথ্যা জাগতিক বিষয়ীগততার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এর ফলে প্রকৃত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে ‘যৌগ-আমি’ হওয়ার বদলে, এ দেশের একজন মানুষ শুধুমাত্র ‘বিশ্ব-স্থিত-বস্তু’ হিসেবে তার হাতের কাছে পাওয়া ‘তৈরি-বিশ্ব-অস্তিত্ব’কে গ্রাস করেই ‘পতিত-যৌগ-আমি’-তে পরিণত হয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভের মাধ্যমে সৃষ্ট কিছু ‘উন্নত-যৌগ-আমি’ বাংলাদেশে অবস্থান করলেও, তারা যুক্তিহীন ও অহংকেন্দ্রিক ‘পতিত-যৌগ-সত্তা’র দাপটে পড়ে নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন না কিংবা চানও না।

আমি এবং যৌগ-আমির রূপ ও স্বরূপকে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডেও চিহ্নিত করা সম্ভব। ‘পতিত-যৌগ-আমি’-কে নিয়ে একজন স্রষ্টা তার সৃষ্টিশীল সময়ে কিছু অনুকরণই করেন মাত্র, যার ফলে তাঁকে কারুকার, কারুকবি বা কারুশিল্পী বলা যায়। ‘পতিত-যৌগ-আমি’র অন্তরে যুক্তিহীন পতিত অহং-এর প্রাধান্য থাকায় যুক্তির মৃত্যু ঘটে এবং সৃষ্টিকর্মে মৌলিকতা দেখাতে গিয়ে তিনি তাঁর পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অযৌক্তিক বিন্যাসে সাজিয়ে থাকেন। সৃষ্টিকর্মে ‘আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ’ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, একজন ‘পতিত-যৌগ-আমি’ শুধুমাত্র একটি ‘মিথ্যার জগৎ’ তৈরি করে তাকে মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। অন্যদিকে একজন ‘উন্নত যৌগ আমি’ তার সৃষ্টির সময় একটি ‘আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ’ সৃষ্টি করলেও সেখানে তার চেতনার যুক্তি সংরক্ষিত হয় সৃষ্টির তাগিদেই, এমনকি কোনো বিমূর্ত শিল্পের প্রেক্ষাপটেও চেতনাকাঠামো বা প্যারাডাইমগাহ্য যুক্তিকাঠামো উপস্থিত থাকে। কবিতা-সৃষ্টির বেলায় একজন সৃষ্টিশীল ‘উন্নত-যৌগ-আমি’ আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ সৃষ্টি করে একটি শুদ্ধ কবিতা উপস্থাপন করলেও, একজন ‘পতিত-যৌগ-আমি’ শুধুমাত্র শব্দের ওপর শব্দ চাপিয়ে একটা ধ্রুব মিথ্যার জগৎকে কবিতার নামে উপস্থিত করে পাঠককে বিভ্রান্ত করেন। চিত্রকলার ব্যাপারেও ঠিক একই রকম অবস্থা সনাক্ত করা সম্ভব। একজন ‘উন্নত-যৌগ-আমি’ সৃষ্ট বিমূর্ত চিত্র শুদ্ধ শিল্পের অনুভূতি দিলেও, একজন ‘পতিত-স্রষ্টা’র সৃষ্টি কেবলমাত্র কিছু রঙ ও রেখার অযৌক্তিক বিন্যাস হিসেবেই উপস্থাপিত।

উপসংহার

আমি ও যৌগ-আমির রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে উপাদানসমূহকে সনাক্ত করা যায় তার সংক্ষিপ্তসার হতে পারে নিম্নরূপ:

এক :

‘আমি’কে অসীমে পৌঁছে দেওয়াই হল একজন মানুষের উজ্জ্বল স্বপ্ন, আর বিমূর্ত স্বপ্নকে মূর্ত-বাস্তব করার নেশায় একজন মানুষ যে-কোনো দেশ-কাল-মাত্রায় অবস্থান করে অসীম যন্ত্রণা নিয়েই।

দুই :

আমিসত্তা কোনো ধ্রুব একক নয়। প্রকৃতি ও পরিবেশে অবস্থানকারী অন্য যে-কোনো জৈব-অজৈব 'আমিসত্তা'কে শোষণ করে সংশ্লেষণ করে, একজন মৌলিক 'আমি' তার সত্তার পরিধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব মাত্রায় ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে তৈরি করে নিতে পারে নিত্য-নতুন 'যৌগ-আমি' সত্তাকে।

তিন :

সভ্যতা বিকাশের মূলে অবস্থান করে 'যৌগ-আমি' সত্তার দেশ-কাল-মাত্রিক প্রসারণ। একজন 'আমি' অন্য একটি 'আমি'র কোয়ান্টায়িত জ্ঞান-তেজ বিকিরণকে শোষণ, সংশ্লেষণ ও ধারণ করে নিজের এককত্বকে বহুত্বের দিকে নিয়ে যায়, আর সভ্যতা হল অসংখ্য ক্রমপ্রসারমান যৌগ-সত্তার সম্মিলিত ক্রিয়াফল।

চার :

আইনস্টাইন শুধুমাত্র আইনস্টাইন ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ। ক্রমপ্রসারমান 'আমিসত্তা'র বিবর্তনে তাঁদের যৌগরূপ হয়তো-বা ছিল–

আইনস্টাইন = আইনস্টাইন + কপারনিকাস + গ্যালেলিও + নিউটন +....

রবীন্দ্রনাথ = রবীন্দ্রনাথ + চর্যার কবিবৃন্দ + লালন + প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক কবি

উপরিউক্ত উদাহরণ মতে যে-কোনো একজন 'যৌগ-আমি'র রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে অনেক 'মৌল-আমি'র রূপ ও স্বরূপ কল্পনা করা যাবে, কিন্তু উদ্ধার করা অসম্ভব।

পাঁচ :

জৈবিক বিবর্তনে, যে-মুহূর্তে হোমোসেপিয়েনস্-সেপিয়েনস্ নামের মানুষ প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সে-মুহূর্ত থেকেই প্রতিটি 'আমি-সত্তা' জীবনে ও মরণে অন্য আরেকটি 'আমি' সত্তার মাঝে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং এর ফলে প্রজন্ম উত্তরণের মূলেই রয়েছে 'যৌগ-আমি'।

ছয় :

জ্যামিতিক হারে প্রসারমান অসংখ্য 'যৌগ-আমি'র সম্মিলিত ক্রিয়া-ফল বিভিন্ন দেশ-কাল-মাত্রায় বিভিন্ন সামাজিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটিয়েছে, তৈরি করেছে নিত্যনতুন চেতনা-কাঠামোর। বর্তমানে 'যৌগ-আমি'ও আগামী বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এবং আবারও তৈরি হবে এক নতুন বিশ্ব কিংবা নতুন চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম।

সাত :

ঘটনার উৎসে যেহেতু সময়ের সৃষ্টি, সেহেতু যে-কোনো 'যৌগ-আমি'র উচিত নতুন নতুন ঘটনা ঘটিয়ে নতুন নতুন 'সময়' সৃষ্টি করা।

আট :

প্রাকৃতিক অনিশ্চিত নিশ্চয়তাই মানুষকে নিশ্চয়তাবদ্ধ অনিশ্চিত সৃষ্টির জগতে নিয়ে যায় এবং এ কারণে একজন সৃষ্টিশীল 'যৌগ-আমি' অনিশ্চয়তাসহ হতে চায় প্রায় ঈশ্বরের মতো।

নয় :

'যৌগ-অহংসত্তা'কে প্রকাশ করার মতো কোনো ধ্রুব জাগতিক যৌক্তিক চিত্র-তরঙ্গ, শব্দ-তরঙ্গ কিংবা ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ না পেলেই একজন উন্নত 'যৌগ-আমি' নিজেই স্রষ্টা হয়ে ওঠে এবং কোনো এক 'প্রথম-নতুন' যুক্তির বিন্যাসে গড়ে তোলে শিল্পের জগৎ। সৃষ্টির 'প্রথম-নতুন' যুক্তি হল নতুন গণিত।

দশ :

পতিত 'একক অহংসত্তা' শিল্পের নামে সৃষ্টি করে অযৌক্তিক বাচাল সময় এবং শুধুমাত্র বৈশ্বিক যুক্তির অযথা মৃত্যু ঘটিয়ে রক্ষা করতে চায় নিজস্ব অস্তিত্বকে।

এগারো :

প্রতিটি 'আমি' আর 'যৌগ-আমি' তার নিজস্ব মৌলিক ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, আর এ কারণে আমরা কখনো একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি না। মানবিক যে-কোনো অনুভূতি, একজন অন্যজনকে 'বোঝা-না বোঝা'র শূন্যতাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

বারো :

একজন 'যৌগ-আমি' কখনোই আর 'আমি'-কে খুঁজে পায় না এবং এ কারণেই নিজেকে অসম্পূর্ণ ভাবে।

বিষয় : ঘর, জানালা ও পথ

ঘর

এক:

'ঘর' শব্দটির সাথে 'আশ্রয়' শব্দটির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং এ কারণে জীবনের জৈবগণিতকে গ্রাহ্য করে, জৈব-বস্তুকাঠামো বা দেহকেও জীবনের ঘর হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব ।

দুই:

জীবন যে-ঘরে অবস্থান করে, সেখানেই রচনা করতে চায় তার কবর, খুঁজে পেতে চায় জরায়ুর স্তব্ধতা । কিন্তু সব জীবনই সফলভাবে নিজস্ব ঘরের গহীনে-অন্তরে ডুবতে পারে না । যে পারে, সে-ই হয় জয়ী ।

তিন:

'ক্রিয়া ও কর্মের শেষে ঘর', 'দুর্যোগের সময় আশ্রয় ঘর', এ ধরনের সব বাক্য কিংবা ভাষার যুক্তি সবসময়ই মৃত্যুকাম বা থেনাটসঞ্জাত ।

চার:

ঘর, জরায়ু এবং কবর সমার্থক শব্দ ।

পাঁচ:

ঘরে অবস্থান করে বাইরের দৃশ্য দেখা যায় এবং এ জন্য ঘরে থেকেই জীবন চিন্তা করতে পারে তার আগামীর গন্তব্য সম্পর্কে ।

ছয়:

ঘরকে জীবন চিনতে পারে শুধুমাত্র জানালা ও পথের অহংকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ ।

সাত:

ঘরে অপর্যাপ্ত জানালা থাকার কারণে ঘরে বাস করেও ঘরকে চেনে না জীবন ।

জানালা

এক:

ঘর থাকলে সেখানে জানালা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। মানুষ কিংবা জীবন একটা ঘর। জৈবকোষসৃষ্ট এই ঘরে বহুমাত্রিক জানালা আছে। আপাতগ্রাহ্য ছয়-ইন্দ্রিয়ের জানালাই, জীবন কিংবা মানুষকে, বিশ্বের রূপ ও স্বরূপ দেখায়।

দুই:

প্রতিটি মানুষ ছয়টি-ইন্দ্রিয়ের জানালা দিয়েই পরিবেশ দেখে, পৃথিবী দেখে, কিন্তু এই জানালার বিস্তার সবার ক্ষেত্রে একই মাত্রায় হয় না।

তিন:

বিভিন্ন মাত্রার জানালা দিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের পরিবেশ ও পৃথিবী দেখে মানুষ এবং এ কারণে প্রতিটি মানুষের পরিবেশ ও পৃথিবী ভিন্ন।

চার:

জানালার বিস্তার নির্ধারণ করে মানুষ কিংবা জীবন স্বয়ং।

পাঁচ:

যে-জানালা দিয়ে শুধামাত্র নিজস্ব বিশ্বের বর্তমানের অংশবিশেষ দেখা যায়, সে জানালা দিয়ে সমগ্রের সত্যকে দেখা সম্ভব নয়।

ছয়:

যে-জানালা দিয়ে নিজস্ব অতীত ও বর্তমান দেখা যায় এবং দেখা যায় আগামীর সম্ভাবনাকে, সে-জানালাই মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্য সত্যকে উপস্থিত করে।

সাত:

জানালা দিয়ে যে মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্য সত্য দেখা যায়, সে সত্যকেই একজন সৃষ্টিশীল মানুষ উন্মোচিত করে শিল্প হিসেবে, কোনো এক প্রথম-নতুন ইন্দ্রিয়তরঙ্গ কিংবা বস্তুর বিন্যাসে।

আট:

কবিতা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য ইত্যাদির মতো সৃষ্টিশীল ক্রিয়া-বিক্রিয়া, অহং-এর জানালা দিয়ে দেখা আপন-বিশ্বের দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বিম্বিত প্রতিরূপ।

নয়:
জানালার বিস্তার বাড়ানো জীবন কিংবা মানুষের ধর্ম। কিন্তু বাস্তব যদি থেকেই থাকে, তবে সে বাস্তবে সব মানুষ এ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে না।

দশ:
একটি ঘরের জানালার বিস্তার বাড়ানোর জন্য অন্য একটি ঘরের জানালাকে তুলে আনতে হয়, আয়নার প্রতিবিম্বের মতো।

এগারো:
জানালা এবং জানালার বিস্তার নিয়েই গড়ে ওঠে কোনো এক ব্যক্তি-এককের সময়কেন্দ্রিক চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইম।

বারো:
প্যারাডাইমগ্রাহ্য জানালা আর জানালার বিস্তার সবসময় ঘড়ির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এ কারণে ঘড়িও হল এক ধরনের জানালা।

পথ

এক:
গন্তব্যবিন্দু স্থির হলেই পথের সৃষ্টি হয় এবং পথের স্রষ্টা জীবন।

দুই:
পথের সৃষ্টিতে বিন্দু ও রেখার জ্যামিতি গ্রাহ্য করতে হয় এবং এ কারণে জীবনও সবসময় জ্যামিতিক।

তিন:
পথের সাথে 'দিগন্ত' নামক শব্দচিহ্নের যোগাযোগ খুবই প্রত্যক্ষ। দিগন্তের রূপ হতে পারে ভৌত, গাণিতিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, বিশ্বাসকেন্দ্রিক, এমনকি স্বপ্ননির্ভর। তবে কেবলমাত্র দার্শনিক গাণিতিক-দিগন্ত-বিন্দুই সৃষ্টি করে অকৃত্রিম পথ।

চার:
দিগন্তে অসংখ্য বিন্দু থাকে। দিগন্ত-বিন্দু থেকে কোনো একক কিংবা একাধিক অর্থবোধক বিন্দুকে চিহ্নিত করাই হল জীবনের কাজ।

পাঁচ:

প্রতিটি পথই প্রতিটি জীবনের জন্য ভিন্ন, কারণ প্রতিটি জীবনের কোয়ান্টাম-অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থাকে ।

ছয়:

পথের দেহ-রেখার অসংখ্য বিন্দুকে গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য করে একই পথ বিভিন্নরূপে উপলব্ধি হতে পারে বিভিন্ন জীবনের কাছে, দেশ-কাল গ্রাহ্য করে ।

সাত:

অসংখ্য জীবনের পদচিহ্ন একই গণিতে কিংবা একই জ্যামিতিতে পথের প্রতিটি বিন্দুকে স্পর্শ করবে, এরকম ভাবা যুক্তিসঙ্গত নয় । যে এরকমভাবে, সে জানে ১+১=২, কিন্তু জানে না SIN ৯০+TAN৪৫=২ ।

আট:

পথের যে-কোনো বিন্দু থেকে (মধ্যবিন্দু, পার্শ্ববিন্দু, প্রান্তবিন্দু ইত্যাদি) নতুন দিগন্ত ও দিগন্ত-বিন্দু দেখা যায় এবং এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে নিত্যনতুন পথের । কিন্তু মুশকিল হল, পথের মধ্যবর্তী বিন্দু থেকে সবাই নতুন দিগন্ত কিংবা দিগন্তবিন্দু দেখতে পায় না । তাদের মন ও চোখে অবস্থান করে শুধুমাত্র প্রান্তে পৌঁছার লোভ, যা স্বপ্ন দ্বারা সমর্থিত ।

নয়:

একটি পথে যাত্রা শুরু করে সব জীবনই প্রান্তবিন্দুতে পৌঁছতে পারে না এবং এজন্য অনেক সময় একটি পথের কোনো-এক গ্রাহ্যবিন্দুতেই জীবন খুঁজে নিতে চায় প্রান্তের ঠিকানা, যদিও তা বাস্তব নয় ।

দশ:

বাস্তবতার কোনো অসমাপ্ত অবস্থান নেই, কিন্তু অসমাপ্ত পথের অবস্থান জীবনে গ্রাহ্য এবং এজন্য পথের নিরিখে বাস্তবতা সব সময় আপেক্ষিক, আর জীবনও প্রশ্ন রাখে– ‘বাস্তবতা কী?’

এগারো:

পথের বাস্তবতা সবসময় গণিত-জ্যামিতি নির্ভর এবং এ কারণে প্রতিটি জীবনকে গণিত-জ্যামিতি জানতে হয় । এ গণিত-জ্যামিতি কখনো চিত্রের, কখনো শব্দের, কখনো স্বপ্নের আবার কখনো-বা কেবলমাত্র শূন্যতার ।

বারো:

পথের বাস্তবতায় শূন্য ও শূন্যতা আসলে গণিতেরই বিষয় ।

তেরো:

যে পথের জ্যামিতি বৃত্ত তৈরি করে, সেখানে জীবন পথহারানো পথিক। বৃত্ত-পথ অসীমকে গ্রাহ্য করে, বাস্তবতাকে নয়। এ কথা সত্য, অসীম বলে কিছু নেই। গাণিতিক ইনফিনিটিও আসলে মেটাফিজিক্স-এর বিষয়।

চৌদ্দ:

জীবনের শেষ হয় চিহ্নহীন বিন্দুতে। পথ শেষহীন, পথের চিহ্ন থাকে, তৈরি হয় নতুন ঘর, নতুন জানালা।

জীবন ও মৃত্যু প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক মূলধারার ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯৯০ সংখ্যায় কবি শামসুর রাহমানের কলাম 'জনান্তিকে' পড়ছিলাম। লেখাটি পড়েই বুঝতে পারলাম, ষাটটি সৌর বছর পেরুনোর পর কবি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজরাইল ও সমার্থক মৃত্যুবিষয়ক চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। মৃত্যুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন তিনি বিভিন্ন দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও কবি-শিল্পীর অনুভূতিতে আর দর্শনচিন্তায়।

আসলে, 'মৃত্যু কী?'– এ প্রশ্ন উপলব্ধির সংজ্ঞা দেওয়া হয়তো-বা সত্যি কঠিন, কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি এসে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বিজ্ঞানের শুদ্ধ ও যুক্তিবাদী গণিত আমাদের দর্শনচিন্তায় এমন কিছু অনু-পরমাণু সংশ্লেষণ করেছে, যার মাধ্যমে মৃত্যুবিষয়ক কিছুটা সত্য উদ্ধার করা যায়।

মৃত্যুকে বিজ্ঞানদর্শনের যুক্তিবাদী গণিত দিয়ে বিশ্লেষণ করার আগে কবির লেখা কলামে ফিরে যাই। তিনি লিখেছেন–

"কয়েকদিন থেকে মৃত্যু-চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। সেদিন দাড়ি কামাবার সময় নিজের চেহারা আয়নায় দেখে হঠাৎ কী-যে হল, রেজর চালাতে পারলাম না। আয়নার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালাম, যেন কেউ ধাক্কা দিল আমাকে। মনে হল, কেউ আমার ঘাড় ধরে ফিস্‌ফিসিয়ে কানে কানে বলল, 'আজ তুমি দাড়ি কাটছো, একদিন আমি তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব দুনিয়া থেকে, যেমন কৃষক কাস্তে দিয়ে কেটে ফেলে শস্য।' আজরাইল ছাড়া কার কণ্ঠস্বর এমন ঠাণ্ডা আর নির্বিকার হতে পারে? কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকলাম চেয়ারে, কিছুতেই মৃত্যু-চিন্তা মন থেকে অপসারিত হল না। মৃত্যুর সংজ্ঞা কী? আসলে আরো অনেক কিছুর মতোই মৃত্যুরও কোনো যথার্থ সংজ্ঞা নেই। দার্শনিক উইটগেনেস্টাইন বলেছেন, মৃত্যু জীবনের মতো যাপিত হয় না। মনোবিজ্ঞানী

ফ্রয়েডের মতে, মৃত্যু একটি বিমূর্ত ধারণা। জীবন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে বলে আমরা জীবনকে কিছুটা সংজ্ঞায়িত করতে পারি। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে উচ্চারণ করতে হয়, জীবনের চির অবসান, জীবনের অনুপস্থিতিই হল মৃত্যু। যার মৃত্যু হয়, তার মৃত্যু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হতে পারে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার মুহূর্ত সে পায় না। ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট তাঁর এক স্বগত ভাষণে বলেছেন, 'মৃত্যু হল সেই রাজ্য যেখান থেকে কোনো পথিক ফিরে আসেনি।' ফিরে আসে না বলেই মৃত্যুবিষয়ে মানুষের এত জল্পনা-কল্পনা। মৃত্যু রহস্যময়, জীবনের মতোই।"

কবির উপরিউক্ত উপলব্ধি-সংবেদ বিশ্লেষণ করে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। কবি আয়নায় যে প্রতিবিম্ব দেখে মৃত্যুচিন্তায় অধীর হয়েছিলেন সে-ছবিটি ছিল কার? কবি শামসুর রাহমানের, নাকি অন্য কোনো জীবন্ত জৈববস্তুর? প্রশ্নটিকে সাদামাটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখলে, সব রকম যুক্তি নিয়েই একটাই উত্তর আসবে, তা হল, বিম্বটি ছিল আমাদের পরিচিত কবির। কবি ইহলোক ত্যাগ করবেন, সে মুহূর্তেই যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় 'ঐ দেহটা কার?' তবে স্বাভাবিকভাবেই উত্তর আসবে, 'ওটা কবি শামসুর রাহমানের লাশ।' শুধু মাত্র লাশ! উত্তর পাওয়া গেলেও, যারা একটু গভীরে তলিয়ে চিন্তা করবেন তাঁরা কিন্তু সন্তুষ্ট হবেন না, কারণ একটা উত্তরহীন প্রশ্ন নতুনভাবে আলোড়িত করবে তাঁদের। প্রশ্নটা হল, 'ওটা যদি শামসুর রাহমানের লাশ হয়ে থাকে তবে শামসুর রাহমান গেলেন কোথায়?' উত্তর পাওয়া না গেলেও কেউ কেউ হয়তো বলবেন, 'শামসুর রাহমান মরে গিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন, কোথায় গেছেন জানা নেই।'

ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামেলেটও হয়তো-বা এমনই এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁর স্বগত ভাষণে বলেছিলেন, 'মৃত্যু হল সেই রাজ্য যেখান থেকে কোনো পথিক ফিরে আসে না।' এই বাক্যে 'পথিক' শব্দটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই চরিত্রটিই জীবনের রাজ্য থেকে হেঁটে হেঁটে মৃত্যুর দেশে গিয়ে আর ফেরে না। ডেনমার্কের যুবরাজের বক্তব্যে উল্লিখিত পথিকের সাথে কবি রাহমানের যতটা সাযুজ্য রয়েছে, তাঁর নিজস্ব লাশের সাথে কিন্তু ততোটা থাকছে না। বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। কিন্তু মুশকিল হল, এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু ভাবতে গেলেই মৃত্যুসম্পর্কীয় কতগুলো রূপক উপলব্ধিই শুধু বারবার ঘুরে ফিরে আসে, আর তাই ফ্রয়েডের মতো মনোবিজ্ঞানীকেও বলতে হয়, 'মৃত্যু একটি বিমূর্ত উপলব্ধি মাত্র।' জীবনের মতো মৃত্যু যাপিত হয় না– এ বিশ্বাসে দার্শনিক হ্বিটগেনেস্টাইনের দর্শন ধ্রুব হলেও, আমরা এ বক্তব্যে মৃত্যুর সম্পূর্ণ সত্যস্বরূপ খুঁজে পাই না। প্রশ্ন প্রশ্নের আকাশেই ঝুলতে থাকে, কোনো উত্তর দিয়ে তাকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এবার আমরা মৃত্যুচিন্তা বাদ দিয়ে বস্তুচিন্তায় ফিরে আসি। আপাতত কবি শামসুর রাহমানের ঘরের আয়না আর চেয়ারটিকে নিয়ে কিছু চিন্তা করা যাক। আয়নাটি আসলে কিছু জড় অজৈব অণু-পরমাণুর আপেক্ষিক শৃঙ্খলিত যৌগিক অবস্থান। সিলিকা, এ্যালুমোনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদির মতো কিছু অণু-পরমাণু শৃঙ্খলই, আপাতত, এই সময়ের জন্য, আয়নাকে আয়নার জীবনে রাখছে। চেয়ারটিও মূলত কতগুলো জড় জৈব অণু-পরমাণুর সময় আপেক্ষিক অবয়ব মাত্র। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির অণু-পরমাণু একটি আরেকটিকে জড়িয়ে ধরে রেখে গড়ে তুলেছে চেয়ারটির জীবন। অবশ্য একটি চেয়ার কিংবা আয়নার সময় আপেক্ষিক অবয়ব সৃষ্টি করতে মানবনিঃসৃত বা সৃষ্ট কিছু শক্তির ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না।

আয়নার ও চেয়ারের মধ্যে কিছু অণু-পরমাণু একটি নির্দিষ্ট গুচ্ছশক্তিতে ধরে রাখছে একে-অপরকে এবং এ কারণেই বিপরীত কোনো উচ্চতর শক্তির কোয়ান্টামগুচ্ছ প্রয়োগ ব্যতীত এই চেয়ার কিংবা আয়নার জীবনকে ভেঙে তাদের বিনাশ বা মৃত্যুকে ডেকে আনা সম্ভব নয়। ব্যাপারটি আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তাতে রাহমানের আয়না আর চেয়ারটিকে জ্বলতে দিই। অগ্নিতাপের কোয়ান্টামগুচ্ছশক্তি চেয়ার ও আয়নার সময় আপেক্ষিক অণু-পরমাণু-কোষের কোয়ান্টাম-নক্শায় পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং এক সময় আমরা দেখতে পাব কতগুলো ছাই আর চকচকে সিলিকা-দলা চেয়ার আর আয়নাটার লাশ হয়ে পড়ে আছে। তখন যদি কবি শামসুর রাহমান জিজ্ঞেস করেন, তাঁর প্রতিবিম্ব দেখার সখের আয়না আর মৃত্যুচিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ারটি কই, তখন একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়া যাবে। উত্তরটি হবে অনেকটা এরকম– 'অগ্নিতাপের কোয়ান্টাম শক্তিগুচ্ছ চেয়ার আর আয়নার অণু-পরমাণু শৃঙ্খল ভেঙে ফেলেছে, কিছু কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশে উড়ে গেছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড হয়ে... ইত্যাদি ইত্যাদি। চেয়ার আর আয়নার মৃত্যু নিয়ে ফ্রয়েড কিংবা হ্বিটগেনেস্টাইনের দর্শন বলব না আমরা, এটা গণিতকে উপস্থিত করব সত্য প্রকাশের খাতিরেই।

এবার আবারও ফিরে আসা যাক জীবন্ত জৈবের মৃত্যু প্রসঙ্গে। আমরা জানি যে, জীবন আসলে কতগুলো জড় অণু-পরমাণু-শৃঙ্খলের সংগঠন মাত্র। একটা ন্যূনতম কোয়ান্টামধাপে থেকে জড় অণু-পরমাণু গড়ে তোলে এক জটিল জৈব জীবন্তকোষ বা জৈববস্তুকাঠামো। বস্তুটি জেলিফিশ, বানর, কুকুর, এমনকি মানুষও হতে পারে, তবে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে অণু-পরমাণু শৃঙ্খলে সৃষ্ট ক্রোমোজম আর তার অন্তঃস্থ আর.এন.এ (RNA) এবং ডি.এন.এ (DNA)-র কোয়ান্টাম-নক্শার ওপর। একটা বিবর্তনশীল, অনিশ্চয়তাবদ্ধ ও আপেক্ষিক সময়বৃত্তে অবস্থান করে কিছু ক্রোমোজমবাহিত সহজাত ধারণা আর নিম্নতম কোয়ান্টাম ধাপের একটি জৈবকাঠামো নিয়েই একজন মানুষের জন্ম হয়। জন্মের পর প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য,শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, পুষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন কোয়ান্টামতেজে মানুষের জীবনকোষে বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায় এবং এর ফলে প্রতিটি জীবনবস্তু-এককই তার নিজস্ব কোয়ান্টাম ধাপ মৌলিকভাবে উত্তরিত করতে পারে উচ্চতর স্তরে। একজন জীবন্ত মানুষের জীবনধারণ ও সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ক্রিয়াকর্মই এক রকম কোয়ান্টায়িত তেজ-বিকিরণ এবং এ বিকিরণতেজ সব সময়ই প্রকৃতি থেকে আহরিত সংশ্লেষণ-তেজশক্তির সাথে একটি সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত। এ সমীকরণকে আমরা জীবন-সমীকরণ বলে চিহ্নিত করতে পারি। কোনো জৈব, অজৈব বা যান্ত্রিক কারণে, যে-মুহূর্তে একটি জৈব জীবনবস্তুর তেজসংশ্লেষণ ও তেজবিকিরণ সমীকরণ বিঘ্নিত হয়, ঠিক সে মুহূর্তেই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন কোয়ান্টামধাপও প্রাকৃতিক কারণেই অবস্থান করতে পারে না এবং এর ফলে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব কোষশৃঙ্খল ভেঙে কেবলমাত্র কিছু জড় অণু-পরমাণুর অস্তিত্বই ধ্রুব হয়ে ওঠে। আমরা জীবন-সমীকরণ ভাঙা এ সময়টাকেই মৃত্যু বলে ভাবি। কবি শামসুর রাহমান নামক একজন মৌলিক জীবনবস্তু গত ষাট বছর ধরে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন তেজ আহরণ করেছেন বিভিন্ন অণু-পরমাণু সংশ্লেষণের জন্য এবং একইভাবে তেজ-বিকিরণও করেছেন তাঁর বিভিন্ন জৈবকর্মে, সৃষ্টিতে, কবিতায়। যে-শক্তি জীবন-সমীকরণের ভারসাম্য রক্ষা করেছে, সেই বিশেষ্য পদটিই হল 'শামসুর

রাহমান’ এবং যে অণু-পরমাণু-শৃঙ্খল ‘শামসুর রাহমান’ নামক শক্তিসমীকরণের অধীনে থেকে কর্ম সম্পাদন করেছে মাত্র, সেটি হল ঐ শক্তির ধারক বা লাশ ।

উপসংহারে কবি শামসুর রাহমানকে একটি কথাই বলা যেতে পারে মৃত্যুচিন্তায় বিমর্ষ হওয়ার কোনো কারণ নেই । যে বস্তুপিণ্ড লাশ হবে সেটি কিছু জড় অণু-পরমাণুপুঞ্জ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, আর যে জীবন-সমীকরণ বা শক্তি-সমীকরণ ‘শামসুর রাহমান’ নাম নিয়ে জীবন ধারণ করে সৃষ্টি করে গেছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে আগামীর জন্ম-প্রজন্মে । উল্লিখিত বিবৃতিটির জন্ম কোনো ভাববাদী বিশ্বাস থেকে হয়নি, কারণ আমরা গাণিতিক যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করতে পারব যে, আজ থেকে শত শত বর্ষ পূর্বে বিকিরিত জীবন-শক্তি-সমীকরণের কোয়ান্টামতেজ প্রজন্ম বিবর্তনে সাহায্য করে মানুষ নামের হোমোসেপিয়েনস্ প্রজন্ম সৃষ্টি করেছিল এবং এ মানুষ-প্রজন্মের বিভিন্ন জীবনসমীকরণ এরিস্টোটল, প্লাতো, লিওনার্দো, ফ্রয়েড, সার্ত্রে, ডারউইন, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদির নাম ধারণ করে যে তেজ-বিকিরণ করেছিল, তা এখনও আমাদের মাঝে অসীম তীব্রতা নিয়েই ক্রিয়াশীল ।

সৃষ্টির সিঁড়ি

‘নতুন উপলব্ধিতে নিজেকে চেনো’– এ রকম একটা স্বপ্নচিন্তা মানুষের অবচেতন মনে আছে । এ স্বপ্ন-চিন্তা বা বিশ্বাস মানুষ নামের জৈববস্তুর মনে হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি । আলো, শব্দ ও অন্যান্য শক্তির কোয়ান্টাম-অভিঘাত আর উচ্চ কোয়ান্টামে অবস্থানকারী কিছু অন্য মানুষের জৈবচিন্তার স্পর্শেই নতুন মানুষ স্বপ্ন দেখছে, যদিও এ স্বপ্ন কিছুটা অন্য রকম ।

জন্মমুহূর্তের কথা মানুষটার মনে নেই । মনে থাকুক আর না-ই থাকুক, কতগুলো জৈবগণিত তার অজ্ঞাতেই অন্তর-কোষে বাসা বেঁধেছিল । আর এখন, সূর্যের আলোতে সত্যের জীবন জৈবগণিতের ভাষা না বুঝলেও, অবচেতনের জীবন সব ভাষাই বোঝে । একজনের জ্ঞান আর অন্যজনের অজ্ঞানতা, দ্বন্দ্বের মাধ্যমে, সৃষ্টি করে কিছু সত্য ও মিথ্যার কারুকাজ । এ কারুকাজই হয়তো-বা সৃষ্টির সিঁড়ির প্রকাশহীন প্রথম কোয়ান্টাম ধাপ, যদিও সমুদ্রের গভীর জলে অবগাহনের জন্যে আরও অনেক সিঁড়ি পেরুতে হবে মানুষটাকে ।

জন্মের পর রক্ত আর পৃথিবীর গন্ধ বিভিন্ন নতুন অণু-কোয়ান্টামের খোঁজ দিয়েছিল । বাইরের হঠাৎ ঠাণ্ডায় কেঁপেছিল শরীর । ভেতরের মানুষটা বুঝেছিল, জীবন আসলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একটা সময়ের উপলব্ধি । অন্তঃস্থ জৈব-ঘড়িটা উপলব্ধির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বলেছিল ‘ঠিক ঠিক’ ।

আলোর গুচ্ছ-কোয়ান্টাম গেঁথে গেল চোখে । আস্তে আস্তে ঝুলিয়ে দিল চারপাশের সম্ভব ও অসম্ভব সমস্ত জড় ও জৈবের সত্তাকে । মস্তকের অণু-কোষে জমা হতে থাকল পরিবেশলব্ধ বিভিন্ন দৃশ্য-কোয়ান্টারছবি, বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শের কণা-তরঙ্গরূপ, যাবতীয় গন্ধ-স্বাদের উপলব্ধি-সংবেদ ।

কিছু বিদ্যুৎ-নিউরোন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল সমস্ত জড় ও জৈব সুন্দর-অসুন্দরের বাস্তবতা। মস্তিষ্কের সংশ্লেষকেন্দ্রে একটা জৈবঅণুচক্র বুঝতে চেষ্টা করল এবং বুঝল কোনটা জীবনের স্বপক্ষে ভালো; আর কোনটা জীবনের বিপক্ষে অনর্থ মন্দ। এক অনিশ্চয়তাবাদী কোয়ান্টাম জগতের অংশ হয়েও জৈব নিউরোনকোষ আনন্দ ও বেদনার উপলব্ধিকে বুঝতে পারল মস্তিষ্কের অন্তরে রাখা সুখ-দুঃখের চিত্র আঁকা জৈব-কোষের উল্লম্ফনে, আর পরবর্তী পর্যায়ে বিকিরণ করল বিভিন্ন শক্তিগুচ্ছ– কান্না, হাসি, শব্দ, স্পর্শ ও চিত্রের প্রকাশ-মাধ্যমে। এ প্রকাশও ছিল অনিশ্চয়তাবদ্ধ, কখনো গাণিতিক, কখনো বিশৃঙ্খল রূপক ও স্বপ্নময়। মানুষটা হঠাৎ করে বিভিন্ন প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড় করাল নিজস্ব আহরিত জ্ঞান ও স্বপ্নচিন্তাকে। কখনো উত্তর পেল গাণিতিক যৌক্তিক বিশ্লেষণে, মস্তিষ্কের যুক্তিবাদী অণু-কোষের কর্ম-ক্রিয়ায়। কখনো-বা উত্তরহীন প্রশ্ন নিয়েই সংশ্লেষণকেন্দ্রে উপস্থিত করল আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত কোনো বাস্তব চিত্র কিংবা প্রশ্নবোধক চিহ্নকে। প্রকাশের সময় উপস্থিত করল অনন্ত অসীম সত্তা নিয়ে কোনো বিস্ময়কর শক্তির অবয়ব কিংবা কোনো শূন্যতা নিয়ে নিজস্ব উপস্থিত-অনুপস্থিতির ছায়া-ধোঁয়া চিত্র। দ্বন্দ্বের বেড়াজালে উপস্থিত হয়ে অস্থির হল গাণিতিক জৈবকোষ, কখনো-বা কোনো অসম্ভব গণিতের সমাধান পেয়ে কিংবা সমাধান না পাওয়া গণিতচিত্রের বিশৃঙ্খল পৌনঃপুনিকতায়। দ্বন্দ্বের আবর্তেই সৃষ্টি হল সৃষ্টির কোয়ান্টাম সিঁড়ি।

জন্মমুহূর্তে যে কোয়ান্টাম ধাপে অবস্থান করছিল সূর্যের ও অন্ধকারের মানুষটা, পরিবেশের নিত্যপ্রবহমান কোয়ান্টাম দৃশ্যস্রোতে ভেসে ভেসে সে উপস্থিত হল সৃষ্টির তৃতীয়

সিঁড়ির প্রান্তে। পরিচিত চারদিকের চিত্র, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ যদিও তার অন্তরের কাছাকাছি, তবু তার ভয় নতুনকে মুখোমুখি হবার ভয়ে। কখনো তার ইচ্ছে করে শুক্রাণু-ডিম্বানুর প্রাথমিক প্রেমে দ্রবীভূত থেকে নৈসর্গের সুন্দর ও পরিচিত জড় জগতের আদিম ও প্রাথমিক কোয়ান্টাম ধাপেই অবস্থান করার। শিকড়ের লোভ ছেড়ে ডালাপালায় যেতে চায় না জৈব অণু-কোষের শৃঙ্খলিত গণিত। হঠাৎ শ্বেত ও লোহিত কণিকার যুদ্ধ-বিপ্লবের কথা মনে আসে মানুষটার। দেহের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছে শ্বেতকণিকা আক্রমণকারী জীবাণুর সাথে। 'যুদ্ধ জয়ে মৃত্যু নেই'– এ শ্লোগানের পতাকা তুলে ধরেছে রক্তস্রোত। শরীর-সমুদ্রে অমৃত হরমোন ও এনজাইম কানে কানে বলল মানুষটাকে– 'এগিয়ে যাও'। অবচেতন মন পতাকার রঙ দেখে একাত্মতা ঘোষণা করে ক্রোমোজমে লেখা শ্লোগানের সাথে, এগিয়ে থাকে নতুন নতুন চিত্রছবি। যে মানুষটা দুঃখ, বেদনা আর মৃত্যুকে ভয় পেল না, সে এগিয়ে গেল সৃষ্টির পরবর্তী কোয়ান্টাম চত্বরে।

পথের শেষ খুঁজে পায় না মানুষটা। পাহাড় পেরিয়ে, তেপান্তর পেরিয়ে চলতেই থাকে মানবিক স্বপ্ন-জিজ্ঞাসা নিয়ে, আগামীর দিকে। আরও সূর্য, আরও নক্ষত্রের দেশ আছে নিশ্চয়? আরও তরঙ্গ, আরও কোয়ান্টাম শক্তি খুঁজে নিতে চায় জৈব অণু নিউরোন। পথে দেখা হয় এক বৃদ্ধ জ্ঞানী তাপসের সাথে। জ্ঞানী বৃদ্ধ সময়ের সাথে সম্পর্কহীন। সে বৃদ্ধ হয়েছে আলোর কণা গুনতে গুনতে। সে কয়েক লক্ষগুণ বেশি হেঁটেছে পৃথিবীর পথে পথে। তার কোয়ান্টাম ধাপ এগিয়ে গেছে অনেক অনেক দূর, প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি, যদিও সৈকত এখনও আবছা সুদূরে। মানুষটা অবাক

হয়ে তাকিয়ে দেখল জ্ঞানী বৃদ্ধের বিকিরণ। তুলে নিল কিছু আলো। জৈব অণু-পরমাণু কোষে যোগ হল আরো এক ধাপ কোয়ান্টাম সিঁড়ি। বিয়োগ চিহ্নে ঝরে পড়ল কিছু মৃত্যুর বিন্দু।

মানুষটা এগিয়ে গেল সূর্যের পেছনে পেছনে। একদিন নীহারিকা তুলতে হবে। সে জানে, আশে-পাশে আরও অনেক জৈব-জীবন-যন্ত্রণা আছে যাদের ক্রিয়া-কোয়ান্টাম ধাপ অবস্থান করছে বিভিন্ন স্তরে। কেউ মানুষটার ভাষা বোঝে আর কেউ-বা বোঝে না কিছুই। যে বোঝে সেই উত্তরিত হয় সৃষ্টির পরবর্তী কোয়ান্টাম অবস্থানে। আসলে মানুষটা মানুষের উত্তরণের জন্যেই নিবেদিত, আর তার সৃষ্টির ভিত্তিও অবস্থান করছে পূর্ববর্তী সত্য সৃষ্টির ওপর।

মানুষটা একদিন হরিয়ে যাবে কোনো এক কালো বিবরের অন্তরালে। তার সৃষ্ট যে কোয়ান্টাম শক্তি বিকিরিত হয়েছিল সূর্যের দিনে ও চাঁদের রাতে, সে গুচ্ছশক্তি থাকবে অসীমে ও অন্তহীনে। সে শক্তিই আনবে জৈব বিবর্তন, সৃষ্টি করবে নতুন জীবন-প্রজন্ম এবং আগামীর মৃত্যুকে। একদিন, কোনোদিন শক্তির কোয়ান্টামগুচ্ছ অনিশ্চয়তা নিয়ে মিশে যাবে কোনো এক 'এককত্বে' পরবর্তী বিস্ফোরণের নেশায়। একটা চক্রে ঘুরছে জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস। এ চক্রকে সম্পূর্ণ করছে সৃষ্টির সিঁড়ি।

তথ্যপঞ্জী

১. অমল দাশগুপ্ত, আইনস্টাইন, আলোর দিশারী, অয়ন, কলকাতা, ১৯৮২।

২. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জল লাকাঁ বা পিতৃনামের পরাক্রম, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৮।

৩. অশ্রুকুমার শিকদার, আধুনিক কবিতার দিক্‌বলয়, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯২।

৪. আফজালুল বাশার, বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব, অনুবাদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

৫. গালিব আহসান খান, বিজ্ঞান ও প্রত্যয়ন: বিংশ শতাব্দীর দর্শনের আলোকে, কণ্ঠস্বর, বিংশতি বর্ষ, ১-৪র্থ সংখ্যা, জুন ১৯৮৬।

৬. দুলাল পাণ্ডে, এডমুন্ড হুসার্ল ও মার্টিন হাইডেগার, অস্তিত্ববাদ দর্শনে ও সাহিত্যে, সঞ্জীব ঘোষ সম্পাদিত, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৬।

৭. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৪।

৮. বারিন্দ্র বসু, কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা, রত্নাবলী, কলিকাতা, ১৯৮৬।

৯. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬।

১০. হারুন অর রশিদ, এ,এম, বিজ্ঞান ও দর্শন, সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতামালা, ১৯৭৯-৮২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।

11. Asimov, I. Asimov's New Guide to Science, Penguin Books,

1987.

12. Calvio, I. The Literature Machine, Tr. Patrick Creagh, Pan Book, 1989.

13. Das, Ashim Kumar. The Dialectic of Language and Silence, unpublished, 1990.

14. Derrida, Jacques. Of Grammatology, Tr. Spivak, G. C, The Johns Hopkins University Press, 1976.

15. Dreida, Jacques. Writing and Difference, Routledge and Kegan Paul, 1974.

16. Durant, Will. The Story of Philosophy, Washington Square Press. 1961.

17. Encyclopaedia Britanica, 15th Edition, 1989, Micropaedia and Macropaedia, Articles on Philosophical Schools and Doctrines, Philosophies of the Branches of knowledge. The Mathematical Theory of Optimization, Cybernetics, Quantum Theory, Heidegger M. Husserl E, Phenomenology, Ontology, The Art of Literature, Literary Criticism.

18. Encyclopaedia of Science and Technology, McGraw Hill Inc, 1984.

19. Evelyn F, Kand Helen E.L. Feninism and Science, Oxford University Press, 1996.

20. Gamow, G. Matter, Earth and Sky, Prentice Hall Inc, 1965.

21. Gelven, M. Commentary on Heidegger's Being and Time, Northern Illinois University Press, 1989.

22. Gutenplan, Mind and Language, Oxford University Press, 1975.

23. Hamlyn, D.W. The Penguin History of Western Philosophy, Penguin Book, 1987.

24. Heidegger, Mertin, Being and Time, Tr, Macqurrie and Robinson, Basil Blackwell, 1973.

25. Heidegger, Mertin. On Way to the Language, Tr, Peter D. Hertz, Happer and Row, 1971.

26. Heidegger, Mertin. What is a thing? Tr, W.B. Barton and V. Deutsch, University Press of America, 1985.

27. Heisenberg, Warner. Physics and Philosophy, Penguin Books, 1989.

28. Kermode. F and Bowie M. Lacan, Fontana Press, 1991.

29. Kearney, Richard, Modern Movement in European Philosophy, Manchester University Press, 1989.

30. Lakatos I and Musgrave A, Criticism and Growth of Knowledge, Cambridge University Press, 1978.

31. Lentricchia. Frank. After New Criticism, Athlone Press, 1980.

32. Lodge, David. Modern Criticism and Theory, Longman, 1988.

33. Losee, J.A. Historical Introduction of the Philosophy of Science, Oxford University Press, 1980.

34. Lyons J and Kermode F. Chomsky, Fontana Press, 1991.

35. Macdonnel, D. Theories of Discourse, Basil Blackwell, 1987.

36. Magee, B. Popper, Fontana Press, 1982.

37. McMohon, Frank B. Psychology- The Hybrid Science, Prentice Hall Inc, 1972.

38. Miller, D. Ed. A Pocket Poppor, Fontana Press, 1985.

39. Newton, K.M. Interpreting the Text, Harvester Wheatsheaf, 1990.

40. Norris, Christopher. The Deconstructive Turn, Methuen, 1984.

41. Pears, D. Wittgenstein, Fontana Press, 1985.

42. Penrose, Roger. The Emperor's New Mind. Oxford University Press, 1989.

43. Powell, J. L and Crasemann, B. Quantum Mechanics, Oxford IBH Publishing, 1961.

44. Ray, William, Literary Meaning: From Phenomenology to Deconstruction, Basil Blackwell, 1986.

45. Rice, P and Waugh, P. Modern Literary Theory, Edwar Arnold, 1989.

46. Selden, Raman. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory, The Harvester Press, 1986.

47. Scruton, Roger. A Short History of Modern Philosophy, Ark Paper-backs, 1989.

48. Sprigge, T.L.S. Theories of Existence, Penguin Book, 1986.

49. Stanesby, Derek. Science, Reason and Religion, Routledge, 1985.

50. Steiner, George. Heidegger, Fontana Press, 1987.

51. Sturrock, John. Structuralism, Paladin, 1986.

52. Toulmin, S, Bush. D, Ackerman J.S, Patlisca C.V. Seventeenth Century Science and Arts, Prinston University

Press, 1961.

53. Weiss, Paul. Nine Basic Arts, South Illinois University Press, 1961.

54. Weisskof, V.F. Knowledge and Wonder, Education Service Incorporated, 1966.

55. Wittgestein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, Tr. D.F. Pears and B.F Meguiess, Routledge & Kegan Paul, 1961.

......সমাপ্ত......